শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি—শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণো জয়তি ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-লীলা-কথা

পরমারাধ্য
শ্রীশ্রীগুরুদেব ১০৮- শ্রীশ্রীমদ্‌রামদাস বাবাজী
মহারাজের
শ্রীচরণ আশ্রিত

শ্রীজীবন কৃষ্ণ দাস
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
প্রথম সংস্করণ—২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭ সাল, চৈতন্যাব্দ ৪৭৫ সন।
দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ১০ই ভাদ্র, মঙ্গলবার
বঙ্গাব্দ ১৩৭০ সাল, চৈতন্যাব্দ ৪৭৭ সন।

প্রকাশক—
শ্রীজীবন কৃষ্ণ দাস
বরাহনগর শ্রীভাগবত আচার্য্যের পাঠবাড়ী
পোঃ আলমবাজার
২৪ পরগণা

প্রিণ্টার—
শ্রীমহিমা রঞ্জন মিত্র
মিত্র আর্ট প্রিণ্টার্স
৬৩বি. আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ফোন—৩৫-৪৩০২

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস মহাশয় একাধারে কবি, সাধক ও দার্শনিক। তিনি "পূজার ফুল", "অর্ঘ্য ও অঞ্জলি", "চেতন ধারা", "শ্রীশ্রীগুরু শ্রীরাম মহিমা," "লীলাবলী", "কৃপার দান" ইত্যাদি কাব্য ও গীতি-কবিতা লিখিয়া ভক্তহৃদয়ে প্রেমের অনাবিল স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার "ভালবাসার সন্ধান" একখানি অপূর্ব্ব দার্শনিক গ্রন্থ। উহা গদ্যে লিখিত হইলেও কাব্যের ন্যায় সুখপাঠ্য। পরমারাধ্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহোদয়ের জীবনী লিখিবার তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি, কেননা তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার কৃপা ও স্নেহ লাভ করেন এবং একাদিক্রমে পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল তাঁহার মধুময় সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য পান। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উক্তি সমূহ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উপাদান যোগাইয়াছে, একথা সবাই জানেন। আমি তুলনার কথা বলিতেছিনা, কিন্তু এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনের উপর শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহোদয় কি অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎকালে লোকে শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের "শ্রীগুরু-লীলা-কথা" পড়িয়া জানিতে পারিবে।

আমি নবদ্বীপের লোক হইলেও নবদ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থ হইতে প্রথম জানিলাম। ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় কি ভাবে হরিসভায় নটনশীল শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণ পড়িয়া আমি নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে গ্রন্থকার বর্ণিত তথ্য মূলতঃ সত্য।

পূজনীয় গ্রন্থকারের লেখার ধরণটা এতই মনোরম যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ঘটনাগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। গভীর অনুভূতি না থাকিলে এমন রচনাভঙ্গী হয় না।

লেখকের আর একটি অসাধারণ গুণ এই গ্রন্থের পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। তিনি নিজেকে কোথাও বাড়াইয়া তো তুলেন নাই, বরং ইচ্ছা করিয়া নিজের দোষ ত্রুটি ও বিচ্যুতির কথা সরলমনে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের সহিত খুলিয়া বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের জীবন মহত্তর পথের সন্ধান পাইবে।

শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার
এম. এ., পি. আর. এস., পি.-এইচ. ডি.,
ভাগবতরত্ন
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইন্‌স্পেক্টর অফ্ কলেজস্

মুখবন্ধ

শ্রীগুরবে নমঃ
শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

"শ্রীশ্রীগুরু-লীলা-কথা" মহান্ গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমি একান্ত অসমর্থ। তথাপি লিখিতে হইতেছে। কারণ, গ্রন্থকার যিনি, তিনি বলিয়াছেন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু ভূমিকা লিখিতে। তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীগুরুদেবের রাতুলচরণ স্মরণ করিয়া লিখিতে বসিলাম।

এই শ্রীগ্রন্থের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের অফুরন্ত পবিত্র লীলার সেই অংশগুলি বর্ণিত হইয়াছে যাহা গ্রন্থকারের জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত ও প্রত্যক্ষীকৃত। শ্রীগুরুদেব জগৎগুরু শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-শক্তি লইয়া এই ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনের মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দের পতিতপাবন ও প্রেমবিতরণ ধর্ম্ম প্রকট হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলে মহাপুরুষগণ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া মায়ামুগ্ধ জনগণকে ঈশ্বরাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের শ্রীগুরুদেবের বেলায় তাহার বিপরীত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের জীবনটী ছিল স্নেহ মমতাদি মাধুর্য্যরসে ভরা। সেই মাধুর্য্য দিয়া তিনি মানুষকে ভাল বাসিয়াছেন এবং ভক্তিপথের

সন্ধান দিয়াছেন; নিজে নাম আশ্রয় করিয়া, সবাইকে নাম আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের এই মাধুর্য্যময় লীলা পূজনীয় জীবন দাদা কত মধুর করিয়া সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম। আমি এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ সময়ে কতক অংশ প্রুফ্ দেখিয়াছিলাম। আবার কামার পাড়া নিবাসী শ্রীমাখনলাল চ্যাটার্জি বি-এ, প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রুফ্ দেখা অবস্থাতেই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু মুছিয়া প্রুফ্ দেখিতে হইয়াছিল।

মহাজনগণ শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"অক্রোধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে, অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে। অধম পতিত জনার ঘরে ঘরে গিয়া রে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া রে। যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি রে, আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি রে। এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় রে, সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লুটায় রে।" শ্রীনিত্যানন্দ নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেন, যাকে দেখিতেন তাকে দৈন্য করিয়া বলিতেন—"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" এই কথা বলিতে বলিতে নিতাই চাঁদ কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁহার কারুণ্যময়ী কথা শুনিয়া লোকে স্থির থাকিতে পারিত না। ব্যাকুল হইয়া বলিত,—"তুমি কেঁদো না ঠাকুর, আমরা তোমার গৌরাঙ্গ নাম লইতেছি।" এই বলিয়া লোকে যেমনি—গৌর গৌর—বলিত তাহা শুনিয়া সোনার বরণ নিতাইচাঁদ অমনি আনন্দে অধীর হইয়া বালকের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন। তাহা দেখিয়া সবার মনে হইত যেন একটী কনকপ্রতিমা ধূলায় লুটিতেছে। দয়াল নিতাইচাঁদ ক্রোধ কাহাকে বলে, অভিমান কাহাকে বলে জানিতেন না, সদাসর্ব্বদাই প্রেমানন্দে মাতোয়ারা। প্রেমোন্মত্ত নিতাইচাঁদ গৌরভজাইতে গিয়া যদি কোন দুষ্ট দুর্জ্জন তাঁহাকে মারিতে আসিত তখন

সেই প্রেমের প্রভু তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেন আর বলিতেন "মারবি মার, তবু একটী বার ভাই গৌর বল।"

জগৎগুরু শ্রীনিত্যানন্দের মহতী কৃপায় তাঁহার ঐ গৌরভজন স্বভাবটী শ্রীগুরুদেবের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। নাম কীর্ত্তন-কারী, কীর্ত্তনবিহারী শ্রীগুরুদেবের যে সকল অস্বাভাবিক ভাব-প্রেমের অভিব্যক্তি হইত তাহা দেখিয়া অতিবড় পাষাণহৃদয়ও "হা নিতাই হা গৌর" বলিয়া কাঁদিত। সারাটী জীবন তিনি শ্রীনিতাই গৌর পদাঙ্কিত ভূমিতে বিচরণ করিয়া গৌরনাম, গৌরলীলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তন ধ্বনি যাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, যে তাঁহার সেই গৌর গুণে ঝুরা কাঁদা বদন একটীবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে আর গৌর না ভজিয়া থাকিতে পারে নাই। এই গৌরভজানো স্বভাব-বশে শ্রীগুরুদেব নিতাই চাঁদের কৃপা-শক্তি লইয়া কত অধম কত পতিত জনের দুয়ারে দুয়ারে গিয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া গৌরগুণসিন্ধুর গুণ শুনাইয়া তাঁদের হৃদয় গৌরপ্রেমে ভাসাইয়াছেন, পূজনীয় জীবন দাদা শ্রীগুরুদেবের সেই সকল লীলার মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই গ্রন্থের মধ্যে। পূজনীয় দাদা কৈশোর বয়সে পাঠ্যাবস্থাতেই সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত অশ্রু-প্লাবিত শ্রীগুরু দেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের গুণ শুনিয়া আর গৃহে থাকিতে পারেন নাই। স্কুল ছাড়িয়া আত্মীয়-স্বজন-গৃহ-পরিজনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা প্রসূত স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া কিভাবে নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার একটী মধুর দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন, এই গ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থে শ্রীপাদের লীলা-কথা পাঠ করিলে সত্যই প্রাণ ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া উঠে। জীবনদাদা দীর্ঘ ৪৫ বৎসর যাবৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সান্নিধ্যলাভে তাঁহার লীলা দর্শন করিয়াছেন, সেই কয়েকটী লীলা তিনি আমাদের উপর বড় কৃপা করিয়াই এই

গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বহু অজানা লীলা কথাই জানা হয়।

যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার মধুময় সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, এখন তাঁহাকে হারাইয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবকে চোখের সামনে দেখিতে পাইয়া ধন্য হইবেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান নাই, লোক মুখে তাঁহার গুণ শুনিয়া অদর্শনের ব্যথা প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন—তাঁহাদের সেই ব্যথা প্রশমিত হইবে এই গ্রন্থ অধ্যয়নে। জয়গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু ॥

রাসপূর্ণিমা—
১৩৬৭ সাল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস
তর্কতীর্থ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি—শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

জয় শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।

শ্রীগুরু-লীলা-কথা

নিবেদন

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন লাভের সৌভাগ্য পাই ১৩ বৎসর বয়সে; আমি তখন স্কুলের ছাত্র। তারপর ১৫ বৎসর বয়সেই গৃহত্যাগ করি তাঁহার কৃপাশ্রয় পাইবার লালসায়। গৃহের বাহির হইবার পর ২ বৎসর ঘুরিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করি। অতঃপর প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার মধুময় লীলা দেখিবার সৌভাগ্য পাই। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার অফুরন্ত লীলা-মাধুরী আমার নিকট প্রকটিত করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত লীলা-কথা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া আছে। একটিও ভুলি নাই। ভুলিতেও পারা যায় না।

বহু বৎসরের লীলা-কথা সবই আমার মনে পড়িতেছে, তাই তাঁহার লীলা-মাধুরী লিপিবদ্ধ করিয়া আমি নিজে ধন্য হইলাম।

শ্রীগুরু কথা সবারই জীবাতু। তাই এই শ্রীগুরু লীলা-কথা সকলকে উপহার দিবার আগ্রহে প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারাই ইহা পাঠ করিবেন, আশা করি, তাঁহারাই কৃতার্থ হইবেন।

যাঁহার প্রেম-সিঞ্চিত-নয়নে প্রেমামৃত ধারা বহিত, বদনে সর্ব্বদা মৃদুমন্দ মধুর হাসির লহরী খেলিত; শ্রীশ্রীনিতাই ও শ্রীশ্রীগৌর গুণগানে যাঁহার অঝোরে অশ্রুজল বর্ষিত হইত, শ্রীঅঙ্গ অশ্রু, কম্প, পুলক, হাসি, হুঙ্কারাদি অষ্ট সাত্বিক ভাবে বিভূষিত থাকিত; ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবচরণযুগলে যিনি সর্ব্বদা দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেন, সমস্ত দেব দেবীর কৃপা লাভের জন্য যিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি ও বিজ্ঞপ্তি জানাইতেন; শ্রীমৎ গোস্বামী সন্তানদের চরণে যাঁহার অচলা মতি দেখিয়াছি,—আচার্য্য সন্তানেরাও যাঁহাকে 'রামদাদা' বলিয়া প্রীতি সম্বোধন করিতেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ভূমি শ্রীনীলাচল, শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত এবং যিনি ব্যাকুল প্রাণে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা কীর্ত্তনে সকলকে প্রেমানন্দ-দানে ধন্য করিতেন; শ্রীনীলা-চল-ধামে রথযাত্রার সময় যিনি শ্রীগৌরলীলা স্মরণে ব্যাকুল প্রাণে সহস্র সহস্র ভক্ত সঙ্গে লইয়া রথাগ্রে ও গম্ভীরায় কীর্ত্তন করিতে করিতে অঝোরে অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া পড়িতেন; যিনি শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় স্বহস্তে ঝাড়ু ধরিয়া ভক্ত সঙ্গে মার্জ্জনা করিতেন, শ্রীটোটা গোপীনাথে যাইয়া যিনি কীর্ত্তনে শ্রীনিতাই-গদাই-গৌরলীলা স্মরণে আকুল প্রাণে কাঁদিতেন এবং অতি উত্তম চাউলের অন্ন ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেন; যিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসবে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত-বাৎসল্য-লীলা স্মরণে ভিক্ষা করিয়া উৎসব করিতেন; যিনি তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীনিতাই-গৌর-প্রেম পাগল ১০৮ শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব উৎসবে লক্ষাধিক ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন; যাঁহার চরণ-যুগল দর্শন করিবার মানসে হাজার হাজার লোক ছুটিয়া আসিত,

লক্ষ লক্ষ লোক যাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করতঃ নামমন্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইতেন; যিনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব লীলায় পানিহাটিতে গিয়া বট বৃক্ষতলে বসিয়া কীর্ত্তনে অজস্র ধারে রোদন করিতেন, সেই পরম ভাগবত, মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের রাতুল চরণযুগলে আমার নিত্য বসতি হউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যখন স্কুলে পড়ি—আমার তের বৎসর বয়স, সেই সময়ে শ্রীবাবাজী মহারাজ আমাদের দেশে যশোহর জেলার মাগুরা সাবডিভিসনে সদলে কীর্ত্তন করিতে আসেন। মাত্র দুইটি দিনের জন্য তখন তাঁহার অভয় রাতুল চরণযুগল দর্শন পাই। তৎকালে শ্রীবাবাজী মহারাজের বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে।

তাঁহার অযাচিত করুণায় আমি আর গৃহে থাকিতে পারি নাই; অল্প কিছুদিন পরেই মা, ভাই, বোন ও আত্মীয়স্বজন সকলের মমতা কাটাইয়া তিনি আমাকে গৃহের বাহির করিয়া লন এবং দুই তিন বৎসর সাধু সঙ্গে পথে পথে ঘুরাইয়া পরে চিরজীবনের মত তাঁহার সুশীতল চরণাশ্রয় দেন। প্রায় দীর্ঘ ৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁর মধুময় সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য তিনিই কৃপা করিয়া দান করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ দিন ব্যাপী তাঁহার সঙ্গসুখ ও মাধুর্য্যময় লীলাকথা সমস্তই আমার মনে আছে।

মদীয় শ্রীগুরুদেব ১৩৬০ সালে ১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে তাঁহার বরাহনগর শ্রীপাঠ বাড়ীতে আমাদিগকে—নাম কর—বলিয়া শেষ আদেশ দান করতঃ স্বয়ং নাম করিতে করিতে নামসংকীর্ত্তনে সমাশ্রিত হইয়া অপার লীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-কথা, করুণার কথা কিছুই ভুলি নাই ভোলাও যায় না। তাঁর পূত জীবন কথা সবই মনে পড়িতেছে।

আজ ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাস, আমি আমার জীবনের শেষ

সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি ;—তাঁহার কিছু কিছু লীলা-কথা লিখিবার শ্রীগুরুপ্রেরণা পাইতেছি।

শ্রীগুরুদেবের চিত্রপট আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন, বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি ; তাঁর অপার লীলা-মাধুরী মনে ভাসিয়া উঠিতেছে ;—কলম ধরিয়া লিখিতে বসিলাম। সেই ১৩ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার করুণার দান যে সকল অফুরন্ত লীলা-কথা আমার মনে পড়িতেছে তাহারই কিছু কিছু যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার আকিঞ্চন।

মদীয় শ্রীগুরুদেবের অগণিত ভক্ত, শ্রীগুরু কথা শ্রীগুরুভক্ত মাত্রেই পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। এই আশায় বুক বাঁধিয়া সমস্ত শ্রীগুরুভক্ত চরণে কাতর প্রার্থনা করিয়া "শ্রীগুরু-লীলা কথা" লিখিবার প্রয়াস পাইলাম। এ যেন পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন! সকলে আমায় কৃপা করুন।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত.
জীবন

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রীল শ্রীমদ্ রামদাসবাবাজী মহারাজ

শ্রীগুরু-লীলা-কথা

শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান ফরিদপুর। তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বে বারো ক্রোশ দূরে কুমারপুর গ্রাম, মাদারিপুর মহকুমা; পালং থানা। তাহার পিতার নাম শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত ও মাতার নাম শ্রীমতী সত্যভামা দেবী। তাহাদের বাড়ী কুমারপুর গ্রামে— আবার ফরিদপুর সহরেও একটি বাড়ী ছিল। ফরিদপুরে ১২৮৩ সালে, ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজের জন্ম হয়। ইনি অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের নবজাত পুত্রের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করলেন। পাঁচ মাস গত হওয়ার পর তিনি পুত্রকে কোলে লইয়া সহরের বাড়ী হইতে এই প্রথম গ্রামে এলেন। ১২৮৪ সালে ২৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হয়।

বাড়ীতে কুলদেবতা শ্রীশ্রীঅনন্তদেব। শ্রীঅনন্তদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রসাদ তাঁর মুখে দেওয়া হল এবং নাম করণ হল শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত। তারপর মাঝে মাঝে তাঁকে সহরের বাড়ীতে ফরিদপুরে নিয়ে যাওয়া হত। এইরূপ ভাবে রাধিকার পাঁচ বৎসর কেটে গেল। স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনা কোত্তে লাগলেন। পড়াশুনা তাঁর ভাল লাগতো না। শিশুকাল হতেই গান কীর্ত্তন শুনতে তাঁর তীব্র অনুরাগ। কেবল ঠাকুর দেবতা নিয়েই দিনগুলো কাটতো। আট বৎসর

বয়সে তিনি অত্যধিক শ্রুতিধর বলে পরিচিত হলেন। যে গান শোনেন তাই আয়ত্ত ক'রে ফেলেন। আবার ভগবৎলীলা-অভিনয় দর্শন তাঁর বড়ই প্রিয়।

শ্রীরাধিকা গুপ্ত বড় হলেন, অপূর্ব্ব প্রাণ মাতানো তাঁর কীর্ত্তন। তাতেই তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর দর্শন পেলেন, কত কত বৈষ্ণব সাধুর ও ভক্তের সঙ্গলাভ করলেন। তাঁর বড়ই মধুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে কত লোকের সমাগম হতো। এইরূপ ভাবে তাঁর কিশোর কাল কাটলো। স্কুলে ছাত্র অবস্থাতেই শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের দর্শন পাবার পর তিনি সংসারে বৈরাগ্যবান্ হন, তারপর বহু দিন শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর, জয় নিতাই, রমেশ বাবু প্রভৃতি অনেকের সঙ্গ লাভের পর, শ্রীধাম পুরীর বড় বাবাজী (শ্রীরাধারমণ চরণ দাস) মহারাজের দর্শন শ্রীনবদ্বীপ ধামে লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে চিরদিনের মত আত্মসমর্পণ করলেন। সকলেই তখন তাঁকে শ্রীরামদাস বলতেন। তারপর থেকেই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সবাইকে নাম কীর্ত্তন শুনিয়ে দেশ বিদেশে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁর অফুরন্ত জীবনীর সামান্য যা কিছু জানি তাহা নিবেদন করিবার বাসনা। তাঁর পূত জীবনী—"চরিত মাধুরী" দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর সমস্ত জীবনী সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অফুরন্ত জীবনীর আরো কত বাহির হবেন। আমি কিশোর কাল হতেই তাঁর মধুময় সঙ্গ পেয়েছিলাম। তাঁর অপার করুণা এবং মহিমাময় লীলা-কথা আমার বেশ মনে আছে, তবে তাঁর অফুরন্ত কৃপা ও অসীম লীলা-কাহিনী আমি আর কতটুকুই বা জানি। পাঠক পাঠিকাগণ চরিত মাধুরী গ্রন্থ পড়লে বুঝবেন কি ব্যাপক ও মধুর তাঁর লীলা। কত কত লোকের সঙ্গে কত অফুরন্ত তাঁর বিচিত্রময় লীলা! কে কত টুকুই বা জানতে পেরেছে! আমার জীবনে তাঁর মধুময় সঙ্গে যে অপূর্ব্ব লীলাবৈচিত্র্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে আমি তাহারই সামান্য কিছু গ্রথিত করিয়া উপহার দিতেছি।

আমার জন্মভূমি মাগুরা। ইহা যশোহর জেলার একটী সাবডি-ভিসন। আমি কৈশোরে সেইখানে শ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণযুগল দর্শন লাভের সৌভাগ্য পাই। সেই কারণে আমার জন্মস্থান, আমার বাল্য কালের কথা ও তাঁর অযাচিত কৃপা কিরূপ ভাবে আমার জীবনে সিঞ্চিত হয়েছিল, তাহাই একটু লিখবো। ধন্য আমার সেই জন্মভূমি যেখানে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম প্রথম দর্শন করি ও তাঁর পাষাণ গলানো কীর্ত্তন শুনবার সৌভাগ্য পাই। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের দর্শন লাভ ও তাঁর করুণা লাভের সৌভাগ্য আমার বাল্যকাল হতেই সুরু হয়। তাই আমার বাল্যকালের কথাও একটু না লিখে পারলাম না।

১৩ বৎসর বয়সে আমার যজ্ঞোপবীত হয়,—আমি নূতন ব্রহ্মচারী। ব্রাহ্মণেরা ১১ দিন হবিষ্যান্ন করে ব্রহ্মচর্য্য পালন শেষ করেন; তারপর প্রবৃত্তি অনুযায়ী কেউ কেউ আমিষ ভোজন করেন, সন্ধ্যা-গায়ত্রী জপ করেন, আবার কেউ করেন না। মায়ের মুখে শুনি আগে ব্রাহ্মণেরা ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও শ্রীগুরু সেবা ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ কোত্তেন। আমি এই কথা শুনে তেল মাখা ছাড়লাম, চুল রাখলাম এবং হবিষ্যান্নও করতে আরম্ভ করলাম। ভোরে স্নান করি, গায়ত্রী জপ করি, তেল মাখিনা, মাছ খাইনা;—এইজন্য স্কুলের বন্ধুরা আমাকে সাধু ব'লে হাস্য পরিহাস করে। থার্ড ক্লাসে তখন পড়ি। স্কুলে যাই মাত্র। বাড়ীতে এসে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে একখানা গ্রন্থ খুব মন দিয়ে পড়তাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী পড়বার বাসনা জাগে একটা কারণে।

একদিন বাড়ীতে এক ভিখারী বৈষ্ণব আসেন তার সঙ্গেও একজন ভিখারিণী। কপালে তিলক, কণ্ঠে তুলসী মালা দেখে সবাই তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ কোরতে লাগল। বৈষ্ণব হয়ে মেয়ে মানুষ রেখেছ কেন? বেটা বেটীকে তাড়াও এখান থেকে—ভণ্ড কোথাকার! আমার বন্ধুরা তাদের বাড়ী হইতে বাহির করবার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগল;

কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণে আহত হয়ে ঐ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—হা নিতাই! আমাদের তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। হে দীনবন্ধু, পতিত পাবন! তোমায় যেন ভুলি না। আমি তাদের এই আর্ত্তিভরা কথা শুনে বন্ধুদের নিবারণ করে তাদের ডেকে বসালাম এবং বললাম,—একটা গান শোনালে ভিক্ষে দেবো।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী আমার কথা শুনে একটু প্রসন্ন হয়ে গান ধরলেন, "মাটিতে চাঁদের উদয় দেখবি যদি আয়। এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিসনি দেখবি নদীয়ায়। হেরিয়ে গৌরাঙ্গ চাঁদের মুখশশী, লাজে গগন চাঁদ পড়ে খসি, এ চাঁদ ষোল কলায় পূর্ণ দিবানিশি, হেরে পাপতাপ তমোরাশি দূরে পালায়। যজ্ঞসূত্রে কিবা শোভে গলা, তুলসীমালা করে হেলাদোলা, রাধাপ্রেমে হয়ে ভোলা, আপনি কাঁদিয়ে গোরা জগৎ কাঁদায়। অনুরাগ-কলঙ্কে হৃদে পোরা, পীত ধড়া ত্যজে কোপীন্ পরা. রাধাপ্রেমে সদা বহিছে ধারা, আপনি ভাসিয়ে গোরা জগৎ ভাসায়।" ইত্যাদি। গান শুনে মুগ্ধ হলাম।

আমি ঐ বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি একটি মেয়ে মানুষ রেখে বৈষ্ণবের বেশে ভিক্ষা করে বেড়ান কেন? তিনি সজল নয়নে, নিষ্কপটে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি জাতিতে নীচ ছিলাম আর এই মেয়েটি আরও নীচ জাতি, এক গ্রামেই বাস। হঠাৎ আমার দুর্দ্দৈব বশে ইহার সহিত প্রণয় হয়। গ্রামবাসী আমাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। আমরা তখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে খুঁজতে লাগলাম, কে আমাদের আশ্রয় দেবে। এই পতিত জনকে কোন ধর্ম্মই আশ্রয় দিবেন না। শ্রীনিমাই চাঁদ ও শ্রীনিতাইচাঁদ নাকি পতিতের বন্ধু, পতিতপাবন। তাই তাঁদেরই চরণ একমাত্র আশ্রয়স্থল জেনে নবদ্বীপ ধামে এসে এই কাঙ্গাল ভিখারীর বেশ গ্রহণ করি এবং পতিতের বন্ধুর গুণ গেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি।" তাঁর জীবনের এই নিষ্কপট সরল পরিচয় শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে কিছু ভিক্ষা দিলাম, তাঁরা আস্তে আস্তে অন্যত্র চলে গেলেন।

মানুষ নিজের কালিমার কথা, দোষের কথা এমন সরল ভাবে বলতে পারে! বলিহারী নিতাই চাঁদের করুণা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা! দানের পাত্রাপাত্র নাই। তাঁর এত করুণার অভিব্যক্তি দেখে এই গৌরাঙ্গ চাঁদকে জানবার জন্য তাঁহার জীবনী খুঁজতে লাগলাম। 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ও 'অমিয় নিমাই চরিত' স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বের করে পড়তে লাগলাম। এইভাবে তাঁহার পূত জীবনী এবং তাঁর লীলা মাধুরীতে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হতে লাগলাম।

আমার জীবনের সেই শুভ মহেন্দ্রক্ষণে ঐ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মুখে নিতাই-গৌর নাম শুনলাম! তাঁদেরই করুণায় আমি নিতাই গৌর প্রেমের পাগল আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ পাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত জীবনী জানবার ও তাঁর লীলাস্থলী দর্শনলাভের সৌভাগ্য পাই। হায়! আমরা প্রায়ই এই সমস্ত ভিখারী বৈষ্ণবকে ঘৃণা করি।

সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেছি। স্কুলে যাই মাত্র। এখন শ্রীগুরুপদ মিত্র নামে আমাদের এক মাস্টার মহাশয় ছিলেন, তিনি আমাকে অতি স্নেহ করতেন; তাঁর সদুপদেশ ও মধুময় সঙ্গ পেয়ে সর্ব্বদাই আমি ধন্য বোধ করতাম। আমার বড়দা শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেজদা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দাদা শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; এঁরাও তখন আমাকে কত উপদেশ দিতেন। শ্রীশ্যামাকান্ত সরকার মহাশয় আমাদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি সপ্তাহে একদিন করে ছাত্রদের নিয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করতেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে আসতাম। বাড়ী ফিরলেই কাকা শাসন করতেন। উত্তম মধ্যম প্রহারও মাঝে মাঝে লাভ করতাম। এমনি করেই তখন আমার জীবন কাট্‌ছে। প্রহ্লাদের চরিত্র পড়ে সন্ধ্যার সময় নির্জ্জন মাঠে বসে—হরি দেখা দাও—বলে কত কাঁদি আবার রাত্রি বেশী হলে ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফিরে আসি। এই ব্যবহারে বাড়ীর সবাই চটে গেলেন। একদিন রাত্রি ১০টার সময় শীত কালে তাড়াতাড়ি মাঠ

হতে ফিরে এসে চুপি চুপি লেপ মুড়ী দিয়ে শুয়ে পড়লাম, অমনি একজন ছুটে এসে আমায় লাঠি দিয়ে খুব পিটলেন, ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললেন,—পড়া শুনা মোটেই করা নেই, কেবল বিটলামি, হরি দেখা দাও বলে মাঠে গিয়ে কাঁদা ; ফের যদি পড়াশুনা ছেড়ে এমনি করে বেড়াবি তো মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। মা এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—ছেলে মানুষ ওকে অত শাসন কেন ? ও তো অন্যায় কিছু করেনি ! মা আমার চিরদিনই এই পথের সহায় ছিলেন। মা'র অপার করুণাই আমার জীবনে একমাত্র পাথেয় ও সম্বল। তারই অপার কৃপায় আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মসান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পাই।

এইরূপ ভাবে আমার জন্মভূমি মাগুরায় দিনগুলো কাটতে লাগলো। এখন আমার পিতার পরিচয় দিচ্ছি। আমার পিতার নাম ৺যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমরা পাঁচ ভাই ও এক বোন। পিতা শিশুকালেই আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চ'লে যান। আমরা তখন নাবালক। বাবা ও কাকারা তিন ভাই ছিলেন। মেজকাকা ও ছোট কাকা আমাদের আশ্রয় দিলেন ; কিন্তু ছোট কাকাই আমাদের ভরণ পোষণের ভার নিলেন।

ছোট কাকা খুব বড় উকিল ছিলেন। বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তখন বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন নিয়ে প্রায় ৭০ জন লোক বাস করতেন। সবাইকে কাকা অন্নদান করতেন ; স্বোপার্জ্জিত অর্থে ১৪ জনকে গ্রাজুয়েট করেন। পুকুর ভরা মাছ ; হাঁস, পাঁঠা, খাসি ও ভেড়া প্রায় ৩০০ ছিল। আবার বড় বড় মুলতানী গরুও ছিল। প্রচুর দুধ হোতো। নিত্য মৎস্য মাংস ভোজন, ভোগ সুখের তাণ্ডব নৃত্য সেখানে। আমি মাছ মাংস খাইনা, সাধু ভণ্ড বলে উপেক্ষিত হই। পরিহাস বেশী লোকেই করে, তবুও আমি আমার পথকে আঁকড়ে ধরে থাকি। ভয়ানক একগুঁয়ে ছিলাম।

আমি এখন মা দুর্গার চিত্রপট, মহাদেবের চিত্রপট ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের চিত্রপট ফুল দিয়ে সাজাই, ধূপ ধূনা দেই ; কত মৃন্ময় মা

মা বলে কাঁদি ; হরি দেখা দাও বলে কাঁদি, কিন্তু দেখা পাইনা ; তাই হৃদয়ের বেদনা যায় না। এমনি করেই আমার দিনগুলো কাটতে লাগল। একদিন ভায়নার মাঠে কত কাঁদতে লাগলাম ;—ঠাকুরের নাম করে ও প্রার্থনা করে। আহা ! সেখানকার মুসলমানরা এসে আমায় ঘিরে আমার আর্ত্তি দেখে চোখের জল ফেলতে লাগল। আমার এক বন্ধু মুসলমান ছিলো, সে আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বললো, ভাই তুই এত কাঁদিস না, খোদা নিশ্চয়ই তোকে দর্শন দিবেন। দু'বার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই সাধু হোতে, আত্মীয়রা ধরে নিয়ে আসে, শাসন খুবই হয়। এইরূপ ভাবে চৌদ্দ বৎসর অতীত হ'তে চলল।

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি মাত্র, ১ মাস পড়েছি। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম, শ্রীনবদ্বীপ ধাম হ'তে ২৫।৩০ জন বৈষ্ণব সাধু এসেছেন, তাঁরা নলিনী বাবুর কাঠের আড়তের কাছে—স্কুল থেকে অল্প দূরে—এক বাড়ীতে থাকেন। এখন আমাদের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করছেন। টিফিনের ছুটী মাত্র আধ ঘণ্টা, আমি সেই অল্প সময়ের জন্য হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর বৈঠকখানায় তাঁদের দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম,—একজন বৈষ্ণব, তাঁর অপূর্ব্ব সুঠাম অঙ্গ কান্তি, আবার মাসকুলার দেহ, একটি বহির্ব্বাস পরিধান মাত্র, চাদরটি দলা করে বালিস করেছেন, একটি সতরঞ্চির উপর নিদ্রা যাচ্ছেন।

আমি দূর থেকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অভিরমণীয় সুঠাম মূর্ত্তি দেখছি, অমনি তিনি জেগে উঠে বসলেন। স্নেহ বশে ডেকে কাছে বসতে বললেন। প্রফুল্ল বদন, মৃদুমন্দ হাসি, মধুর প্রেমমাখান দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি স্কুলে পড় ? চুল রেখেছ, তেল মাখ না, সাধু হবে নাকি ? আমি উত্তর দিলাম,—সাধু হওয়া খুব কঠিন, দু'বার সাধু হোতে গেছলাম, ধরে নিয়ে এসেছে সব, মারও খেয়েছি তার জন্য। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—নাম কি তোমার ? আমি বললাম, শ্রীজীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; অমনি বললেন, তুমি

ব্রাহ্মণ। আমায় দণ্ডবৎ করলে কেন? আমরা বৈরাগী, বৈরাগিরা ব্রাহ্মণকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমি হেসে বললাম,—আপনারা সাধু বৈষ্ণব, আপনাদের ব্রাহ্মণ কেন সমস্ত লোকই শ্রদ্ধাভক্তি করবেন; আমার মা'র কাছে বৈষ্ণবের মহিমা শুনেছি। আরও কাছে তিনি ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—তোমার বুঝি সংসারে থাকতে মন নেই। আমি বললাম,—হাঁ।

এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী (শ্রীবাবাজী মহাশয়ের গুরু ভাই) কাছে এসে বললেন—দেখছোনা দাদা, ও তো সংসার ছেড়ে চলে যাবেই, আমার এই কথা মনে আসছে। আবার বললেন,—তুমি আমাদের সঙ্গে সাধু হয়ে চল না! আমি বললাম—না আমি যাব না, মা কাঁদবে। মা'র চাইতে আর বড় কেউ নেই। আমার এই কথা শুনে শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় আনন্দে মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিভরা মুখখানি যেন আমার হৃদয় মাঝে গেঁথে গেল। কত সখ্য-প্রীতি করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—কি খাও, কি পড়ছ? আমি বললাম,—মা হবিষ্যি রেঁধে দেন, তাই খাই। স্কুলের পড়াশুনা ভাল লাগে না। অমিয় নিমাই চরিত, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এই সব পড়ি। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে লুকিয়ে রেখে পড়ি! পাছে কেউ টের পায়, তাহলে মারবে আমায়।

এই রকম তাঁহার সহিত কথা বলতে বলতে আমি হঠাৎ নির্ভয় চিত্তে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনারা সাধু, দিনে ঘুমোন কেন? সাধুরা তো দিনে ঘুমোয় না,—দাদার মুখে শুনেছি; তবে আপনারা ঘুমোচ্ছেন কেন? তিনি এই কথা শুনে একটুও বিরক্তি বোধ না ক'রে হেসে উত্তর দিলেন,—কাল সমস্ত রাত্রি ষ্টিমারে জেগে বসে এসেছি। আবার আজ সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হবে। কীর্ত্তন শেষ হোতে বোধ হয় রাত্রি ২।৩টা বেজে যাবে, তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম। শরীর থাকলে আহার নিদ্রা স্নান সবই চাই। তা না হলে দেহ খারাপ হয়ে যায়, আর ভজন কীর্ত্তন হয় না। অমনি শ্রীঅদ্বৈত

দাস বাবাজী বললেন, তুমি স্কুলে পড় এটা জাননা? ভারি সাধু হয়েছ! আমি তাঁর কথা শুনে নিজের দোষ বুঝে মাটির দিকে তাকিয়ে রহিলাম—যেন কত দোষ করে ফেলেছি।

একটু পরেই টিফিনের ছুটীর ঘণ্টা বেজে গেল, আমি চকিতের মত উঠে দাঁড়ালাম। অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—সন্ধ্যার সময় এসো কীর্ত্তন শুনতে; তুমি তো গান কীর্ত্তন ভালবাস! আমি আনন্দে হেসে উত্তর দিলাম,—নিশ্চয়ই আসবো; এই বলে রওনা হলাম। আবার একটু পরে কৌতূহল বশে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি ডাম্বেল ভাজেন? নইলে এমন সুন্দর মাস্‌ল্, এই বলে তাঁর হাতের মাস্‌ল্ টিপে দিয়ে দেখি মাখনের মত কোমল, অথচ হাত নাড়লে, একটু হাঁটলে হাতে পায়ে মাস্‌ল্ ফুলে ওঠে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম; কারণ, আমরা তখন শরীর চর্চ্চা একটু একটু করি,—ডাম্বেল ভাজি, প্যারালাল বার করি, ডন করি। তবুও তো এমন সুন্দর মাস্‌ল্ আমাদের কারও দেখতে পাইনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার কিশোরবালকসুলভ ব্যবহার দেখে হাসতে লাগলেন। একটু পরে বললেন,—যাও, স্কুলের ঘণ্টা বেজে গেছে—পড় গিয়ে, সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন শুনতে এসো।

আমি স্কুলে চলে গেলাম কিন্তু তাঁর সেই মধুর হাসি ও সুঠাম ভাবময় স্বরূপ ভুলতে মোটেই পারলুম না। স্কুলের ছুটী হয়ে গেল। ভাবতে লাগলুম,—অতবড় সাধু আমায় ভালবাসলেন; চিত্তাকর্ষক কথা হেসেও বললেন,—এ একটা মস্ত ভাগ্য, এই সব চিন্তা কোরতে কোরতে সন্ধ্যা হোল, চুপি চুপি বাড়ীতে কাউকে না বলে তাঁদের কাছে এলাম।

এসেই দেখি শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে গিয়ে বসলেন, আমি গিয়া দণ্ডবৎ করলাম, অমনি বললেন,—ময়না এসেছো? আমি ভাবতে লাগলাম আমার ময়না নাম কি করে তিনি জানলেন। মা-ই আমার আদর করে ময়না নাম রেখেছিলেন; ইনি জানলেন কি,

করে ? অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—আমি তোমার ময়না নাম জেনেছি, এসো বোসো, কীর্ত্তন শুনবে। আমি তাঁর কথায় এক পাশে গিয়ে কীর্ত্তন শুনতে বসলাম। তিনি কীর্ত্তনের আগে করতাল নিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করতে লাগলেন। সমস্ত দেহ মৃদুমন্দ কাঁপতে লাগল, আবার বেশ একটু বেশী কেঁপে উঠলেন। খোল বাজানো শেষ হোলো। কি মধুর মৃদঙ্গের বাজনা, ১২।১৪ ঝাল করতাল বাজছে, যেন নূপুর ধ্বনি হোচ্ছে।

প্রেমানন্দে--নিতাই গৌর হরিবোল—বলে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। উদারা স্বরে নাভির মূল হোতেই নাম বাহির হল, "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" কি মধুর কোমল সুরে নাম কীর্ত্তন আবির্ভাব হোলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক হাজার লোকের আসর একেবারে নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেল। ভাবলাম, এঁরা কি যাদুমন্ত্র জানেন! এত গোলমাল হচ্ছিল—ভজ নিতাই, বলা মাত্রই সব কোলাহল থেমে গেল। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ মণ্ডল চক্‌চক্ কোরছে, এমন মসৃণ মুখ যেন সদ্য তেল মেখেছেন।

বয়স তখন বোধ হয় প্রায় ৩০, কিন্তু মনে হোচ্ছে ১৭।১৮ বৎসরের একটী নবীন যুবা পুরুষ। যেন সর্ব্বচিত্তআকর্ষক স্বরূপ! সমস্ত লোক তাঁর মুখ পানে তাকিয়ে তাঁর সেই অমৃতময় মধুর নাম কীর্ত্তন শুনতে লাগলেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠের তুলনা হয়না; কখনও এমন মধুর কণ্ঠস্বর আমি কোনো দিন আর কারও মুখে শুনিনি।

কীর্ত্তন করতে করতে অশ্রু, কম্প, পুলক, হাসি এই সমস্ত দিব্যভাব তাঁর মধুর শ্রীঅঙ্গে বিভূষিত হ'তে লাগল;—চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কখনও বালকের মতন আকুল ক্রন্দন দেখতে পাচ্ছি, আবার পরক্ষণেই দেখছি হাসির ফোয়ারা উঠছে! শরীরে এমন কম্পন হোচ্ছে যে দেহটা চেনাই যায়না, আবার কাঁপতে কাঁপতে মাটির থেকে উপরে উঠে পড়ছেন; এমন এক একটি

হুঙ্কার দিচ্ছেন যে মানুষ সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যে'তে লাগল। আমার মাষ্টার মশায়রা ছাত্রবৃন্দরা ও মাগুরার উকিল মোক্তাররা এই সব দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম—পিতার শোকে, পুত্রের শোকে, স্ত্রীর শোকে কত লোকেরই ত এমনি কাঁদা-বদন দেখেছি কিন্তু ঠাকুরের নাম ক'রে এমন চোখের জল ফেলতে কাউকে কোন দিনই দেখিনি। এই সাধু নিশ্চয়ই ভগবানকে পেয়েছেন ও নিশ্চয়ই তাঁকে দেখেছেন। আবার হয়ত অদৃশ্য হ'চ্ছেন ঠাকুর, তাই তাঁর এই বিরহ-বেদনাশ্রু উপচে পড়ছে। নীরব নিস্পন্দের মতন আমি বসে বসে তাঁর মুখ দেখছি আর অলক্ষিতে তাঁর কাঁদা-বদন দেখে নিজেও কেঁদে ফেলছি। আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি সমস্ত লোকই কাঁদছে, যেন কান্নার হাট বসে গেছে। আমি মনে মনে ভাবছি, ইনি নিশ্চয়ই যাদু জানেন, আবার ভাবছি, দুরছাই তাকি হয়! ইনি কৃষ্ণ-প্রেমে কাঁদছেন বলে সবাইকে কাঁদতে হোচ্ছে। এমন ক'রে ঠাকুরের নাম ক'রে কি কেউ কাঁদতে পারে? ইনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ, ভগবদ্ভক্ত।

বৈষ্ণবের মহিমা, ভক্তের মহিমা যে কত বড় তা কি তখন বুঝি! নিজে সাধু সেজেছি, তেল মাখিনা, মাছ খাইনা বলে বেশ অভিমান মনে আছে। আর এই বৈষ্ণব সাধু তেল মাখেন, দিনে ঘুমোন, কত সুন্দর সুন্দর প্রসাদ তাঁর আসে, অবশ্য তিনি বেশী খাননা, প্রসাদ আঙ্গুল দিয়ে ঠেকিয়ে মুখে দেন—খান কিন্তু একটু রসা অন্ন, তবুও তাঁর এত ভক্তি এত লোক আকর্ষী স্বরূপ। নিজে হরিনাম ক'রে কেঁদে সমস্ত লোককে কাঁদাচ্ছেন! কই এমন প্রভাব তো কারো দেখিনা, শুনিওনি কোনদিন। ইনি নিশ্চয়ই একজন বড় বৈষ্ণব সাধু;— বৈষ্ণবেরা নাম ক'রে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায় এই মাত্র জানি। আর এই বৈষ্ণব সাধুকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখে নাম কীর্ত্তন শুনবার জন্য দলে দলে লোক এসে স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে। নিশ্চয়ই

এঁর ভিতর ভগবান থাকেন। তাই তাঁর চুম্বুকের মতন আকর্ষী স্বরূপ। নইলে সাধারণ মানুষ কি এই রকম হয়! এই রকম কত কি ভাবছি। আবার তাঁর এমন অট্ট অট্ট হাসি দেখলাম যে চমকে যেতে হয়, এমন হুঙ্কার দিচ্ছেন যে চারিদিক যেন কেঁপে উঠছে। নাম-কীর্ত্তন করতে করতে বাক্য বন্ধ হয়ে গেল, কেবল কান্না। প্রায় একঘণ্টা এমনি কাট্‌ল আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো।

সেদিনের কীর্ত্তনের কথা আমার বেশ মনে আছে, তাহা এখনও ভুলিনি,—"আরে আমার নিতাই রে, ও পতিতের বন্ধু আরে আমার নিতাই রে, ও পতিতের বন্ধু আরে আমার নিতাই রে।" কীর্ত্তনে মাতন আরম্ভ হ'ল, মাতন আর থামেনা। এক একবার তাঁর এমন মস্তক ঘূর্ণিত হোচ্ছে যে বলে বোঝান যায়না, ভাবছি, একি ব্যাপার! কিছুই বুঝিনা তখন, কেবল অবাক হয়ে আছি। মাতন থামছে না, চোখের জল চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ছে। পাশের লোকেদের গায়ে গিয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে ভাব শান্ত হোলো।

শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী মশায় গামছা দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছাতে লাগলেন। এমনি ভাবে রাত্রি ১২টা পর্য্যস্ত বসে বসে কীর্ত্তন করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, সমস্ত পারিষদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন, অমনি আবার নাম কীর্ত্তন ধরলেন,—"পাগলের প্রাণারাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।" এই বলে নিজে নাচতে লাগলেন আর চকিতের মত পারিষদবৃন্দও নাচতে লাগল। শ্রোতারাও সব উঠে নাচতে লাগল, আমিও তখন নাচছি। নাচতে নাচতে ভাবছি, আমি কেন নাচছি; এমনি যেন একটা মোহাবিষ্টের মতন হয়ে গেছি। এমনি ভাবে কীর্ত্তনে নাচতে নাচতে দুটো বাজলো, তার পর 'গৌর হরিবোল' বলে কীর্ত্তন সমাপ্ত করলেন।

তাঁর মুখে সেই 'গৌর হরি বোল' যে কত মধুর লেগেছিল! তা এখনও কাণে বাজে, প্রাণকে আকুল করে ফেলে। তার পর কীর্ত্তন শেষ করিয়া কাছেই নদীর তীরে গিয়ে বসলেন, আমিও পিছনে

পিছনে গিয়ে তাঁদের কাছে বসলাম। তখন শ্রীল বাবাজী মশায়ের বেশ শান্ত ভাব, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি এখনও আছ, বাড়ী যাবে না? আমি কেঁদে বললাম,—না, আমি যাবোনা। তিনি বল্লেন—বেশতো এখানে প্রসাদ পাবে; তুমি বামুন, আমাদের ভোগ হয়, ব্রাহ্মণ পূজারী রেঁধেছে, এখানে কেউ মাছ খায়না মাছের নামও করেনা, মাছের হাঁড়িও কেউ ছোঁয়না। আমি হেসে বললাম, তবে নিশ্চয় প্রসাদ খাবো।

এমন সময় পূজারী এসে বললেন,—ঠাকুরের ভোগ হ'য়ে গেছে প্রসাদ পেতে আসুন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নেহ বশে আমায় হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে, পাশে বসিয়ে প্রসাদ পেতে ব'সলেন। আনন্দে সব পারিষদ সঙ্গে প্রসাদ পাচ্ছেন আর মধ্যে মধ্যে ধ্বনি দিচ্ছেন।

এই প্রথম, প্রসাদ পাবার সময় তাঁর মুখে ধ্বনি শুনলাম। আমরা শুধুই খাই। আর এঁরা প্রসাদ পাবার সময়ও শ্রীহরি ও শ্রীগৌর কিশোরের গুণ-গান গাইছেন! আমি এই সব ভেবে অবাক হ'য়ে পড়েছি। কি মধুর কণ্ঠস্বরে ধ্বনি দিলেন,—সে-কথা, সেই গৌর-গুণ-রূপ-কথা এখনও আমার কানে বাজে। শ্রীগৌররূপ বর্ণন কোর্চ্ছেন—ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে, চরণ উপর দুলিয়ে যেছে কোঁচা। বাগমল সোনার নূপুর বেজে যেছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা। দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল, কুঁদ মালতির মালা বেড়া ঝোঁটা। চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায়, কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা। বাহুর হেলন দোলন দেখি, হাতীর শুণ্ড কিসে লিখি, নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা। মধুর মধুর কয়গো কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা। এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে খানিক্ রাখে, নয়ন ভরে দেখি রূপখানি। লোচন দাস বলে,—কেন নয়ন দিলি গৌর পানে, দুকুল খেলি আপনা,

আপনি। আমি এই ধ্বনি শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

কি মধুর কণ্ঠ! কি প্রাণআকর্ষিণী বাণী! এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণ তো জীবনে কখনও শুনিনি। কীর্ত্তন শুনেছি, সেখানেও একটা উচ্চারণও বেফাঁস হয়নি। অথচ অত কান্না, অত ভাবপূর্ণ দেহ, তবুও তাঁর কথা অতি স্পষ্ট। আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছি। আবার প্রসাদ পেতে পেতে কি হাসি ঠাট্টা কোচ্ছেন, যেন আমাদেরই একজন সমবয়স্ক বন্ধু! সখ্য প্রেমে কথা বলছেন, ব্যবহার ক'রছেন। হঠাৎ আমার পাতে একখানা আলু ও ছানা প্রসাদ দিলেন, আলু ও ছানা দিয়ে রসা হয়েছে—একটু রসও বাটী থেকে ঢেলে দিয়ে বল্লেন,—খা। আমি অবাক হয়ে তাঁর দেওয়া প্রসাদ পেতে লাগলাম, অমনি মধুর হাসি হাসিয়া ব'ললেন—তোমার জাত গেল, বৈরাগীর এঁটো খেলে। কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লাম, তাঁর মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলাম, তিনি হাসতে লাগলেন।

হাসি যেন ঠিক বালকসুলভ হাসি। সে হাসি যে কী মিষ্টি, কী মধুর, তা বলে বুঝাতে পারবো না। যে তাঁর মৃদুমন্দ হাসি দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছে সেই শুধু বুঝতে পেরেছে কী মাদকতা কী সম্মোহন ঐ হাসিতে! যখন কীর্ত্তন করেন তখন আকুল ক্রন্দন দেখতে পাই, এমন কম্পন হয় যে শরীরটা চেনা যায়না, কিছুই বুঝতে পারা যায়না—একি ব্যাপার! আবার পরের দিন সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হবে শুনে বাড়ী চলে গেলাম।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরেই কিছু খেয়ে সন্ধ্যার সময় তাঁর কীর্ত্তন শুনতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রছেন। বহু গ্রাম হ'তে লোক ছুটে আসছে তাঁর ঐ পাষাণ-গলানো কীর্ত্তন শুনতে। আমিও কয়জন বন্ধু মিলে বসলাম কীর্ত্তন শুনতে। করতাল ও মৃদঙ্গ বেজে উঠলো, অমনি তিনি কপালে করতাল ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন আর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন।

তারপর প্রণাম দণ্ডবৎ সেরে নাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। নামের সঙ্গে মৃদঙ্গের অপূর্ব্ব বোল্ আর করতালের ধ্বনি মিশে হল যেন নূপুরের নিক্কণ ! শুধু নাম কীর্ত্তন কোর্চ্ছেন, তাতে এতই মধু ঝরছে যে ভাষায় তা ব্যক্ত করা অসম্ভব। এক ঘণ্টা শুধু নামকীর্ত্তন কত রকম মধুর সুরে ও ছন্দে গাইলেন ; তারপর পদ ধরলেন। দুই চারটে কথা ছাড়া পদ মনে নেই। গৌরাঙ্গ গুণ গাইতে লাগলেন, আমি তখন বালক, পদ-কীর্ত্তন কাকে বলে জানিনা তবুও সেই দিনের একটা কথা, ঐ একটী কীর্ত্তন আজও আমার বেশ মনে আছে।

বহু দিনের কথা তবু এখনও তাঁর শ্রীমুখের কথাটি মনে যেন গভীর ভাবে আঁকা হয়ে আছে। কথাটি এই, কীর্ত্তনটি এই,— "অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দনন্দন হোলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলরাম 'নিত্যানন্দ'। সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ; অভিন্ন ব্রজ শ্রীনবদ্বীপে, সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ"। আরও কত পদ কীর্ত্তনে গাইলেন কিন্তু এই পদটী আমার মনে চিরকালের মতই অঙ্কিত হয়ে রইলো। প্রথমে শুনেছি কিনা, তাই এখনও সেই কথা মনে পড়ে। যদিও প্রায় ৫০ বৎসরের কথা, তবুও তখনকার তাঁর মুখোদ্গীর্ণ কথা আমার মনে আছে ; আর প্রথম দেখা তাঁর সেই কাঁদা-বদন এখনও মনে পড়ে, ভোলাই যায় না।

পরে তাঁকে বহুবার দেখেছি ; তাঁর মুখে কীর্ত্তন শুনেছি কিন্তু সেই প্রথম দিনের মিলনের কথা, তাঁর মুখনিঃসৃত নামকীর্ত্তন শ্রবণের কথা কি ভুলতে পারি ! বলরাম নিত্যানন্দ বলতে বলতেই স্বরভঙ্গ হয়ে গেল। অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলে ভূষিত হয়ে গেলেন। ভাব সম্বরণ করবার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন, বুকের চাদর পড়ে গেল, টেনে স্থাপন করতে লাগলেন, আবার পড়ে গেল। চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যেতে লাগল। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর হুঙ্কার দিতে লাগলেন। চোখের দুই ধার দিয়ে অজস্র অশ্রু বর্ষণ হতে লাগল। শেষে দেখলাম, চোখের সমস্ত পাতা উপচে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল। এমনি ক'রে ভাবে বিভোর হ'য়ে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত

কীর্ত্তন কোরলেন। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে প্রসাদ পেতে বসলেন, আমায় কাছে ডেকে, ব'ললেন,—বোসো প্রসাদ পাও। সেদিন আর বেশী কথা হোলোনা। প্রসাদ পেয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ করে প্রায় দুইটার সময় বাড়ী এলাম।

চুপি চুপি বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়লাম। মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। কাল রবিবার স্কুল ছুটী, তাই ভাবলাম কাল সকাল সকাল তাঁর সঙ্গে মিলব। ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে তাঁর কাছে গেলাম; আমাকে দেখা মাত্র হেসে ফেল্‌লেন, আমি দণ্ডবৎ ক'রে তাঁর সামনে মাটিতে বসে পড়লাম।

স্নেহ বশে কইলেন,—আজ নগর কীর্ত্তন হবে, যাবে না? আমি বল্‌লাম, যাবো। আর বালকসুলভ সরলতায় বল্‌লাম,—আপনাকে ছেড়ে থাকতে পাচ্ছিনা, না দেখেও থাকতে পারিনা। তিনি হেসে হেসে পিঠে আদর ক'রে চাপড় মারলেন, সে চাপড়টাও যেন আমার মনে মধুর সাড়া দিয়ে গেল। নগর কীর্ত্তন ক'রবেন সেদিন। খোল করতাল নিশান খুন্তি নিয়ে সবাই দাঁড়ালেন। মৃদঙ্গ করতাল সব বাজতে লাগল। বাজনার শেষে শ্রীল বাবাজী মহাশয় পদ ধরলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি পারিষদ বৃন্দকে আহ্বান ক'রে কীর্ত্তন-মুখে তাঁদের কৃপা ভিক্ষা ক'রে কীর্ত্তন কোরলেন।

তারপরে গাইছেন, "প্রকট অপ্রকট লীলার দুইতো বিধান, প্রকট লীলায় করেন হরি স্বয়ং নৃত্য গান। অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কীর্ত্তন বিহারী হয়ে আছেন বর্ত্তমান। হরিনামের বহু অর্থ তাহা নাহি জানি। শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র মানি। সেই হরি গৌরহরি নদীয়া বিহরে। হরে কৃষ্ণ নামে জগৎ নিস্তারে। চারিদিকে পারিষদ মণ্ডলী করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর। সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের কুমার। গদাধরের বামে শ্রীবাস আর নরহরি।"

"চৌষট্টি মহান্ত দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি। সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া। হরে কৃষ্ণ নাম প্রেম যান বিলাইয়া।" এই কীর্ত্তন গাইছেন আর অঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছে, অশ্রুজলে বুক ভেসে যাচ্ছে। হাতের করতাল কাঁপছে আর অমনি নাম ধ'রলেন,—"আবার বল হরিনাম আবার বল, মধুর এই হরেকৃষ্ণ নাম আবার বল, আমার প্রেম দাতা নিতাই বলে, আবার বল হরিনাম আবার বল।"

চারিদিক নাম-ধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে গেছে। মনে হোচ্ছে যেন নাম-মুখরিত বাতাস দিগ্‌দিগন্ত নাম-ধ্বনিতে আকীর্ণ ক'রে আকাশ নাম-মেঘে সমাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে;—এখন বুঝি নাম-বর্ষণ স্নুরু হ'বেন! চারিদিকে লোক সকল নীরব নিথর হয়ে এই নাম শুনছেন আর সবারই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে. আমি ভাবছি, নাম শুনে মানুষ কাঁদে এমন তো কখনও দেখি নাই, এই ভাবছি আর আমিও কেঁদে ফেলছি। যেন কেমন তর হয়ে গেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরে নগরকীর্ত্তনে বাহির হোলেন, চাদরের একপাশ বেশ করে এঁটে কোমরে জড়ান। কি সুন্দর দেখাচ্ছে তখন তাঁকে, যেন প্রেম-রঙ্গে-রঙ্গিয়া হয়ে চলেছেন। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মুখখানা চকচক্ কোচ্ছে; নাম ধরলেন,—"প্রেম দাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল"; পেছনে সবাই দোয়ারকি কোচ্ছেন।

চারিদিক থেকে লোক ছুটে আস্‌ছে আর কীর্ত্তনে যোগ দিচ্ছে। সবারই মুখে,—গৌর হরি হরি বোল—আকাশ বাতাস সব মুখরিত হয়ে গেছে। স্কুলের অনেক ছেলেরা এসে যোগ দিয়েছে। আমরা সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে চলেছি। কীর্ত্তনে দুহাত তুলে সবাই নাচতে নাচতে চলেছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও দুহাত তুলে অপূর্ব্ব নৃত্য ভঙ্গিতে চলেছেন। কি মধুর দৃশ্য তখন, তা বলে বোঝান যাবেনা। নাচতে নাচতে হেলে দুলে চলেছেন, হাতের মাস্‌ল্ চকিতের মত ফুলে উঠ্‌ছে। আমরা সবাই তাঁর শ্রীঅঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছি। মাস্‌ল্ দেখছি। স্কুলের ছেলেরা সব কানা ঘুষা কোরছে,—

সাধুজী নিশ্চয় ডাম্বল ভাঁজেন। নইলে এমন সুন্দরভাবে মাস্‌ল্ ফুলবে কেন?

হঠাৎ শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটি চৌমাথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন ধরলেন, "যায়রে নিতাই হেলে দুলে, নিতাই যারে দেখে তারে বলে গৌর হরি হরি বোল।" তাঁর সমস্ত কথাই যেন নিতাই চাঁদের দোহাই দিয়ে বলা। শ্রীনিতাই বলছেন এমনি ভাব। একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন ধ'রলেন—"সপ্তম মাসেতে যবে জননী জঠরে গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিলে কাতরে।" পদের আখর দিচ্ছেন, "কোথায় আছ দীননাথ, আর যাতনা সইতে নারি, কোথায় আছ দীননাথ, আর জঠর জ্বালা সইতে নারি, কোথায় আছ প্রাণের হরি, আর জঠর জ্বালা সইতে নারি, এবার আমায় জনম দাও, এবার ভজব তোমার পদ যুগলে।"

"জনমিয়ে ভবে গিয়ে ভজব তোমার পদ-যুগলে, জীব মাত্রের এই প্রতিজ্ঞা", সপ্তম মাস মাতৃগর্ভে জীবমাত্রের এই প্রতিজ্ঞা"। আবার পদ ধরলেন—"ভূমিষ্ট হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিলরে। প্রণব জঠর স্মৃতি অন্তর হইলরে"। আখর দিচ্ছেন,—"সকল কথাই ভুলে গেলে, জনমিয়ে ভবে এসে সকল কথাই ভুলে গেলে; বিষ্ণুমায়া পরশনে সকল কথাই ভুলে গেলে, হরি ভ'জবে বোলে ব'লে এলে, সকল কথাই ভুলে গেলে।" বাল্যেতে চঞ্চল অতি সঙ্গিগণ সনেরে। কাটালে কৈশোর কাল পুস্তক পঠনেরে।" "রইলে ধূলা খেলার ছলে, শৈশবেতে দিবারেতে রইলে ধূলা খেলার ছলে। কই সে পড়াতো পড় নাই, যে পড়া পড়তে জনম পেলে, সে পড়া তো পড় নাই, প্রাণারাম হরি নামের পড়া সে পড়াতো পড় নাই; সর্ব্ব বিদ্যার জীবনী শক্তি, প্রাণারাম হরি নামের পড়া।" "যুবাকালে মোহজালে পড়িলে রিপুর কৌশলে।" "মনুষ্যত্ব হারাইলে, ষড়্‌রিপুর কিঙ্কর হয়ে মনুষ্যত্ব হারাইলে। কেন মায়া সনে সম্বন্ধ করিলে; কেন হলে মায়ার নফর, তুমি কৃষ্ণের নিত্য কিঙ্কর, কেন হলে মায়ার নফর,

নৌকা ছেড়ে দিল, ধীরে ধীরে নৌকা চ'লতে লাগ্‌ল, অনিমিখ-নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমিও তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমি নদীর তীরে ব'সে পড়ে নীরব নিঝুম হ'য়ে কাঁদতে লাগলাম ; "আমার কি যেন হারিয়ে গেল"—এই মানসিক অনুভবে দারুণ বেদনায় আমি একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। সন্ধ্যা ঘোর হ'য়ে এল, আর দেখতে পেলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে ফিরে এলাম এবং কাছারী ঘরে শুয়ে পড়লাম।

জীবনের ঐ ক-টা দিনে তাঁর মধুময় সঙ্গে আমার একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভের রাস্তা যেন খুলে গেল। শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কি হ'তে পারে! তিনি আমাকে কৃপা করে শ্রীচরণাশ্রয়ে রেখেছিলেন, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়ে তাঁর মধুময় সঙ্গ-সান্নিধ্য দিয়েছিলেন ; ইহাই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলি। তিনি চ'লে গেলেন বটে কিন্তু আমি আর গৃহে থাকিতে পারলাম না! তাঁর মধুর সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ করিয়া সদা তাঁ'কে দর্শন করবার জন্য আবাইপুর রওনা হবার উদ্যোগ ক'রছি এমন সময় বাড়ীর সব টের পেয়ে গেল, ভয়ে আর কিছু ক'রতে পারি না।

এখন মনে মনে একটি ফন্দী আট্‌লাম। আমার বড়দাদা শ্রীনরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী আবাইপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার বটেন ; তাঁর কাছে পড়তে যাবো, এই ছল ক'রে গৃহের বাহির হ'লাম। বড়দাদা শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে খুব ভক্তি করেন, তাঁর কীর্ত্তন শুনতে গেছেন. আবার তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তনে খুব নেচেছেন। আমি কয়দিন পরে রওনা হ'লাম তাঁকে দেখবার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে ১২ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে তাঁর কাছে এলাম, তখন বেলা দুটো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখেই হেসে উঠলেন এবং হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বললেন,—কি রকম এসে গেছ দেখ্‌ছি! আমি দণ্ডবৎ প্রণতি করলাম! তিনি বললেন,—কীর্ত্তন হয়ে গেছে আজিই আমরা কলকাতা রওনা হব। আমি কেঁদে

ফেলে বললাম, আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, আমাদের সঙ্গে যেয়ো না, লোকে বলবে বাবাজীরা ছেলে ধরা, ছেলেদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে সাধু করে ছেড়ে দেয়। অগত্যা আমি আর কোন কথা বলতে সাহস পেলাম না। তাঁরা সবাই আস্তে আস্তে রওনা হয়ে গেলেন। ওখানে সব নদীপথে নৌকায় ক'রে যেতে হয়। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত পরিষদবৃন্দ নৌকায় ব'সল কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি আঁখিজলে ভেসে তাঁকে দেখতে লাগলাম, তিনিও তাকিয়ে দেখছেন। একটু পরেই নদীর বাঁকে নৌকা চলে গেল আমি আস্তে আস্তে আঁখিজল মুছে ফিরে এলাম।

কান্না আর থামে না তাঁর ভক্তেরা কত বোঝাল আমায় কিন্তু মন বাঁধ মানে না। আবাইপুর ফিরে এলাম। বড়দাদা অনেক বোঝালেন, কত শাসন বাক্য বললেন কিন্তু মন বোঝে কই! কি ক'রে আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়, কি ক'রে তাঁর সঙ্গ পাব ইহাই ভাবতে ভাবতে দিন কাটুতে লা'গল। আবার জন্মভূমি মাগুরায় ফিরে এলাম।

স্কুলে আর যাইনা, পড়াশুনা ছেড়ে "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" "অমিয় নিমাই চরিত" পড়ি বটে কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথা একটুও ভুলতে পারি না। তাঁকে পাবার লালসা বদ্ধমূল হ'য়ে পড়েছে। তাঁর কাছে গৃহ সংসার সব ছেড়ে থাক্‌ব এবং তাঁর কথানুযায়ী শ্রীহরি ভজন ক'রব এই লালসা তীব্র হ'য়ে প্রাণে জাগছে কিন্তু গৃহ ছেড়ে বাহির হই কি ক'রে? চারিদিকে সবাই আমায় নজরবন্দী রেখেছে। আমার ছোট ভাই কেষ্ট সর্ব্বদাই সন্দেহ ক'চ্ছে,—আমি তা'দের ছেড়ে বিরাগী হয়ে চলে যাব, এই ভয়। মা তখন বাপের বাড়ী নলিয়াতে আমার দিদিমার কাছে আছেন। আমার ছোট ভাই কেষ্ট ও আমি মাগুরায় কাকার কাছে আছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শন লাভের পর

থেকেই স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আপন মনে চুপি চুপি ব'সে কাঁদি, আমার একমাত্র ভাবনা, কি করে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে যাবো ;—তাই সুযোগ খুঁজতে লা'গলাম কি করে গৃহ ছেড়ে চলে যেতে পারি। একদিন ছোট ভাই স্কুলে আছে, বেলা তখন ২টা হবে, তার বইয়ের উপর একখানা চিঠি লিখে রাখলাম— "আমি তোমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রে আজ শ্রীহরিকে পাবার উদ্দেশ্যে রওনা হোলাম। আর সংসারে ফি'রব না, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও কোরো না। মনে রাখিও আমরা পাঁচ ভাই, একটী ভাই তা'র ভিতর থেকে চলেই গেছে। তুই মাকে বুঝিয়ে আমার কথা বলবি। ইতি।—তোর ছোড়দা।"

এই চিঠিটা লিখে রেখে আমি এক কাপড়েই নদীর ধারে এসে খেয়া পার হয়ে ঠাকুরের নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তে রাস্তা বেয়ে চলতে লাগ্‌লাম। আমি চলে যাবার মিনিট দশেক পরেই হঠাৎ টিফিনের ছুটীতে ভাই বাড়ীতে এসে আমায় দেখতে না পেয়ে কেঁদে ফেললো তারপর তার বইয়ের উপর আমার লেখা চিঠি পড়ে কাঁদতে কাঁদতে নদীর ধারে গেল। পাটনীকে জিজ্ঞাসা ক'রলো "দাদা কি নদী পার হ'য়ে গেছে?" সে ব'লল,—হাঁ, তিনি বোধ হয় আর সংসারে থাকবেন না, এই আমার মনে হোলো তাঁকে দেখে। কত কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম কোন উত্তরই দিলেন না। কেবল উদাস প্রাণে আমার দিকে তাকালেন, কেবল চোখে জল দেখলাম। এই কথা শুনবা মাত্র কেষ্ট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতার দিয়ে পারে গেল, কারণ খেয়ায় পার হ'তে দেরী হবে। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে যে পথে আমি গেছি সেই পথে ছুটতে লাগ্‌ল। অনেক দূর গিয়ে দে'খল দু'দিকে দু'টো রাস্তা গেছে, কোন দিকের রাস্তায় গেছি তা সে বুঝ্‌তে না পেরে ওখানে একটী বড় বটগাছ ছিল তা'র মাথার ডালে উঠে আমায় দূরে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে দৌড়িয়ে পাশের দিকের একটী ছোট রাস্তা ধরে আমার আগে গেল।

ঐ রাস্তার ধারে একটু জঙ্গল ছিল তার ভিতর লুকিয়ে রইল, যেই আমি কাছে এসেছি অমনি সে ছুটে এসে আমায় সাপটে জড়িয়ে ধ'রে বললো, ছোড়দা তুমি চলে যেয়ো না। তুমি সাধু হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে আমি বাঁচবো না। মা তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। আমি মাকে বুঝাব কি করে? তুমি ফিরে চল। আমার মন তখন পাষাণের মত হয়ে গেছে আমি তা'কে গলা ধরে ঠেলে ফেলে দিলাম। সে চকিতের মত উঠে আবার আমায় এসে জড়িয়ে ধরল, আমি আবারও তা'কে ঠেলে ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললাম, আমি আর ফিরে যাবো না। তখন সে নিরুপায় হ'য়ে পড়েছে। আমাদের এই ব্যাপার দেখে অনেক লোক এসে জমেছে। তাদের ভিতর অনেক লোকই কাকার মক্কেল। তা'রা সবাই আমাকে বুঝাতে লাগল,—আপনারা পাঁচ ভাই, আপনার কাকা অত বড় উকিল, কত মানী লোক, আপনাদের বাড়ীতে ৭০ জনা লোক খায়দায় ও পড়ে, কতজন বি, এ, পাস করেছেন। আপনি ছেলেমানুষ, আপনাকে এমন ভালবাসে আপনার ছোট ভাই, তবুও আপনি কেন সাধু হয়ে চলে যাবেন।"

তখন কে কার কথা শোনে। দুই এক পা যেই এগিয়ে চলেছি, অমনি আমার ছোট ভাই কেষ্ট ব'লল, দাদা তুমি যদি আর এক পা এগিয়ে যাও তবে শোনো আজ ভ্রাতৃহত্যা পাপে তোমায় লিপ্ত হ'তে হ'বে। এই কথা বলেই পাশ থেকে একটা ঝামা ইঁট তুলে নিয়ে ব'লল এই দেখ এই ইট দিয়ে আমি আমার মাথায় আঘাত ক'রে ফাটিয়ে দেবো। লোকে বলবে, ভাইকে মেরে তুমি সাধু হয়ে চলে যাচ্ছ। তার এই নিদারুণ ব্যবহার দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। ছোট ভাই কিনা, বড্ড ভালবাসে আমায়;— আমি চলে গেলে সে নিশ্চয়ই এই রকম একটা বিষম কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে। আমি তখন নিরুপায় হয়ে বললাম, না ভাই আমি আর যাবোনা। অমনি সে হাতের ইঁট ফেলে দিয়ে আমায়

জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলো এবং আমায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাড়ীতে সব জানাজানি হয়ে গেছে, সবাই ব'কতে লাগলেন। কাকা খুড়িমা খুব শাসন ক'রলেন, এত টুকু কালে সাধু হতে চলেছে, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। মা তখন মামার বাড়ী নলিয়াতে আছেন। মাগুরা থেকে দশক্রোশ নলিয়া গ্রাম। তাঁ'কে খবর পাঠান হোলো। আমি নিরুপায় হয়ে পড়েছি। ছোট ভাই সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখে। রাত্রে যখন ঘুমোয় তখন তা'র কাপড়ের খুঁট দিয়ে আমার মাজা বেঁধে গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়, পাছে আমি পালিয়ে যাই।

এইরূপে দুই দিন কা'টল। রাত্রে উ'ঠলে অমনি—কই দাদা, বলে উঠে পড়ে। স্নান ক'রব, শৌচে যাব, খেতে ব'সব, সব সময় সে চোখে চোখে রাখে আবার রাত্রেও কোমর বেঁধে গলা জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে থাকে। কিছুতেই তা'র এই ভালবাসা এড়িয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছিনা। গভীর রাত্রি, বোধ হয় দুটো হবে, তখন দেখছি, সে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। অমনি আস্তে আস্তে উঠে কোমরের খুঁট খুলে ফে'ললাম। গলা থেকে তা'র হাত সরিয়ে দিয়ে নীরবে ঘর থেকে বের হ'লাম। চোখ যে দিকে যায় সেই দিকে দ্রুত চ'লতে লা'গলাম।

অনেক দূর চলে এসেছি প্রায় ২০ মাইল হবে, তখন ভাবছি এখন আমায় আর কেউ বাঁধাও দেবে না, খোঁজও করবে না। বেলা ৮টা হয়েছে, তখন পাতুড়িয়ার এক বন্ধু হৃষীকেশ দা'র কথা মনে প'ড়ল। তিনি আমায় বড্ড ভালবাসেন, পরম ভক্ত তিনি, তাঁর কাছে চ'ললাম। একবার তাঁর সঙ্গে আমি ফরিদপুরে শ্রীজগদ্বন্ধুর আঙ্গিনায় গেছলাম। সেই সময় হোতেই তাঁহার সহিত আমার খুব প্রীতির বন্ধন হয়। তাই আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর সঙ্গে কত কথা-বার্ত্তা হোলো। এখন শ্রীজগদ্বন্ধুর "প্রেম যোগ" গ্রন্থ ও রমেশ বাবুর "ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা" বইসব পড়তে লা'গলাম।

কয়দিন তাঁ'র কাছে থেকে আমরা যুক্তি ক'রলাম আর ঘরে ফেরা

হবে না। চল আমরা দু'জনা মিলে শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের ওখানে যাই। সবাই বলেন, তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ, তাই আবার আমরা তাঁর আঙ্গিনায় এসে পৌঁছিলাম। এসে দেখি আমার বড়দাদা শ্রীনরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী হেড্‌মাষ্টারি ছেড়ে মাথায় খুব বড় বড় চুল রেখে সাধুর বেশে শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের আঙ্গিনায় এসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে দণ্ডবৎ ক'রলাম, তিনি বল্‌লেন, এত ছোট বেলায় পড়াশুনা ছেড়ে সাধু হোতে এলি কেন? যা পড়াশুনা করগে। তবুও কিছুদিন ওখানে রইলাম। আমাদের আত্মীয় স্বজন এসে দাদাকে অনেক বুঝিয়ে মামার বাড়ী নলিয়া গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে এলাম। মায়ের কান্না ও দিদিমার চোখের জল দেখে বড়দাদা আবার আবাইপুর স্কুলে হেড্‌মাষ্টারি ক'রতে গেলেন এবং আমার আবার পড়ানর ব্যবস্থা ক'রতে লাগলেন। আমি বিষম ফাঁপরে পড়লাম। মায়ের আকুল ক্রন্দন, দিদিমার স্নেহ ও চোখের জল দেখে আমি হতাশ হ'য়ে পড়ছি;—তাঁদের ছেড়ে পলাতেও পাচ্ছিনা।

দিদিমা ব'লতে লা'গলেন,—আমায় ছেড়ে যাস্‌নে; আমি শিশুকাল থেকে ঐ দিদিমার অফুরন্ত স্নেহ পেয়েছি। আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আমার উপরই তাঁর অত্যধিক মমতা ছিল। তাই তিনি ও মা কেঁদে ব'ললেন, তুই যদি চলে যাস আমরা প্রাণে বাঁচবো না। তোকে এখানে বেলতলায় একটি ঘর ক'রে দেই। বেশ মঠের মতন তুই ওখানে ব'সে নাম কর ও ভজন কর। সাধু হয়ে চলে গেলে কে তোকে খেতে দেবে, কে তোকে স্নেহ ক'রবে। আমি বল্‌লাম, দিদিমা তা'হলে আস্তে আস্তে আমি তোমাদের মত সংসারী হয়ে পড়ব। আত্মীয় স্বজন নিয়ে কি বৈরাগ্য হয়, না তীব্র ভজন হয়! তখন তাঁদের নিয়েই, তাঁদের সুখ দুঃখ নিয়েই জীবনটা ছিনিমিনি হয়ে যাবে। মা কিন্তু কোন কথাই বলেন না।

মা আমার জীবনের সবকিছু বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে সংসারী হও বা সাধু হ'য়ে যাও এমন কোন কথাই বলেন না, কেবল স্নেহ বশে খেতে দেন আর স্নেহবশে মুখখানা দেখেন। এইরকম ভাবে দিন বিশেক কাট্‌ল। প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠল,—সংসার ছেড়ে যাবার জন্য; একদিন পোটলা পুট্‌লী বাঁধলাম। বৌদি' আমার কম্বল লুকিয়ে রা'খলেন, মা দিদিমা কাঁদতে লাগ্‌লেন; তাঁদের চোখের জল দেখে আর যাওয়া হোলো না। আবার দু'দিন কাট্‌ল, ভাবলুম চুপিচুপি রাত্রিতে পালিয়ে যাবো। মনে মনে ইহাই স্থির-সাব্যস্ত হ'লো,—পরদিন গভীর রাত্রি, দুটা বাজে এমন সময় রওনা হ'লাম। ভাবলুম পাতুড়িয়ায় হৃষীকেষদার কাছে যাবো তারপর শ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধুর ওখানে গিয়ে সাধন ভজন ক'রব।

মামাবাড়ী ছেড়ে প্রায় দশ বার মাইল গেছি বন-জঙ্গল পথে। দু'ধারে ভীষণ জঙ্গল, মাঝে একটি আবছায়া পথ, চলেছি সেই পথে নির্ভীক চিত্তে। অন্ধকার ভীষণ, একটু একটু রাস্তা দে'খতে পাচ্ছি এমন সময় বরাহের ভীষণ গোঁদ গোঁদ শব্দ দূর হ'তে রাস্তা বেয়ে আস্‌ছে। আমি ভাবলুম বুনো বরাহ নিশ্চয়ই আমাকে আক্রমণ ক'রতে আসছে। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে নিকটস্থ গাছে উঠবার জন্য চেষ্টা ক'রলাম কিন্তু আশে পাশে বেতের ঝোড়, গাছে উঠা হোলনা। তাই নিরুপায় হ'য়ে শ্রীহরির স্মরণ ক'রতে লাগ্‌লাম, আবার শ্রীজগদ্বন্ধুরও নাম ক'রতে লাগ্‌লাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়েরও সেই মৃদুমন্দ হাসিভরা মুখখানা মনে ক'রতেই দে'খতে পেলাম! এই নিরুপায় অবস্থায় একটু এগুতেই পায়ে ঠোক্কোর খেলাম। হাত দিয়ে দেখি একটি মাজা সমান উঁচু স্তম্ভ, তা'র নীচু দিয়ে জল চলে যাচ্ছে, আমি ভীত চকিত চিত্তে তা'র উপর যেই উঠে দাঁড়ালাম আর তৎমুহূর্ত্তেই সেই বরাহটি ঐ স্তম্ভে দন্ত দিয়ে আঘাত ক'রল; স্তম্ভ ভেঙ্গে গেল। স্তম্ভের সহিত আমি নীচে জলের ভিতর পড়ে গেলাম। বরাহ সেই পথেই ছুটে চলে গেল। আমি

আনন্দে শ্রীহরির কৃপা ও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপা অনুভব ক'রতে ক'রতেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

সকালে জেলেরা মাছ ধরতে এসেছে, ঐ নালাতে তা'রা আমার অর্দ্ধেক শরীর জলের মধ্যে আর বাকী অর্দ্ধেক শরীর ডাঙ্গায় দে'খল ;— দাঁত-লাগা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে আছি। তা'রা আমায় এইভাবেই উপরে উঠিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগ্‌ল। দাঁত ছাড়িয়ে দিল, আমার জ্ঞান এল, চোখ মেলে তাকালুম। তাকান মাত্রই তা'রা বলল, সাধু খুব বেঁচে গেছ। বন্যবরাহ তোমায় আক্রমণ করেছিল, এই থামের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি! তাই বেঁচে গেছ। বরাহ থামে দাঁত দিয়ে আঘাত কোর্ত্তে থামও ভেঙ্গে গেল, তুমিও জলের ভিতর পড়ে গেলে; তাই বেচে গেছ! বন্য বরাহ,—তাতে আবার শিকারীরা তা'র পেট ফুটো ক'রে দিয়েছে বর্ষা দিয়ে,—তাই ভীষণ হিংস্র হয়ে গেছে, দুটো লোককে একেবারে মেরে ফেলেছে। তুমিও তা'র সামনে পড়েছিলে বুঝি! ঠাকুরের কৃপায় ঐ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিলে ব'লে বেঁচে গেছ।

সূর্য্য উঠেছে, আমি শ্রীহরি, প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু ও বাবাজীমহাশয়ের করুণায় বেঁচে গেলাম!—এই কথা মনে হোচ্চে এমন সময় বন্দুকের ৩।৪টি গুলির শব্দ শু'নলাম। এখানকার জমিদার ঐ বরাহ শিকারে এসেছেন। অল্প দূরের একটা জঙ্গলে ঐ বরাহ ছিল, বরাহকে শিকারীরা আঘাত করায় সে এ-পথ ধরে যেই মাঠে বের হয়েছে অমনি জমিদার তা'কে গুলিতে বিদ্ধ ক'রলেন। ৩।৪টি গুলি বিদ্ধ হোলে বরাহ ভীষণ চিৎকার ক'রে মাটিতে প'ড়ে মরে গেল। আমরা ছুটে দেখ্‌তে গেলাম। আমার কথা শুনে সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন। আমিও আস্তে আস্তে তা'দের সঙ্গে দু'চারটি কথা বলে রওনা হ'লাম। ভাবলাম দিনে দিনে যাবো আর রাত্রে এইসব জঙ্গল পথে যাবোনা।

হাঁটতে হাঁটতে বহুপথ অতিক্রম ক'রে পাতুড়িয়ায় হৃষীকেশদা'র বাড়ীতে এসে পৌঁছিলাম। আমূল বৃত্তান্ত তাঁকে ব'ললাম। তিনি স্নেহবশে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এখন তাঁর বাড়ীতেই কয়দিন রইলাম। গান কীর্ত্তন করি। একদিন দুইজনা যুক্তি করলাম,—চল শ্রীজগদ্বন্ধুর আঙ্গিনায় যাই; সেখানে খুব কীর্ত্তন হোচ্চে। অনেক সাধু-মহান্ত আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে তাঁরা বলবেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় কোথায় থাকেন; তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কারণ শ্রীবাবাজী মহাশয় প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্ত, তিনিই নাকি তাঁকে ঘর থেকে বের করেছেন; তিনিই নাকি তাঁকে নাম কীর্ত্তন শিখিয়েছেন; —লোকমুখে এইসব কথা শুনেছি। তাই আমরা দুইজনে রওনা হয়ে ফরিদপুর শ্রীজগদ্বন্ধুর আঙ্গিনায় এসে পৌঁছিলাম। আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দূরে চলে এসেছি,—অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আঙ্গিনায় বাদল বিশ্বাস, মতিচ্ছন্ন, মহেন্দ্র দা', কৃষ্ণদাস, প্রেমদাস, কুঞ্জদা' ও উদ্ধারণ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ছিলেন। আমি তাঁদের মধুময় সঙ্গ পেলাম। এখানে তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করে বেড়াই। আমার বড়দাদা এখন এখানে নাই তাঁকে সবাই বুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়েছেন।

সংসারে থেকে স্ত্রী, মা, দিদিমা ও ভাইদের পালন ক'রবার জন্য তিনি আবার বালিয়াকান্দি স্কুলে হেড্‌মাষ্টার হয়ে ছেলেদের পড়াতে লেগেছেন; ছেলেদের ব্রহ্মচর্য্যপালন শিক্ষা দিয়া থাকেন; আর উপদেশ দেন, শ্রীভগবানে মতিরেখে সংসার ধর্ম্ম পালন ক'রবার জন্য। কিন্তু তিনিও আবার ১০।১২ বৎসর পরে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে সমাধিপ্রকাশ-আরণ্য নামে পরিচিত হলেন। তিনি দিনাজপুরে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানেই বেশী থাকতেন। কখন কোথাও কোথাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। অনেকে তাঁর শিষ্য হয়েছে। ৩০ বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে

শ্রীনবদ্বীপ ধামে আজ বৎসর দুই হল দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের মঠ, সমাজ বাড়ীতে অসেন; অনেকক্ষণ আমাকে কত উপদেশ দিলেন। তারপর আমি একটী কীর্ত্তন শুনালুম, তিনি ভাবে অভিভূত হয়ে প'ড়লেন। কীর্ত্তনটি এই,—"নাচে শচীসুত লীলা অদ্‌ভুত, চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া। সঙ্গে কত কত ভকত গাওয়ত, হিলন গদাধর রঙ্গিয়া। আজানু বাহু তুলি বলয়ে হরি হরি, আপনি নিজরসে মাতিয়া। বদন মণ্ডল করে টলমল, দশনে মোতিম পাতিয়া। কষিত কাঞ্চন কিরণ ঝলমল সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া। অরুণ নয়নে বরুণ আলয়, অঝোরে ঝরে দিন রাতিয়া। পঙ্গু অন্ধ যত পতিত দুর্গত, দেওয়ল সবে প্রেম যাচিয়া। করুণা দেখি মনে ভরসা বাড়ল, দাস নরহরি ছাতিয়া।" সখীমার বারান্দায় বসে, এই কীর্ত্তন গানটী যখন গাইতে লাগ্‌লাম, তখন তিনি চোখের অঝোর জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন;— গেরুয়ামণ্ডিত মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীও শ্রীমহাপ্রভুর কথায় চোখের জলে ভাসেন;—এমনই করুণাময়ী লীলা শ্রীমহাপ্রভুর! বিস্ময়বিহ্বল হয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রলাম, তিনি চলে গেলেন; আর দেখা হয়নি।

যাক, হৃষীকেশদা' ও আমি প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্তদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম। প্রায় সময়ই চোখের জলে ভাসি, তাই উঁহারা আমাকে 'ভাবলহর' নামে ডা'কতে লাগ্‌ল। তাঁদের সহিত গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌তে লা'গলাম কীর্ত্তনানন্দে। রাজবাড়ী, গোয়ালচামট, ফরিদপুর সহরে ঘুরে ঘুরে আর ভাল লাগ্‌ল না; তাই শ্রীসুধন্য মিত্র মহাশয়ের দোকানে আমি ও হৃষীকেশদা এসে পৌঁছিলাম। শ্রীসুধন্য মিত্র মহাশয় আমাদের খুব স্নেহ ক'রতে লাগ্‌লেন। তাঁর মুখে সব বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত শু'নতে লাগ্‌লাম। শু'নলাম, শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পরম বন্ধু তিনি। তাই তাঁর কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—তিনি কোথায় থাকেন, কি করে তাঁর দর্শন লাভ হয়? ব'ললাম দুই

তিন বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে পড়বার সময় তাঁর দর্শন পাই. তিনি আমায় বড্ড ভালবাসেন, আর কি তাঁর দেখা পাব !—এই বলে কেঁদে ফেল্‌লাম। তিনি ব'ললেন, আচ্ছা আমি তাঁর ঠিকানা দিয়ে দেবো। তোমাদের কাছে তো টাকা নেই, আমি টাকা দোবো, টিকিট ক'রে তাঁর কাছে কলকাতায় যাবে। তিনি কলুটোলা ষ্ট্রীটে গোপাল লাল শীলের বাড়ীতে থাকেন। সেখান থেকে নাম প্রচার করেন।

আমি তাঁর কথা শুনে শান্ত হ'লাম। আশায় বুক ভরে গেল,—এবার আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি, নিশ্চয়ই তিনি আমায় চরণাশ্রয় দেবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় হৃষীকেশ দা' ও আমি দুইজনা মিলে কলকাতায় রওনা হ'লাম। এই জীবনের প্রথম কলকাতায় আসা। শিলেদের বাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পেলাম না, তিনি সিঁথিতে গেছেন কাল। এখানে শ্রীফণিদাস বাবাজী আছেন, তিনি স্নেহবশে ডেকে আমাদের প্রসাদ দিলেন ;— পরশু দিন এখানে নবরাত্র সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ শেষ হয়েছে, কত কত সাধু, বৈষ্ণব, গোস্বামী এসেছিলেন ; বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নাম-যজ্ঞ হয়েছিল। এমন মহোৎসব নাকি খুব কম হয়। আজও উৎসবের পান্‌তোয়া ও রসগোল্লা প্রসাদ ছিল, মহাভাগ্যে আমরাও পেলাম।

শ্রীফণিদাস বাবাজী আমায় বুঝিয়ে বল্‌লেন,—এত ছোট বয়সে সাধু হতে এসেছ কেন? যাও বাড়ী ফিরে যাও, পড়াশুনা করগে। এইসব কথা যখন তিনি আমায় ব'লছেন, ঠিক সেই সময় আমার মেজদা এসে উপনীত হ'লেন ,—সাদা চাদর, মাথা মোড়ান, গলায় তুলসীমালা। আমায় দেখে অবাক হয়ে বল্‌লেন,— পড়াশুনা ছেড়ে সাধু হ'তে এসেছিস্! শীগ্‌গির বাড়ী চলে যা। এত ছোট বেলায় ভণ্ডামি কত্তে এসেছিস্? বিদ্যা অর্জ্জন না হলে বি, এ, পাশ না ক'রলে কোন জ্ঞানই হয়না। যত সব মূর্খ তারাই সাধু সাজে। মা কাঁদছে, দিদিমা কাঁদছে, তোর কোন্

খবরই তাঁরা পায়না। সাধু সেজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্। যা আজকেই চলে যা সন্ধ্যার ট্রেনে। এই দেখ আমি আই, এ, পরীক্ষা দিয়েছি। যত দিন রেজাল্ট না বেরোয় সেই ক-টা দিন এঁদের সঙ্গে থাক্‌ব। মহোৎসব দেখ্‌বো। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ লাভ হবে, দেশ বিদেশে বেড়াব, তারপরই পাশের খবর বের হোলেই চলে যাবো মায়ের কাছে,—আবার বি. এ, পড়ব। পড়াশুনা না ক'রলে কি মানুষ, মানুষ হয়।

আমি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়লাম। ভাবলাম, আর বুঝি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শন লাভ হবে না! চোখে জল এল। মেজদা'র শাসনে ভীত হয়ে প'ড়লাম। তিনি বল্লেন,—আমি আর কয়দিন পরেই বাড়ীতে মার কাছে যাবো। চল, আমার সঙ্গেই যাবি। আমি কাতর কণ্ঠে ব'ললাম, মেজদা আমাকে একবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও তারপর তুমি যা ব'লবে তাই ক'রব! অগত্যা মেজদা' আমাকে সাথে নিয়ে শ্রীফণিদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সিঁথিতে হাজির হলেন। এখানে শ্রীগোপী দাসের বাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আছেন। এখানকার হরিসভায় অষ্ট-প্রহর নাম কীর্ত্তন হবে। সকালে ১০টার সময় আমরা তাঁর কাছে এসে পৌঁছিলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করে, তাঁর শ্রীচরণে মস্তক রেখে দণ্ডবৎ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি সহাস্য বদনে ব'ললেন,—কোথা হতে এলে ব্রহ্মচারী? ময়না এবার ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমার মেজদা'র দিকে তাকিয়ে হেসে এই কথাগুলো ব'ললেন। মেজদা' ব'লল,—দেখুন্‌তো মাকে কাঁদিয়ে আজ প্রায় ছ'মাস ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পড়াশুনা করা নেই, কেবল ভণ্ডামি। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম,— নীরব, নিঝুম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শুধু হাসতে লাগলেন। মেজদা ব'লল, আমি ওকে নিয়ে দুই এক দিনের মধ্যেই নদিয়ায় মা'র কাছে যাবো। আমারও পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। পাশ করেছি। তবে

আর কি! এই কথা বলে তিনি কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কীর্ত্তন শোনা হলো, তারপর প্রসাদ পেয়ে সবাই বিশ্রাম ক'রলাম। সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল, অমনি শুনতে পেলাম, প্রভাতি সুরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ক'রছেন—"শ্রীগুরু বৈষ্ণব তুঁহারি চরণ, শরণ না কৈনু আমি। বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি, খাইছু হইয়া কামী। সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল; বড়ই বিপাক হইল। জনমে জনমে এমনি কতেক, আত্মঘাতী পাপ কৈল। সেই অপরাধে এ-ভব সাগরে, বান্ধিল এ-মায়া জালে। তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া, আপনি ডুবিনু হেলে। আর কত কাল এ দুঃখভুঞ্জিব; ভোগ দেহ নাহি যায়। সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া; নিবেদিছি তুয়া পায়। ও-রাঙ্গাচরণ শরণ কেবল বিচারিয়া এই দায়। উদ্ধার করিয়া লহ দীনবন্ধু, আপন চরণ নায়। তোমারি সেবন অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ। এ রাধামোহন খতে বিকাইল, দাস গণনাতে লিখ।" কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে মুগ্ধ হয়ে পড়্‌লাম। চুপি চুপি বসে কাঁদছি, পাছে মেজদা কান্না দেখতে পায়। ভয়ে ভয়ে সমস্ত সময়টা কেটে গেল। ভোরে স্নান করা আর হলোনা।

কাছে একটী পুকুর ছিল; তাড়াতাড়ি সেখানে স্নান ক'রে ভিজে কাপড় খানা নিংড়িয়ে পর্‌লাম। হৃষীকেশ দা'র সঙ্গে সেই ভিজা চুলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে ব'ললেন,—৭টার সময় স্নান ক'রলেও কি ভোরে স্নান হয়? কি হে ব্রহ্মচারী, আজ আর খুব ভোরে ৪টার সময় উঠে স্নান হলোনা! আমি ব'ললাম,—কই আর হলো! আপনার কীর্ত্তন শুনছিলাম। অমনি শ্রীফণি দাস ব'ললেন—"তোমার কীর্ত্তন শুন্‌ছিল! তবে নিশ্চয়ই ওর মাথা তুমি খেয়েছ। তোমার তো নাম রটেছে ছেলে ধরা" এই রকম দু'জনা সখ্য-প্রেমে হাস্য পরিহাস কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত দাসও এসে যোগ দিলেন। আমি একেবারে ফাঁপরে পড়ে গেলাম। মেজদা'র ভয়ে কোন কথা না বলে চুপ

ক'রে রইলাম। দুইটার সময় প্রসাদ পাবার ডাক হলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ মেজদা ও আমাকে কাছে বসিয়ে প্রসাদ পেতে বস্‌লেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নেহ বশে নিজ পারশ হোতে প্রসাদ তুলে আমাকে দিতে লাগলেন। আমি তাঁর অধরামৃত পেয়ে খুব আনন্দে প্রসাদ পেতে লাগলাম। প্রসাদ পাওয়ার পর শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম ক'রলেন। আমি তাঁর পারিষদ শ্রীঅদ্বৈত দাস প্রভৃতির সঙ্গে কথা বার্ত্তা ব'লতে লাগ্‌লাম। সন্ধ্যা হলো শ্রীল বাবাজী মহাশয় এখন কীর্ত্তনে যাবেন তাই মেজদা ও আমি তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে শিয়ালদহ রেলস্টেশনে রওনা হলাম। হৃষীকেশ দা' তাঁর কাছে থেকে গেলেন।

আমি মেজদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী বেশ ফাঁকা। মেজদা' চাদর বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বসে মনের বেদনায় কত আকাশকুসুম ভাবছি,—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হোলাম! মেজদা' ধরে নিয়ে এল, আমি কিছুতেই থাকবনা বাড়ীতে! মায়ের সঙ্গে একবার জন্মের মত দেখা ক'রে আবার চলে আসবো। এই সব মনে মনে কষে মেজে রেখে দিলাম। বিকেলে মামার বাড়ীতে (নলিয়ায়) এসে পৌঁছিলাম। দিদিমা ও মা দূর থেকে আমার আসার সংবাদ পেয়ে ছুটে রাস্তায় এলেন; আমাকে দেখেই দিদিমা মূর্চ্ছা গেলেন, মা কোলে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভেসে কত কথা স্নেহে বল্‌তে লাগ্‌লেন। একটু পরেই দিদিমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গল, উঠেই আমায় সাপটিয়ে জড়িয়ে ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লা'গলেন;—ওরে ময়না, আমি তোর জন্যে পাগল হয়ে গেছি, এই দেখ! কেঁদে কেঁদে আমার চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। তুই কি পাষাণ! কোলে ক'রে তোকে মানুষ করেছি। তোর সমস্ত ভাই হ'তে তুই আমার সব চেয়ে প্রিয়, তোকে ছেড়ে আমি যে আর বাঁচিনা। দিদিমা এইরূপ ভাবে চোখের জলে হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ কোর্ত্তে লাগলেন।

আমি মা ও দিদিমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বললাম, আর তোমাদের ছেড়ে আজিমা যাবো না। আমি দিদিমাকে আজিমা ব'লে ডাকতাম। মা ও দিদিমার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করলাম। তাঁরা আমার হাত ধরে বাড়ী নিয়ে এলেন। মা ও আজিমার স্নেহ-বাৎসল্যে সব যেন আমায় ভুলিয়ে দিতে চায়। সর্ব্বদা আজিমা আমায় চোখে চোখে রাখেন, কি জানি যদি আবার পালিয়ে যায়—এই ভয় সর্ব্বদা তাঁদের। আমি তাঁদের তালে তাল মিশিয়ে কয়দিন কীর্ত্তন আনন্দে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দিনগুলো কাটাতে লাগলাম। এখানে মামীমার স্নেহও অপার, রোজ তাঁদের বাড়ীতে কীর্ত্তন করি। এখানকার জমিদার বদীবাবু আমাকে খোল কিনে দিলেন, তার স্ত্রীও খুব স্নেহ করেন। এই রকম ভাবে ১০।১৫ দিন ওখানে সবার সঙ্গে আনন্দে কীর্ত্তন ক'রে দিনগুলো কাটাতে লাগ্‌লাম তবে ফাঁক খুঁজছি কবে এই মায়া কেটে বেরুব। সুযোগ পাই না। কম্বল লোটা নিয়ে একদিন সকালে বাহির হতে চলেছি, অমনি দিদিমা ও মা সাপটে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, আর যাওয়া হোলোনা। বড়দা' মেজদা' কত শাসন বাক্য বল্লেন, কত বোঝালেন কিন্তু সব যেন আমার কাছে ফাঁকা আওয়াজের মত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেই মধুর হাসি, সেই স্নেহ সিঞ্চিত নয়ন সদা মনে জাগে, সব ভালবাসা যেন কোথায় চ'লে যেতে চায়। তাঁর সেই প্রেমসিঞ্চিত নয়ন দুটির কাছে যেন পৃথিবীর অন্য সব ভালবাসা মুছে যেতে চায়। আমি তখনও দীক্ষা লই নাই বা নেবার ইচ্ছাও আমার নাই অথচ তাঁকে ভুলতে পারি না। সমস্ত মন প্রাণ তিনি অধিকার ক'রে বসে আছেন। এ-কথা কাউকে বলিনা বা আভাসও কাউকে দেইনা। দাদারা আবার পড়াবেন বলে সব ঠিক হলো; দু চার দিন স্কুলে গেলাম। বড়দা' হেড্‌মাষ্টার, খুব শাসন ক'রে বললেন,—ভাল ক'রে পড়। আমার সেই শ্রীল বাবাজী

মহাশয়ের কীর্ত্তনের কথা মনে হোলো,—"প্রাণারাম হরি নামের পড়া। সর্ব্ব বিদ্যার জীবনী শক্তি সে পড়া তো পড় নাই।" বালিয়াকান্দির হেড্‌মাষ্টার বড়দাদা। তিনি সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমার থাকার খাওয়ায় বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। নলিয়া থেকে বেলেকান্দি ৫ মাইল। শনি রবিবারে মা ও দিদিমাকে দে'খতে আসি। এইরূপ ভাবে প্রায় এক মাস কাট্‌ল, আর গৃহে থাক্‌তে পারি না, কে যেন আমায় অবিরত আকুল প্রাণে ডাকছে! সমস্ত মায়া-মমতা ছিঁড়ে একদিন গভীর রাত্রে আমি মায়ের সাদা কাপড়খানা নিয়ে বের হলাম;—কাপড়খানা ছিঁড়ে দুই খানা ক'রে নিলাম, একখানা প'রলাম আর একখানা গায়ে দিলাম।

চিরদিনের মত সংসারের মায়া-মমতা কাটিয়ে শ্রীহরি ভজন ক'রব নির্জ্জনে বসে, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য ব'লে বুঝলাম্। দু' তিন বার আমায় সবাই ধরে নিয়ে এসেছে তাই এবার মনে করলাম অজানা অচেনা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াব,—কাশী বৃন্দাবন চলে যাবো, কেউ আমার আর পাত্তা পাবে না। তাই দু' চক্ষু যে দিকে যায় সেই দিকেই চলতে লাগ্‌লাম। রাত্রি দুইটার সময় গৃহ হ'তে বের হয়েছি, অবিরাম পথ চলছি, যে দিকে চোখ যায় সেই দিকে চলছি, ঠাকুরের নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তে। বেলা প্রায় তিনটায়, এক অজানা গ্রামে এসে পৌঁছিলাম।

এখানে কেউ আমায় চেনেনা। একটি শান বাঁধান পুকুর দেখলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত আমি, তাই ঐ বাঁধান ঘাটে এসে বসে পড়্‌লাম। পায়ে বেদনা হয়েছে পথ হেঁটে। ৩০ মাইল পথ হেঁটে চলে এসেছি। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই পুকুরের ধারে গিয়ে অঞ্জলি অঞ্জলি জল খুব পান ক'রলাম, পিপাসা নিবৃত্তি হোলো, ক্ষুধাও ক'মল,—জল খেয়ে; উপরে উঠেই বিশ্রাম ক'রতে বসলাম। মায়ের কাপড়খানা ছিঁড়ে, দুখানা করেছি। একখানা পরেছি

বাকী আর এক টুকরা সেখানে পেতে শুয়ে পড়্‌লাম। আর অমনিই ঘুমিয়ে গেলাম। বোধহয় সন্ধ্যা ৬টা, এমন সময় লোকের কথা বার্ত্তায় জেগে উঠে ব'সলাম; দেখ্‌লাম,—৭।৮ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বধূরা কাঁখে কলসী নিয়ে জল নিতে এসেছেন; আমায় দেখে তাঁরা কাছে এসে কথাবার্ত্তা বলছেন। তাঁরা সরলভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কি সাধু হয়েছ? আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর একটি বধূ বল্লেন, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে! কিছু খাওনি বুঝি? বেশ সুন্দর চুল তোমার, এত ছোট বয়সে সাধু হয়েছ কেন? আমি ব'ললাম, মা! অনেক দূর আমায় যেতে হবে, তাই ছোট বেলা থেকেই বের হয়েছি শ্রীহরিকে খুঁজবো ব'লে। তাঁরা বললেন,—না বাবা তোমায় দেখে আমাদের বড্ড মায়া হোচ্ছে, কিছু খাওনি বুঝি? আমি বললাম, না মা কিছুই জোটে নি। এই পুকুরের জল পেট ভরে খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তন্মধ্যে এক বধূ কলসী রেখে বাড়ী চলে গেলেন এবং একটু পরেই তাঁর শ্বশুর ও স্বামীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন আমার কাছে। বধূর স্বামী বল্‌লেন, আমার স্ত্রী আপনাকে দেখে আমার কাছে খবর দিল যে আপনার আজ আহার হয়নি, তাই আপনাকে নিতে এসেছি। আমি ব'ললাম,—আপনি আমায় আপনি বলে সম্বোধন করবেন না। কারণ আমি বালক মাত্র,—১৫ বৎসর বয়স। আপনি কত বড়, আমায় তুমি বা তুই বলেই সম্বোধন করুন। তিনি আনন্দে হেসে আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন অনতিদূরে তাঁদের দুতালা প্রকাণ্ড দালানে; তাঁদের বাড়ীর একটি ঘরে আমায় থাকতে ব'ললেন। আমি ব'ললাম, আমি গৃহ ছেড়ে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বের হ'য়েছি, এই গাছ তলায় থা'কব।

তাঁদের বাড়ীর পাশে একটি সুন্দর আম গাছ। আমি তা'র তলায় কাপড়খানা বিছিয়ে বসে পড়্‌লাম। তাঁরা জাতিতে কায়স্থ; উনুন ধরিয়ে দিলেন, আতপ চাউল, ডাল, কলা, থোড়

পটল ও আর কত কি সিধা এনে দিলেন, বাড়ীর উঠনের একপাশে রেঁধে নিতে ব'ললেন। দারুণ ক্ষুধা, তাই অগত্যা কাঁচাকলা ভাতে, মাড়-ভাত রেঁধে পঞ্চ দেবতাকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পেলাম। তাঁরা যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, আমি খুব ক্ষুধার্ত্ত। আমি উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার ক'রতে গেলাম। বধূমাতারা কেহই সে কাজ করতে দিলেন না। ব'ললেন,— আপনি ব্রাহ্মণ তারপর সাধু, কত ভাগ্যে আপনার এটো পরিষ্কার ক'রবার সুযোগ পেলাম। তাঁরা ব'লতে লাগ্‌লেন, কই এমন সুন্দর সাধু তো আমাদের গ্রামে আসেননা। তাঁরা সবাই আমায় ঘিরে নিঃসঙ্কোচে—আমার নাম কি, কোথায় বাড়ী, বাবা মা আছেন কি-না—জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে লাগলেন। আমি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলাম; যদি আমায় চিনে ফেলেন, যদি পরিচয় বের হ'য়ে পড়ে তো আমায় আবার ধরে নিয়ে যাবে বাড়ীতে! তাই বিশেষ কিছু বললাম না। পরিচয় না দিয়ে শুধু বললাম,—মা! আমি ফকির সাধু, আমাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে নেই। আর মা আমার পরিচয় নিয়োনা। আমার পরিচয় এই যা আমায় দেখছ; মাথায় চুল, গলায় পৈতা, ফকির সাধুর বেশ, এই পরিচয়ই জেনে রেখো। তাঁরা সব মৃদুমন্দ হাসতে লাগ্‌ল, আর কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি।

রাত্রি নয়টা বাজল, আপন মনে গান ধরলাম, "কি ছাড় আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়াতো রবেনা। দিন যাবে দিন রবে না ত দিন পাবি তুই কবে। আজ পোহালে কাল কি হবে কি হবে তোর তবে। সাধ কখনো মেটে না ভাই সাধে পড়ুক বাজ। বেলাবেলি চলরে চলি সাধি আপন কাজ। ভবে কেউ কারো নয় দেখনা চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি। আপন রতন বেছে নে চল হরি বোলে ডাকি।"—এই গানটি আমার খুব প্রিয় ছিল; প্রায়ই গাইতাম। কণ্ঠস্বর তখন খুব মিষ্টি ছিল। পাড়ার বালুকা

অবাক হয়ে এই গান শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ চোখ মুছছে, ভাব্‌লাম ;—গানটি নিবিড় আবেশে তাঁদের এমন বিবশ-বিহ্বল ক'রে তুলেছে যে তাঁরা কাঁদছেন ! এই রকম দু'চারটি গান আপন মনে গাইলাম, ১০৷৷টা বেজে গেল। বধূরা দুধ কলা এনে দিলেন, খেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়লাম। এক ঘুমে ভোর চারটা হয়ে গেল, শৌচাদি সেরে গান ধরলাম "জাগ জাগ নগরবাসি নিশি অবসানরে, গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে উঠরে কুতূহলে শীতল হবে মন প্রাণরে" ইত্যাদি। গান শুনতে বাবুরা ও বধূরা ছু'টে এলেন। ৬টা বেজে গেল, স্নান করে সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ক'রতে লাগ্‌লাম। বধূমাতারা সংসারের কাজ ফেলে এক একবার আমায় ছুটে ছুটে দেখতে আসেন, কত প্রীতিযুক্ত হয়ে কথা বলেন, কোন সঙ্কোচই যেন তাঁদের নাই। তাঁরা বলতে লা'গলেন,—আজ আর শুধু ভাতে ভাতে খেতে দেবোনা ; ডাল তরকারী ইত্যাদি রঁাধতে হবে। আমি বললাম, মা! আমি রঁাধতে জানিনা, তারপর এই একপাকে খাওয়া আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে, এ-তে কষ্ট হয় না। তাঁরা বল্লেন, তবে বেশী করে দুধ ঘি দেবো তা-ই খাবেন। অগত্যা তাঁদের কথাতেই রাজী হোলাম, পাড়ার অনেক মেয়েরাই দুধ ঘি চাল নিয়ে এলেন। আমি বললাম, "মা ! আমি এত জিনিষ দিয়ে কি ক'রব !" তাঁরা বললেন, "না বাবা আপনাকে রঁাধতেই হবে, আমরা ছাড়ব না।" আমি সবার চাল ঘি মাখন কাঁচাকলা একটু একটু নিয়ে রান্না ক'রে খেলাম। বাকী জিনিষ আর কেউ ফিরিয়ে নিল না ওখানেই প'ড়ে রইল।

পরদিন আবার কত জিনিষ জুটে গেল। এবার সকলে যুক্তি ক'রলেন, এ সমস্ত আমরা সবাই মিলে রান্না ক'রে ভোগ দিয়ে সাধু ব্রাহ্মণের কাছে খাবো। আমি বললাম,—বেশ তাই হবে। আমি আমার মতন হবিষ্যান্ন রেঁধে নিলাম, তারপর তারা খিচুড়ী রেঁধে প্রায় ২৫ জনা ওখানে বসে প্রসাদ পেলেন। তাঁদের এত স্নেহ-মমতা আমার উপর এসে প'ড়ল। তিনদিন কেটে গেল। তাঁরা

ব'লতে লাগ্‌লেন, এখানে আপনার একটি মঠ করে দিই, এখানেই থাকুন।

আমি তাঁদের ভালবাসা ও তাঁদের স্নেহ-প্রীতি পাশে আবার বাঁধা পড়ব ;—এ কেমন তর কথা! এক মায়া ছেড়ে এসে আবার এদের মায়ায় প'ড়ব! আমি বললাম, আর এখানে থাক্‌ব না। ৩ দিন হয়ে গেল আজই আমি রওনা হব। এই ব'লে রওনা হলাম। বধূমাতারা ও বাবুরা চোখের জল ফেলে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আবার আসবেন তো আমাদের এখানে? আমি বললাম, ঠাকুর আনেন তো আসবো। এই ব'লে আমি তাঁদের গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম।

এখন রাস্তা চলতে চলতে ভাবছি কোথায় যাই। হঠাৎ মনে হল, পাবনায় হিমাইতপুরে শ্রীঅনুকুল ঠাকুর নামে একজন সাধু আছেন। তাঁকে দেখে তারপর শ্রীজগদ্বন্ধু আঙ্গিনায় যাবো। শ্রীঅনুকুল ঠাকুরের তখন খুব নাম। খুব প্রতিষ্ঠাবান লোক। অনেক বড় বড় লোক তাঁর শিষ্য ;—এই সব শুন্‌লাম। তাই তাঁকে দেখবার জন্য কুষ্টিয়ায় এসে পৌঁছিলাম। সেখানে এক উকিলের বাড়ীর বারান্দায় থাক্‌লাম। তাঁরা দুধ সন্দেশ এনে দিলেন, তাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। সকালে উঠে শ্রীঅনুকুল ঠাকুরকে দেখবার জন্য রওনা হ'লাম। ষ্টিমারে রওনা হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় ১০॥টা হবে।

নদীতীরে সুন্দর আশ্রম, খড়ের সব ঘর। ১০।১২ জন ভক্ত সঙ্গে তিনি ব'সে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, দেববালক এসেছ! আমি ভাব্‌লাম আমিতো দেববালক নই! গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনি আদর ক'রে কাছে বসালেন,—সুন্দর চেহারা, পরণে অতি সুন্দর একখানা কাপড়, স্মিত মুখে অনিন্দ্য সুন্দর গোঁপ ; আধ-আধ কথা শুনে মুগ্ধ হোলাম। হঠাৎ তিনি উঠে আমাকে ধরে নদীর ধারে বেড়াতে লাগলেন। কত প্রীতির অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রলেন আবার একটি চেয়ারে ব'সলেন, আমি

সামনেই একটি বেঞ্চিতে ব'সলাম। আমার দিকে অনিমিখ নয়নে তাকিয়ে রইলেন, আমিও তাকিয়ে রইলাম, এমনি ভাবে ৫।৬ মিনিট কেটে গেল। আবার তিনি আমায় গলা জড়িয়ে ধরে প্রীতির কথা কইলেন। তাঁর ভক্তবৃন্দরা এইসব দেখে আনন্দে হাসছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল! গান কীর্ত্তন হবে, তিনি সেখানে গিয়ে ব'সলেন। সুন্দর একটি আসন পাতা হয়েছে তা'র উপর তিনি বসেই চোখ বুঝলেন। আরম্ভে কীর্ত্তন হ'ল! কত রকমের গান গাওয়া হোলো,—মায়ের গান, রবিঠাকুরের গান, ব্রহ্মসঙ্গীত; আবার কীর্ত্তন। বেশ জমাট বেঁধে গেল, আমি মুগ্ধ হয়ে এই সব শুনলাম। কীর্ত্তন শেষ হোলে হরির লুট দেওয়া হ'ল। সেখানে ৫।৭ দিন রইলাম। শ্রীঅনুকুল ঠাকুর মহাশয় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ক'রলেন। তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা দেখে বেশ আনন্দ লাগ্‌ছে। তাঁর সঙ্গে কুষ্টিয়ায় এলাম এবং এক উকিল বাবুর বাড়ীতে রইলাম। খুব উৎসব হোলো, কীর্ত্তন হোলো। তারপর তিনি পাবনায় হিমাইতপুর চলে গেলেন আমিও ট্রেনে ফরিদপুর শ্রীজগবন্ধুর আঙ্গিনায় রওনা হলাম।

গাড়ীতে বসে বসে ভাব্‌ছি,—কত লোকইতো দেখ্‌ছি কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মতন অমন নিতাই গৌর বলে কাঁদা বদনতো আর কারও দেখতে পাই না। সদা মেদুর মৃদুমন্দ হাসি, মুখে যেন সর্ব্বদাই উৎসব লেগে আছে। অত কাঁদা! অত বালকের মত হাসি! কই কাউকেই তো এমন দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। তাঁর আঁখিজলে ভাসা মুখখানা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। সে করুণ নয়ন সর্ব্বদা মানস পটে জাগে, চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারি না। কত সাধুদের সঙ্গে তো ঘুরে বেড়াই, কীর্ত্তন ক'রে বেড়াই, তবুও তাঁকে ভুলতে পারিনা। স্কুলে পড়বার সময় দুটো দিন মাত্র, আর সিঁথিতে একটা দিন মাত্র তাঁকে দেখেছি; তাঁর স্নেহ প্রীতি কোন মতেই ভুলতে পারিনা। মনে ভাবি, একজন বৈষ্ণব সাধু এমন ক'রে আমার মনটা দখল ক'রে নিল কি কোরে? উনিতো কোন

যাদুমন্ত্র জানেন না, হিপ্‌নোটাইজও করেন না। বালকদের মত আমার সঙ্গে সখ্য ব্যবহার ক'রলেন! তখন ভাবছি, নিশ্চয়ই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে নাম-মাদিকা করুণা ও নয়নে একটা অমোঘ আকর্ষণী শক্তি আছে! আবার ভাবছি দূর ছাই, উনিতো দেখ্‌তেও খুব ফরসা নন্‌। তবুও এমন সুন্দর তাঁকে কেন লাগে? আমি কিছুই ঠাওর কোর্ত্তে পাচ্ছি না। উনি কি কোন যাদুমন্ত্র জানেন? না তাওতো নয়! এত সুন্দর সহজ সরল ব্যবহার তাঁর! বড় সাধু ব'লে, মহাপুরুষ ব'লে কোন অভিমানও তাঁর ভিতর দেখলাম না,—কেমন সহজ সরল সখ্য ভাবের ব্যবহার; অথচ তিনি যে আমাদের চাইতে কত মহান্‌ কত বড় সাধু।—কত লোকে তাঁকে মানে, কত বড় বড় জমিদার, প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার কতশত শিক্ষিত লোক তাঁর পায়ের কাছে লুটে পড়েন,—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তিনি নাকি পড়াশুনা কিছুই করেন নি;—ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নাকি পড়েছেন!

তবুও কীর্ত্তনে কত মর্ম্মস্পর্শী, সাঙ্কেতিক ও অর্থপূর্ণ আঁখর দেন। এ-নিগূঢ় আঁখর তিনি কীর্ত্তন কোর্ত্তে কোর্ত্তেই বানিয়ে বলেন। কত কত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিচয় অফুরন্তভাবে তাঁর শ্রীমুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। তাঁর কীর্ত্তনের আঁখরে নাকি ষড়দর্শন-বেত্তা বড় বড় পণ্ডিত বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। বড় বড় পণ্ডিতরাও বলেন, তাঁর কীর্ত্তনের আঁখর যদি কেউ ব্যাখ্যা করে তবে নাকি এক একখানা বড় গ্রন্থ হয়ে যায়; কিন্তু কই তিনি তো এমন বড় হয়েও বড়র মত ব্যবহার করেন না; এইরূপ কত কি ভাবতে ভাবতে ফরিদপুর এসে পৌঁছিলাম। বিনা টিকিটে উঠেছি। টিকিট মাষ্টার বললেন, 'টিকিট কই?' আমি বললাম,—আমার পয়সা নেই, টিকিট করিনি, অমনি তিনি রেগে বললেন, "বেটাকে জেলে পুরতেই হবে, ছোট বেলায় সাধু হয়েছে। মাথায় দেখি বেশ চুল রেখেছে! ভণ্ড সেজে বেড়াচ্ছো কেন?" আমি বললাম, আমি এমনতরই হয়ে গেছি। যা সাজা দেবার হয় দিন, পয়সা নেই টিকিট করিনি,

ফকির লোক পয়সা কেইবা দেবে। তিনি আমার কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য হলেন। বললেন,—কত দিন সাধু হয়েছ? আমি বললাম, "সাধু হইনি, সাধু হওয়া কঠিন, কেবল সাধুর সাজ সেজেছি, নইলে কেউ ভিক্ষে দেবে না, খেতে দেবেনা, তাই এই বেশ"। —কতদিন সাজ সেজেছ? "এই বছর খানেক হবে"। —কোথায় থাক? "যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই", —কি খাও? "যে যখন ডেকে খেতে দেয়, যা পাই তাই খাই।" —মাছ মাংস খাও নাকি? "না আমি ওসব খাইনা, ছুঁইও না।" – কেন তান্ত্রিক সাধুরাতো খায়? "আমি খাইনা বলে কে খায় বা না খায় তা'নিয়ে আমি বিচার করবো কেন"? এইরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে নিয়ে রেল ষ্টেশনের এক পাশে দাঁড় করালেন। মনে মনে ভাবছি, এইবার বুঝি আমায় রেলের গারদে ভরবে বলে তোড়জোড় করছে। একটা আরদালিকে ডাকলেন, দু'তিন জন রেল পুলিশও এল, আরদালিও এল।

আমি একটু ভীত হয়ে পড়লাম, এইবার হয়তো আমায় হাত কড়া দিয়ে গারদে নিয়ে যাবে। টিকিট না কেটে অন্যায় করেছি যখন, তখন সাজা মাথা পেতেই নেওয়া ভাল,—এইসব ভাবছি; টিকিট মাষ্টার বললেন, "এই বেঞ্চির উপরে বোসো।" পুলিশ অফিসার ও টিকিট মাষ্টাররা ফিস্ ফিস্ ক'রে কত কথা বলছেন। আমি ভাবছি— আমারই কথা নিশ্চয়ই। হয়তো এবার জেল খাটতে হবে। হঠাৎ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথা মনে হোলো। আজ যদি তাঁর কাছে থাকতুম তবে এ-বিপদ আর হোতনা, তিনি কত ভাল বেসেছিলেন কিছুতেই হাত কড়া দিয়ে আমায় জেলে নিয়ে যেতে দিতেন না। এইসব কত কি ভাবছি; এমন সময় টিকিট মাষ্টার ও তাঁর স্ত্রী এসে আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। এমনকি পুলিশ অফিসাররাও এসে প্রণাম করলেন। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, একি ব্যাপার হোলো? টিকিট মাষ্টার ও তাঁর

স্ত্রী বললেন, "আমাদের কোয়াটারে চলুন, সেখানে বিশ্রাম করবেন ; স্নান আহার করবেন। রাত্রিতে গাড়ীতে এসেছেন, খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি? আমি বললাম, "না"। তাঁর স্ত্রী সজল নয়নে আমার দিকে তাকালেন। যেন কত স্নেহ-সিঞ্চিত নয়ন তাঁর !

আমি তখন বসে ভাবছি,—একি হোলো, একেবারে সব যে উল্টে গেল! শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে স্মরণ করায় তিনিই কি এমন ক'রে সব উল্টে দিলেন, না আমার ভাগ্যই ফলে গেল—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। শেষে বুঝলাম নিশ্চয়ই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপা! তাঁরা একটা ঘরে কম্বল বিছাইয়া তথায় একটা তুলসীর টব এনে রাখলেন। তারপর তেল এনে বললেন,—তেল মেখে স্নান করুন। আমি বললাম,—তেল মাখিনা অনেক দিন হতে।

তাই তাঁরা আর কিছু বললেন না। বালতিতে জল এনে দিলেন. স্নান করে গায়ত্রী জপ কোর্ত্তে বসলাম। তাঁরা জাতিতে গয়লা, উনুন ধরিয়ে দিলেন, আমি খিচুড়ী রেঁধে তুলসী দিয়ে খেলাম্। আমি ভোগ কি ক'রে দিতে হয় তখন জানিনা। তুলসী দিয়ে সবাই প্রসাদ পায় দেখেছি, তাই করলাম। মনে মনে ভাবছি, আমি ব্রাহ্মণ হয়েও এঁদের মত ভক্তিমান্ তো নই। এঁরা আমায় কত ভক্তি ক'রে গৃহে নিয়ে এলেন, কত সেবা যত্ন ক'চ্ছেন। আমিতো শুধু সাধুই সেজেছি ! কই, এঁদের মত দৈন্য তো আমার নেই, এঁরা আমায় ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করলেন, কই আমিতো করি নাই।

ব্রাহ্মণ হলে খুব অহঙ্কার হয় বুঝি,—ইহাই আমার মনে হোলো। তাঁরা অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে সেই দিনটা তাঁদের বাড়ীতে আমায় রাখলেন ও বললেন,—পরদিন ঘোড়ার গাড়ী ক'রে আপনাকে আঙ্গিনায় পাঠিয়ে দোবো। আমি অগত্যা রাজী হলাম ও সেদিনটা তাঁদের বাড়ীতেই রইলাম। সন্ধ্যা হলো, মা ও কন্যা এসে ধুপধুনা ঘরে দিয়ে গেলেন। আমি তাঁদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

টিকিট মাষ্টারবাবু কেবল ক্ষমা চাইছেন—"আমি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করবেন না, আমি ভুল বুঝেছিলাম; আমায় মার্জ্জনা করবেন"; এই রকম দৈন্যোক্তি করতে লাগলেন।

আমি একটু পরে যে গানটী বাড়ীতে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর মুখে শুনেছিলাম সেই গান ধরলাম,—'মাটিতে চাঁদের উদয় কে দেখবি আয়। এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস্নি দেখবি নদীয়ায়। হেরিয়ে গৌরাঙ্গ চাঁদের মুখশশী, লাজে গগন চাঁদ পড়ে খসি, এ চাঁদ ষোল কলায় পূর্ণ দিবানিশি, হেরে পাপ তাপ তমোরাশি দূরে পালায়। যজ্ঞসূত্রে কিবা শোভে গলা, তুলসীর মালা করে হেলা দোলা, রাধা প্রেমে গোরা হয়েছে ভোলা, আপনি কাঁদিয়ে গোরা জগৎ কাঁদায়। অনুরাগ-কলঙ্ক হৃদে ভরা, পীতধড়া ত্যজে কৌপীন পরা, রাধা প্রেমে বুঝি আঁখিঝরা, তাই আপনি কাঁদিয়ে গোরা জগৎ ভাসায়।" গান শুনে তাঁরা খুব মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন—"আপনি কিছুদিন এখানে থাকুন না।" আমি বললাম, "না, আমি আর থাকতে পারবো না, কাল সকালে শ্রী'বন্ধু সুন্দরের আশ্রমে যেতে হবে।"

রাত্রি ১০টা বাজল, টিকিটমাষ্টার বাবু কাছে এসে বসলেন, কত প্রীতিযুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কতদিন আঙ্গিনায় থাকবেন?" আমি বললাম, "অল্পকটা দিন থাকবো তারপর একবার শ্রীনবদ্বীপ ধাম দেখতে যাবো।" নবদ্বীপ ধামের কথা শুনে তিনি খুব আনন্দিত হোলেন, বললেন—"আমারও নবদ্বীপে বাড়ী; আপনি যখন সেখানে যাবেন তখন আমার ওখানে এক দিন বিশ্রাম ক'রে, তারপরে অন্যত্র যাবেন, আমি আপনাকে টিকিট ক'রে গাড়ীতে উঠিয়ে দোবো। বিনা টিকিটে গেলে আবার অন্যান্য রেলকর্ম্মীরা আপনাকে কষ্ট দেবেন; দুর্ব্বাক্য বলবেন।" আমি বললাম, "আচ্ছা, তাই কোরবো।" এখন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা দুধ জ্বাল দিয়ে একবাটী দুধ, কলা ও সন্দেশ আমায় দিয়ে গেলেন, প্রায়

আধ সের সন্দেশ, খেতে পারলুম না পড়ে রইলো ; তাঁরা নিয়ে গিয়ে সবাই খেয়ে বললেন, "ব্রাহ্মণ সাধুর উচ্ছিষ্ট কত ভাগ্যে মেলে"। এই কথা শুনে আমার নিজের প্রতি ধিক্কার এলো। কারণ আমি কাহারও এঁটো কখনও খাইনা। ব্রাহ্মণ বলে তীব্র একটা অভিমান আমার হৃদয় জুড়ে বসে আছে। মনে মনে ভাবছি,—দূরছাই, বামুন বলে পরিচয় না দেওয়াই ভাল!—একথা মনে উঠেই আবার মনেই লয় পেয়ে গেল। একটু পরে কম্বলে শুয়ে পড়লাম ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। শৌচাদি সেরে জয় জগদ্বন্ধু, বোল হরি, বোল হরি বোল—নাম ধরলাম। মাষ্টারবাবু একটু পরে এসে দেখা করলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, "এ বেলাটা এখানে অন্নপ্রসাদ পেয়ে বিকেলে যাবেন"। আমি তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না তাই সে বেলা থেকে গেলাম।

মা এসে উনুন ধরিয়ে দিয়ে অনেক অনুরোধ ক'রে ডাল রাঁধতে বললেন। আমি বললাম, আমি ভাতে ভাতে রাঁধি, মা বললেন,—"তা হবেনা। আমরা কত রকম রেঁধে খাবো আর আপনি ভাতে ভাতে খাবেন তা হবেনা।" অগত্যা আমি তাঁর কথায় রাজি হয়ে ডাল চড়িয়ে দিলাম। তা'র ভিতর আলু-বেগুন দিলাম। তিনি রান্না করার কায়দা দেখিয়ে দিয়ে কেমন করে সম্বারা, তেল ইত্যাদি দিতে হয় শিখিয়ে দিলেন। তারপর লাল আতপ চাউলের অন্ন রাঁধলাম। ভিতরকার সিদ্ধ আলু-বেগুন তুলে নুণ দিয়ে মেখে নিলাম। তুলসী দিয়ে খেতে লাগলাম। তাঁরা আমার খাওয়া দেখে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

তাঁদেরই যেন বেশী আনন্দ এতে! আমি ভাবছি কি সুন্দর অন্তর এঁদের, কি নির্ম্মল ভালবাসা! কই আমার হৃদয়তো এমন নয়। এতটুকু দরদতো আমার নেই,—তখন মায়ের মুখখানা মনে পড়লো, দিদিমার স্নেহ মনে পড়লো, চোখে জলও এলো; দু' এক ফোঁটা বাইরেও পড়ে গেল। পাছে ওঁরা দেখে ফেলেন

এই ভেবে, সামলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় তাঁরা দেখেই ফেললেন এবং বললেন,—সাধুজী কাঁদছেন কেন? আমি বললাম, "আপনাকে দেখে আমার মা'র কথা মনে পড়ে গেল"। —ও! আপনার মা আছেন বুঝি?—কতদিন যান নাই? "প্রায় এক বৎসর হোলো"।—না বাবা তা কোরোনা, মাকে দেখা দিও। আমি বললাম, "নবদ্বীপ ধাম দেখে তবে তাঁর কাছে যাবো।" —আহা! আপনার মত ছেলে যাঁর তাঁর মা কি করে আছেন? বাবা, আমারই তো মায়া হোচ্ছে আপনাকে দেখে। মা কাছে বসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন,—কটি ভাই, বোন, আর কে কে আছেন? আমি সবকথা তাঁকে বললাম কিন্তু কোথায় বাড়ী ঘর, তা বলিনি, পাছে আবার অঘটন ঘটে। কারণ ফরিদপুরে আমার আত্মীয় স্বজন আছেন—টের পেলে আমায় ধরে নিয়ে যাবে, এ-ভয়টাও আছে তখন বিলক্ষণ।

প্রসাদ পেয়ে বসে বসে গল্প করলাম তাঁদের সঙ্গে—৪টা বেজে গেল! মাষ্টার মশায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে ভাড়া দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন আঙ্গিনায় পৌঁছিয়ে দিতে। আমায় বারবার অনুরোধ করলেন,—ফিরবার সময় যেন এখানে আসেন ভুল যেন না হয়! আমি বললাম—"আচ্ছা তাই হবে।" খুব উঁচু রাস্তা ওখানে। গাড়ী খুব ছুটে চল্‌লো। অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীবন্ধু সুন্দরের আঙ্গিনায় এসে পৌঁছে গেলাম। গাড়ী হতে নেমে আঙ্গিনায় গিয়ে বন্ধুসুন্দরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করলাম। দণ্ডবৎ করে উঠে দাঁড়াতেই আশ্রমবাসী সবাই আমার কাছে এলেন। যথাযোগ্য সবাইকে প্রণাম করলাম। মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রদা', বাদল বিশ্বাস, কৃষ্ণদাস, উদ্ধারণ দাস, নিকুঞ্জদা', প্রেমদাস সবারই সঙ্গে দেখা করলাম। বহুদিনের কথা তাই সবার নামও মনে নাই। প্রভুর ভক্তবৃন্দ সব ওখানেই আছেন। তাঁদের ভিতর একজন সুন্দর কীর্ত্তন করেন, তিনি সেখানে মহান্ত বলে পরিচিত। তিনিও এলেন, এই সকল ভক্তের সঙ্গে কয়দিন

কাটলো। খুব কীর্ত্তন হয় ওখানে এই নামে,—"হরি পুরুষ জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ, চারি হস্ত চন্দ্র পুত্র হা কীট পতন।" সবাই কীর্ত্তন করছেন, আমিও করলাম এমনি ক'রে ; এইভাবে দিনগুলো কাটছে।

'বন্ধু সুন্দরকে দেখিনি কোন দিন, তাই দেখবার বাসনা জাগতে লাগলো। তিনি ঘরের ভিতর থাকেন, চারিদিকে বেড়া ও খুঁঠি দেওয়া। কেবল বাদল বিশ্বাস মশায় ছাড়া আর কেউ সে ঘরে যেতে পারে না, তিনি তাঁর সেবা করেন। ভক্তেরা আসেন তাঁকে দেখবার জন্য। কিন্তু কেউ দর্শন পায় না। বাদল বিশ্বাস মশায় কাউকেই ঘরে যেতে দেন না। ঢাকা থেকে কলেজের বেশ জোয়ান কয়টি ছেলে এসেছে, তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। তারাও প্রভুকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছে, অথচ তাঁকে দেখতে কেউকে দেবে না,—ঘরে যেতেও দেবে না। তারা সব যুক্তি করলো,—সন্ধ্যার পর ঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে প্রভুকে দেখবে। খুব বলবান শরীর তাদের। তারা প্রায় ৮।১০ জন, আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। বিশ্বাস মশায়, উদ্ধারণ, প্রেমদা' ইত্যাদি নিষেধ করলেন বটে কিন্তু কে কার কথা শোনে, বলবান ছেলে সব।

প্রভুকে দেখবার সাধ ভীষণ। প্রায় ১২ বৎসর প্রভু নাকি ঐ ঘরেই আছেন। আমাদের সবারই কৌতূহল জেগেছে,—তাঁকে দেখবই। সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে এলো, ক্রমশঃ ৮টা ৯টা বাজলো, আশ্রম প্রায় জনশূন্য হতে লাগলো, আশ্রমে থাকলো অল্প মাত্র লোক। এমন সময় তারা দরজা ভেঙ্গে প্রভুর ঘরে ঢুকলো, আমিও তাদের সঙ্গে ঢুকলাম। বাদল বিশ্বাস চেঁচাতে লাগলেন—কে কার কথা শোনে ?

দেখলাম—প্রভু খাটে শুয়ে আছেন, চাদর দিয়ে গা থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা। মাথার কাছে প্রদীপ জ্বলছে। তিনি আমাদের

দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন আবার পরক্ষণেই মাথায় চাদর ঢাকা দিলেন। আমরা ঘর থেকে বাইরে এলাম। ঢাকার ভক্তেরা খুব বলবান্ কিনা তাই আঙ্গিনার ভক্তেরা বিশেষ কেউ তাদের বকাঝকা করতে সাহস পেলেন না। এমনি ক'রে দু'তিন দিন কাটলো। একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ বাদল বিশ্বাস মশায় দ্রুতগতিতে ঘর হতে বের হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন, আমরা কয়জন ছুটে সিড়ির ধারে গেলাম। 'বন্ধুসুন্দর বালক ভাবে হাতে দরজার হুড়কো উত্তোলন ক'রে বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। পায়ে রবারের জুতা। আমরা আপাদমস্তক দেখলাম।

হঠাৎ একটী ভক্ত প্রভু প্রভু বলে দণ্ডবৎ করল আর অমনি প্রভু তাহার পৃষ্ঠে ঐ হুড়কো দিয়ে আঘাত করেই ঘরে চলে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঐ ভক্তটির পিঠে একটী ফোড়া হয়েছিল, আঘাতে ফোড়া ফেটে রক্ত ও পুঁজ পড়ল; সে কৃতার্থ হলো, দিন কয়েক পরে তার ফোড়া সেরে গেল। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল 'বন্ধুসুন্দরের দর্শন লাভ। তা হয়ে গেল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। প্রথম ঘর ছেড়ে 'বন্ধুসুন্দরের আঙ্গিনায় আসি, তখন তাঁরই উপদেশাদি পালন করবার চেষ্টা করেছি। তাঁর কৃপাই আমার জীবনের মস্ত সম্বল। তাঁর দর্শন পেয়ে মন শান্ত হল, ভাবলাম আর এখানে থাকব না। এখান থেকে শ্রীনবদ্বীপধামে চলে যাব, ইহাই স্থির ক'রে সুধন্য মিত্র মহাশয়ের ঔষধের দোকানে এসে পৌঁছিলাম। তিনি প্রীতি ক'রে কোলে টেনে নিলেন। বললেন, "কোথায় যাবে"? আমি বললাম, "শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাবো, শ্রীলবাবাজী মহাশরের সঙ্গে দেখা করব, কোথায় আছেন তিনি, বলে দিন আমায়"। এই কথা বলে কেঁদে ফেললাম। তিনি চোখের জল মুছিয়ে বললেন,—বেশ তো তাঁর কাছে যাবে। কয়দিন থাক এখানে তারপর যেয়ো। আমি তাঁর কথায় আশ্বস্ত হলাম। দু'দিন সেখানে রইলাম; তিনি নবদ্বীপ

ধামে শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেখানে থাকেন সেই আশ্রমের নাম ব'লে দিলেন,—আশ্রমের নাম সমাজ বাড়ী। শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটে আশ্রম। আমি সব জেনে নিয়ে ষ্টেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কাছেই ঘোড়াগাড়ীর গাড়োয়ান সব হাঁকছে,—দু'আনা সেয়ার ষ্টেশন পর্য্যন্ত, আমি গাড়ীতে উঠলাম। ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলাম, টিকিট মাষ্টারমশায় গাড়ীভাড়া দিয়ে আমায় তাঁর কোয়াটারে নিয়ে গেলেন। সে রাত্রিটা তাঁর কাছে রইলাম। তাঁকে বললাম, আমি একদিন রাজবাড়ীতে যোগেন কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী যাবো,— তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নবদ্বীপ যাবো ! তিনি খুব ভালবাসতেন আমায়। আমি একবার ৪।৫ দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "এদিকে এলে একবার এসো আমার কাছে"। আমি তখন কথা দিয়েছিলাম, তাই তাঁর ওখানে যাবো। পরদিন তিনি রাজবাড়ীর একটা টিকিট করে দিলেন আর শ্রীনবদ্বীপধাম অবধি ভাড়ার টাকা একটা নেকড়ায় বেঁধে দিয়ে বললেন,—কোমরে রেখে দিন। আমি তাঁর কথানুযায়ী টাকা কয়টি কোমরে রাখলাম, টিকিট হাতে করে গাড়ীতে চড়লাম, অন্ততঃ ৩।৪টি ষ্টেশন পরেই রাজবাড়ী এসে পৌঁছিলাম।

রেল লাইনের ধারেই তাঁর বাড়ী। একটু দূর হেঁটেই তাঁর বাড়ী এসে পেঁাছিলাম। যোগেন কবিরাজ মহাশয় আমায় আলিঙ্গন করলেন, আমি তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম, তিনিও দণ্ডবৎ করলেন। দু' তিন দিন তাঁর কাছে 'বন্ধুর কথা শুনলাম। শ্রীজগবন্ধু সুন্দরের একান্ত ভক্ত তিনি। 'বন্ধু ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাঁর নিষ্ঠা দেখে খুব আনন্দ হোলো। এখানে কয়দিন থেকেই, নবদ্বীপ যাইবার জন্য ষ্টেশনে এসে কৃষ্ণনগরের একখানা টিকিট কিনলাম। কৃষ্ণনগর হয়ে হেঁটে হেঁটে শ্রীনবদ্বীপধামে যাবো,— এই ঠিক করলাম। সন্ধ্যার সময় গাড়ী ছাড়ল। পরদিন ৬টার সময় কৃষ্ণনগরে গাড়ী এসে থামল। আমি গাড়ী হতে নেমে স্বরূপগঞ্জ ঘাটে যাবো বলে রওনা হোলাম।

কৃষ্ণনগর থেকে স্বরূপগঞ্জ মাত্র ৫ মাইল। চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে আত্মভোলা হয়ে পড়লাম। পথের ধারে সুন্দর বৃক্ষরাজি, প্রশস্ত ময়দান পাশে! বেলা তখন প্রায় ৭টা। পাখীরা কলরব কোচ্চে। দোয়েল-শালিক পাখীর ডাক, কোকিলের কুহু কুহু তান আমার মনকে বিকল করে দিচ্ছে।

বহুদিনের সঞ্চিত সাধ,—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাঁর বিহারভূমি এবং মা গঙ্গার দর্শন লাভ, অহো! এখন সং দর্শনই হবে! এই চিন্তায় আনন্দে ডগমগি হয়ে খুব জোরে হাঁটছি; অল্প সময়ের মধ্যেই স্বরূপগঞ্জ ঘাটে এসে পৌছিলাম। তারপর দেখতে পেলাম,—সেই মা সুরধুনী! ওপারে অপরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধাম!—আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। সুরধুনীর তীরে এসে মা গঙ্গা ও শ্রীনবদ্বীপ ধামের উদ্দেশ্যে রজে লুণ্ঠিত হয়ে দণ্ডবৎ করলাম। উঠে বসলাম, ভাবতে লাগলাম, দূরে ঐ, ঐ তো দেখা যায় সেই চির অনুপম মোর কত ঈপ্সিত শ্রীনবদ্বীপ ধাম।

দুটি খুব বড় ঝাউ গাছও দেখলাম। একটী লোককে জিজ্ঞাসা করলাম,—কতদূর নবদ্বীপ ধাম? তিনি বললেন,—হাঁ, ঐ তো দেখা যায় শ্রীবাস অঙ্গন ঘাট। ঐ তো কত ঠাকুর বিগ্রহ মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির! জগাই মাধাই ঘাট, নিদয়ার ঘাট। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—নিদয়ার ঘাট কেন? তিনি বললেন,—ঐ ঘাটে শ্রীমহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে কাঁদিয়ে পার হয়ে যান, তাই নিদয়ার ঘাট বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই বলে তিনি চ'লে গেলেন, আমি ওখানে মা গঙ্গার তীরে প্রায় দু'ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের লীলা-কাহিনী মনে জাগছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাবাজী মহারাজের স্মৃতিও মনে ভেসে উঠলো যাঁকে দেখেছিলাম ১৩ বৎসর বয়সে—স্কুলে পড়বার সময়। তাঁর সেই মধুর মৃদুমন্দ হাসিভরা মুখখানা, কীর্ত্তনে চোখের জলে-ভাসা তাঁর সেই বদনখানা মনে জেগে

উঠল। ভাবলাম তাঁর দেখা পাব কি হেথায়! এমন সৌভাগ্য, সুদিন আমার আসবে কি! আবার কি তিনি আমায় ময়না বলে ডাকবেন! আবার কি আমার সঙ্গে পরিহাসে কথা বলবেন! ১৩ বৎসর বয়সের কথা, আজ আমার বয়স ১৭ বৎসর; ৪ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। ৩ বৎসর আগে, মাত্র ১ দিন সিঁথিতে দেখা হয়। এই দীর্ঘদিন পর আর কি তাঁর আমায় মনে আছে! তাঁর অগণিত ভক্ত, তিনি এখন নিশ্চয়ই আমায় ভুলে গেছেন; এইরূপ কত কথা আমার প্রাণে জাগছে।

এমন সময় মাঝি হাঁক ছাড়ছে,—"কে পারে যাবেন, আসুন।" আমি তার কথা শুনে নৌকায় গিয়ে বসলাম। গঙ্গার মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটের দিকে নৌকা চলল। মা গঙ্গার স্বচ্ছ বারি নৌকায় বসে বসে পান করলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, গত রাত্রে কিছু জোটেনি, আজ ১১টা বেজে গেজে, তাই প্রাণ ভরে গঙ্গাজল পান করলাম, ক্ষুধা কিছু নিবৃত্তি হোলো; কিন্তু প্রাণের মধ্যে কেবল জাগছে,—তাঁর দেখা কি পাব! তিনি কি আবার হেসে কথা কইবেন! এইরূপ কত কি ভাবছি, এখন নৌকা তীরে এসে পৌঁছিল। মাঝিকে পারের কড়ি দিলাম, আমায় শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটে নামিয়ে দিলো। কত নরনারী গঙ্গা-স্নান করছেন। হা গৌরাঙ্গ বলে, গঙ্গামা বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। এই সুরধুনীর কূলে কূলে মহাপ্রভুর যে-লীলাখেলা তা মনে জাগছে। মন বিকল হয়ে পড়ছে, কিন্তু ভাবছি,—কই সে গৌর! আপন মনে আস্তে আস্তে বলতে লাগলাম,—"এই সেই নবদ্বীপ, সেই সুরধুনী এই সেই গঙ্গাঘাট। কেবল দেখিনা সুন্দর গোরা, নাই সে প্রেমের হাট। আর তো শুনতে পাইনা হরি হরি হরি বোল। নদীয়ায় সেই প্রেমের ঠাকুর, পাতিয়া ধরেনা কোল। নদীয়ারই পথে পথে, চাঁচর চুলের দোল। পাই না দেখিতে সে চাঁদ বদন পতিতে ধরিত কোল। নদীয়ায়

পথে কীর্ত্তন রোল, শুনিতে পাই না আর। দেখিতে পাই না সে নাচা গৌর, নিতাই সঙ্গে তাঁর। শ্রীবাস অঙ্গন মুখরিত সদা, নাম ধ্বনি কলরোল। শুনিতে পাই না সে প্রেম-নাদ,— গোপী গোপী গোপী বোল। আর তো পাই না দেখিতে সেই, জগা মাধা পথে। পলকে মারিল কলসীর কানা, ঝলকে রক্ত মাথে। শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন নিতাই, করুণায় গেল ভাসি। মুছালো তাদের কালিমা, দিল প্রেম-পীযূষ রাশি। অঙ্কিত সেই প্রেম মাধুরী, নিতাই গৌর সাথে। পাইনা দেখিতে সে চাঁদ বয়ান নদীয়ার, পথে পথে। সেই নদীয়া সেই ভাগীরথী, পূরবের মত ভাসে। কেবল দেখি না নদের নিমাই, নিতাই দেখি না পাশে। নটন লীলা দেখি না আর, মধুর অধর হাসি। কমল নয়ন ফোটে না আর, প্রেম সায়রে আসি। প্রেম সায়রে আরতো দেখি না, স্বর্ণ কমল হেলা। নদীয়া বধূর প্রাণ আনচান, দেখিতে পাই না দোলা। বিম্ব অধরে হাসিটি মধুর, অমিয়া ঝরিছে খসি। মালতি ফুলের মালাটি গলে, হৃদয়োপরি ভাসি। মকর কুণ্ডল হেলন দোলন, পিন্ধন পীতবাস। কোঁচার বলনি দোলনি দেখি, লাগিল প্রেমের ফাঁস। কে আনিল এই ধরণী মাঝে, মধুর হরিবোল। নাম কীর্ত্তনে মাতালো পরাণ, পতিতে দিল সে কোল। পতিত অধমে কে ভরসা দিল, তুমি না প্রেমের হরি? সেই হরি তুমি পতিতোদ্ধারী রসময় বংশীধারী। প্রেম-পিয়াসা মেটে না দেখি, রাধা ভাবে হরি। (রাধা) কান্তি ধরিল বংশীধারী, নবদ্বীপে অবতারী।" এইরূপ ভাবে মহাপ্রভুর কত কথা মনে জাগছে। ভাবছি, লীলাতো নিত্য কিন্তু কই আমিতো দেখতে পাই না! —এ-সংশয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম।

হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে মা গঙ্গায় স্নান করলাম। স্নান কোর্ত্তে কোর্ত্তে মহাপ্রভুর চিন্তা সরে গিয়ে সেই মধুর মুখখানা মনে পড়ে গেল! তখন তাঁর চিন্তাই আমার মনকে অধিকার ক'রে

বসলো। স্নান ক'রে গঙ্গার তীরে বালির উপর বসে গায়ত্রী জপ করতে লাগলাম। দেড়টা বেজে গেল, উঠে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে হেঁটে শ্রীবাস আঙ্গিনার শান বাঁধা ঘাটে এসে একজন লোককে জিজ্ঞাসা কোরলাম—"আচ্ছা এখানে কোন মঠে গেলে থাকতে দেবে কি? প্রসাদ পেতে দেবে কি? আমি নূতন এসেছি এখানে, কিছুই চিনি না।" শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের কথা কাউকে বলিনা বটে তবে মনে মনেই তাঁকে ভাবি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাধুদের মঠ আছে এখানে? তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ হাঁ, আছে। ঐ দেখুন সমাজবাড়ী মঠ। শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি স্থান। ওখানে কাল থেকে নবরাত্রি কীর্ত্তন-উৎসব আরম্ভ হবে। একজন মহাপুরুষ তাঁর শিষ্য, তিনি আর তাঁর দিদি ললিতা সখী এঁরাই উৎসব উদ্‌যাপন করবেন, তাঁর অগণিত ভক্ত সব আসবেন।" আমি বললাম,— তাঁর নাম কি? তিনি হেসে বললেন,— কেন তাঁকে জান না! ভারতের সব লোকই তাঁকে চেনে তাঁর নাম শ্রীরাম দাস বাবাজী মহাশয়, ওঁর আশ্রমে গেলে থাকতেও দেবেন, প্রসাদও দেবেন। তিনি সকলকেই এমন কি শৈব, শাক্ত প্রভৃতি যত সাধু বৈষ্ণব আছেন, তাঁদেরও ভালবাসেন; কাউকেও অপ্রীতি করেন না। তাঁকে ভালবাসে না এমন লোক কেউ আছে ব'লে আমার মনে হয় না। তাঁর পাষাণ-গলান কীর্ত্তনে পাষাণ্ডও দ্রবীভূত হয়ে যায়। আমি যদিও তাঁর শিষ্য নই কিন্তু তাঁকে না ভক্তি করে, না ভালবেসে থাকতে পারি না। আপনি তাঁর কাছে যান।"

শ্রীবাবাজী মহাশয়ের নাম শুনে চমকিত হয়ে পড়লাম। হৃদয় দুর্‌দুর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাঁকে দেখতে পাবার আশায় এসে তাঁরই খবর সর্ব্বপ্রথমে পেলাম,—আনন্দের আতিশয্যে আমার শরীরটা কাঁপতে লাগল এবং আনন্দে বিভাবিত হয়ে পড়লাম।

শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাট পিছনে রেখে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। তখন প্রায় দুইটা বাজে। সমাজ বাড়ীর গেটে এসে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ির উপর দুই এক পা ক'রে উঠছি। ঠিক এমন সময় অনতিদূরে একটি ঘরের সামনে একটি নিমগাছ দেখতে পেলাম, সেইখানে একটি ছোট ঘরের বারান্দায় শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক সেরে এসে দাঁড়ালেন ;— কপালে ও হস্তে তিলক ঝলমল কোচ্ছে, পরিধানে মাত্র একটি বহির্ব্বাস আমার দিকে সহাস্য বদনে তাকিয়ে হাত ছানি দিয়ে আমায় ডাকছেন। আমি এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর দর্শন পেয়ে কত কৃতার্থ হলাম! আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে পড়লাম। কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁর নয়ন পানে বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে তাকাতে তাকাতে তাঁর সন্নিধানে এসে শ্রীরাতুল চরণে দণ্ডবৎ করলাম।

তিনি হাত ধরে আমায় উঠিয়ে বললেন,—"কিহে ব্রহ্মচারী, দুটো বেজেছে, কোত্থেকে এলে ? খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি! মঠের সবারই প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে, সবাই বিশ্রাম কোচ্ছে, কেবল আমিই বাকি আছি। আহ্নিক শেষ ক'রে এই বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তোমাকে দেখতে পেলাম। আমার প্রসাদ ঘরে ঢাকা আছে ; এসো দু'জনা মিলে পাই। —স্নান করেছ তো ? আমি বললাম,—"আসবার পথে গঙ্গায় স্নান করে এই আপনার কাছে খুজে খুঁজে আসছি।" —"থাক পরে সব শুনব। এখন বোসো আমার কাছে দু'জনা বসে প্রসাদ পাই"। শ্রীনন্দ কাকা ও মেঘলাল দাদাকে সেখানে দেখলাম। মেঘলালদা' শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের পারশ থেকে প্রসাদ তুলে দিলেন আর একটি পাতায়। দুটি আসন হোলো, একটিতে শ্রীলবাবাজী মহাশয় বসলেন, আমি পাশের আসনটি সরিয়ে রেখে বসলাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় বললেন,– বামুন ঠাকুর যে! আসন সরালে কেন ? আমি বললাম, এই আমার পক্ষে ভাল। তিনি নিজেই প্রথমে একটু সুক্তো আমার পাতায় ঢেলে দিয়ে,

বললেন,—ন্যাও প্রসাদ পাও। মহানন্দে আমি প্রসাদ পেতে আরম্ভ করলাম, তিনিও প্রসাদ পেতে লাগলেন। মেঘলাল দা'কে বললেন,—"ডাল ঢেলে দাও তো"; অমনি তিনি ডাল ঢেলে দিলেন। কুমড়োর ডাঁটা-চর্চ্চড়ী শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের পাতের পাশেই ছিল, ঐ দিকে দৃষ্টি পড়ল; তিনি অর্দ্ধেক তুলে আমার পাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—যা! কি করলাম তোমার জাত মেরে দিলাম! আমি হেসে উঠলাম,—বললাম স্কুলে পড়বার সময়ই তো জাত মেরে দিয়েছিলেন। এইরূপ কত হাস্য পরিহাস কোচ্ছেন আমিও কচ্ছি। এই সহজ সরল গাম্ভীর্য্যহীন ও প্রীতিপূর্ণ ভাব দেখে, আমিও নিজেকে তাঁর আপনজন মনে ক'রে ফেললাম। তারপর কত ফল, কত মিষ্টি প্রসাদ দিলেন! একটাই বড় রাজভোগ ছিল, নিজে একটু ভেঙ্গে খেয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি দ্বিধা বোধ না করে এঁটো হাতেই নিলাম, অমনি হেসে বললেন,—এঁটো হাতে নিলে, আমারও জাত মারলে দেখছি!

এইরূপ কত পরিহাস-আনন্দ-হাসির হুল্লোড়। তিনি প্রসাদ পেয়ে হাত ধুয়ে একটা চেয়ারে বসলেন; আমিও তাঁর পাশে যে একটা টুল ছিল তাতে বসলাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় পান প্রসাদ পেতে লাগলেন, আর আমায় বললেন,—কাল রাত্রি জেগে ট্রেনে এসেছ, ঘুমোওনি বুঝি? আমি বললাম,—না বসে বসেই গাড়ীতে এসেছি। —"তবে যাও, আমার খাটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।" আমি আর কোন দ্বিধা না করে তাঁর খাটে এসে শুলাম আর অমনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

চারটা বেজে গেল, ঘুম ভাঙ্গল। উঠে দেখি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ও পাশে ঘুমোচ্ছেন, আমি উঠে বসলাম আর অমনি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমি খাটে বসেই আছি, ঘুমঘোর কাটেনি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় লোমকাপড় পরে শৌচে চলে গেলেন। অমনি দু' চার জন সাধু আমার উপর একটু বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন,—ছেলেটার আস্পর্দ্ধা দেখ! শ্রীল বাবাজী

মহাশয়ের বিছানায় তাঁর সঙ্গে ঘুমোচ্ছে! একটু লজ্জাও করে না! এত আস্পর্দ্ধা! ভারি তো বামুন ব্রহ্মচারী, কত বামুন আমরা দেখেছি তাঁর পায়ে গড়াগড়ি যায়। তুমি কেমন ছোঁড়া হে! কেমন ব্রহ্মচারী যে এখনও তাঁর বিছানায় বসে আছ, তাঁর পাশেই, শুয়ে ঘুমালে, তোমার একটু লজ্জাও করেনা! তাঁরা আমায় এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন কোচ্ছেন এমন সময় শ্রীলবাবাজী মহাশয় শৌচ সেরে এসে পড়লেন। তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কিহে কিসের গরম তোমাদের? তাঁরা বললেন,—দেখুন তো ছেলেটার আস্পর্দ্ধা, আপনার খাটে শুয়ে আপনার পাশেই ঘুমালো ! আবার এত বকছি তবুও বসে আছে খাটে, আপনি এলেন একটু উঠেও দাঁড়াল না! তাদের কথায় আমার চোখে জল এসে পড়েছে। আমিতো ইচ্ছে ক'রে তাঁর খাটে শুইনি, তিনি বলেছেন তাই শুয়েছি,—এই সব ভাবছি তখন শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি আমার উপর পড়ল।

কি স্নেহ-করুণা-ভরা সেই অভিরাম দৃষ্টি! তা দেখে চোখের জল আর সামলাতে পারলুম না। অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু বিরক্তি স্বরে বললেন,—ও! শুয়েছে আমার খাটে তাতে তোমাদের কি হয়েছে; তোমাদের চষা ধানে মই দেয়নি তো! আমি ওকে বলেছি তাই ঘুমিয়েছে! ওর আসন ঘটী গামছা কম্বল কিছুই নাই। তাই আমার খাটে শুতে বলেছি। যেই এই কথা বলা অমনি সবাই চুপ হয়ে গেল। বেদেরা হাতে ঔষধ নিয়ে সাপের সামনে মুঠো ঘুরালে সাপ একেবারে মাথা নীচু করে ফেলে। কোন গর্জ্জনই আর কোর্ত্তে পারে না, ঠিক তেমনিতর সবাই হয়ে'গেল। আমি জিতেছি ভেবে চোখের জল মুছে ফেললাম, বেশ একটু হাসিও এলো। যাক আর আমায় কেউ কিছু বলবে না। আমি খাট হতে নেমে বসলাম।

শ্রীলবাবাজী মহাশয় মালা হাতে নিয়ে জপ কোর্ত্তে বসলেন, আর মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এখন অগণিত ভক্ত এসে তাঁকে দণ্ডবৎ কোচ্ছেন, তাই ঘর থেকে বাইরে

এসে চেয়ারে বসলেন। তিনি তেল মাখবার সময় যে টুলে বসেন পাশে সেই টুলটি ছিল। আমি ঐ টুলটি তাঁর কাছে এনে বসলাম। কত কত ভক্ত আসছেন, বাবাজীমহাশয় এক এক বার তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,—কোত্থেকে এলে?

আমি বললাম,—প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আঙ্গিনায় ছিলাম অনেক দিন, ওখানে আর ভালো লাগলো না, তাই সুধন্য মিত্র মহাশয়ের কাছে কয়দিন ছিলাম, তাঁর কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা পেলাম। এই তিন বৎসর ধরে ঘুরছি। সেই সিঁথিতে দেখা হোলো, দাদা ধরে নিয়ে গেলেন; আবার কদিন পরেই পালিয়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। প্রভুর আঙ্গিনায়, গোয়ালচামট, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া শ্রীঅনুকুল ঠাকুরের ওখানে এই রকম কত স্থানে ঘুরেছি কিন্তু আপনাকে ভুলতে পারি কই! এমন সময় একজন এলেন,—শাড়ী-পরা, হাতে তুলসীর মালা বাঁধা. মাথায় একটু ঘোমটা টানা; অতি সুন্দর নূপুর রঞ্জিত চরণ, মুখ মণ্ডল লাল যেন গোলাপ ফুল, নাকে অতি সুন্দর নথ, কি সুন্দর নোলোক দুলছে; আমি দেখে ভাবছি,—ইনি আবার কে! যেই তিনি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের কাছে এলেন, অমনি শ্রীলবাবাজী মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন অগত্যা আমিও দণ্ডবৎ কোর্ত্তে যাচ্ছি অমনি তিনি কোলে টেনে নিয়ে বললেন,—বামুন যে! তিনি শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ ছেলেটি কে? তিনি বললেন,—"ব্রহ্মচারী ছেলে, জগদ্বন্ধুর আঙ্গিনা থেকে এসেছে, সুধন্য দাদা ঠিকানা দিয়েছেন। আমায় খুঁজছিল অনেকদিন ধরে, এইবার পাত্তা পেয়েছে। ময়না ওর নাম। ওদের দেশে তিন বৎসর আগে গেছলাম।" তিনি আদর করে মাথায় হাত দিয়ে বললেন,—তোমার বেশ ভাল চুলতো। তেল মাখনা বুঝি! আমি বললাম,—না; পরে জানলাম ইনি শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা, সখীবেশ ধারণ করে আছেন।

সখীমাও ঠাকুরের সেবার কাজে চলে গেলেন, শ্রীলবাবাজী মহাশয় আবার চেয়ারে বসলেন, আমিও আবার কাছে এসে বসলাম। অগণিত ভক্ত সব কোলকাতা থেকে আসছেন। জিজ্ঞাসা করলাম,—এত লোক কেন আসছেন। তিনি বল্লেন,—জান না, শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব-উৎসব হবে, কাল যে অধিবাস।

আমি বললাম, কোথায় শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়? তিনি বললেন, "দেখবে? চল আমার সঙ্গে। দে রে চাদরখানা দে তো" একজন ভক্ত চাদর দিলেন, বাবাজী মহাশয় চাদরখানা পিঠের দিক থেকে প্যাঁচ দিয়ে গলার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধলেন।

তাঁকে বড় সুন্দর দেখাতে লাগল! তিনি অমনি সিঁড়ি থেকে নামলেন, বললেন—"চল, দেখবে"! তিনি শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের মন্দিরের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলেন, আমিও পিছু পিছু যাচ্ছি। শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের সমাধির উপর একটি সুন্দর বড় চিত্রপট সেবা হোচ্ছেন; বললেন,—ঐ যে শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের সমাধি। তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন, আমিও করলাম; তার পরেই পেছনে এসে আর একটি সমাধি স্থানে দণ্ডবৎ করলেন, আমিও করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,—ইনি কে? বললেন,—শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের শ্রীগুরুদেবের সমাধি স্থান;—উভয় শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধি, পাশাপাশি; একদিন আগুপিছু ক'রে উভয় শ্রীবাবাজী মহারাজ দেহ রাখেন। এঁদের বিষয় সম্যক জানবার জন্য আমার কৌতূহল হোলো, কিন্তু তখন আর জিজ্ঞাসা করলাম না। পরে এক সময় জিজ্ঞাসা করব এই মনে করলাম বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা না করেও থাকতে পারলাম না। শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন, "আগে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় গঙ্গায় দাঁড়িয়ে এক জনার ব্যাধি নিজ শরীরে গ্রহণ করেন, তার পরই সেই ব্যাধিতে দু'চার দিন পরে বসে বসেই দেহ রাখেন। তাঁর শ্রীগুরুদেব বললেন,—"তাইতো! চরণ চলে গেল, আমিও থাকব না!" অমনি তিনি সমাধিস্থ হলেন, তার

একদিন পরে দেহ রাখলেন। তাই পাশাপাশি সমাধি! বুঝেছ তো; আমি বললাম,—হাঁ, বুঝেছি।

তারপর শ্রীলবাবাজী মহাশয় সখীমা'র বারান্দায় গেলেন এবং বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, আমিও তাঁর দেখাদেখি দণ্ডবৎ করলাম।—বললেন, এইটি আশ্রমের আদি ঘর, পরে সব বলব। তারপর যুগলকিশোর দর্শন করে বললেন,—চল মহাপ্রভুকে, হরিসভার গৌরকে দর্শন করে আসি। তখন তাঁর সঙ্গে ৮।১০ জন লোক পিছু নিয়েছে,—আমাকে কটুকাটব্যের জন্য শ্রীবাবাজী মহারাজ যাদের উপর দুঃখিত হয়েছিলেন তাদের দু'জনা সবার পেছনে আছে। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে চলেছি, আর ঐ দু'জনা সবার পেছনে বিমর্ষবদনে আসছে,—আমি আনন্দে বিমূঢ় হলাম। আমি একবার শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের পিছনে গিয়ে তাদের দিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ঠারে ঠোরে বললাম,—কিহে সাধুজী, কেমন! এই বলে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের ডান দিকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চলেছি—খুবজব্দ হয়েছে ওরা, শ্রীলবাবাজী মহাশয় আমার দিকে হয়ে ওদের শাসন করেছেন, বেশ একটু অহঙ্কার আবার মনে হয়েছে, তাই সুযোগ পেয়ে একবার বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিলাম। ছোট বেলায় ভয়ানক দুষ্টু ছিলাম। এখন ১৭ বৎসর বয়স, তবুও দুষ্টোমিটা যাইনি, তাই তাঁদের জব্দ করলাম বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। তারা একটু রোষ কষায়িত নয়ন দেখাল, আর কিছুই বলেনি। কারণ শ্রীলবাবাজী মহাশয় ভালবেসে আমায় আকাশে তুলে দিয়েছেন। তাই তারা চুপ হয়ে আছে।

যাক আস্তে আস্তে আমরা প্রথমেই শ্রীপোড়ামাতলায় গেলাম, মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে শ্রীহরি সভার গৌর দেখতে গেলাম। বাবাজী মহাশয় ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলেন, আমিও করলাম, তারপর ৭ বার পরিক্রমা করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছি।

ঐ গৌরসুন্দরের সেবাইত শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ গোস্বামী, শ্রীবাবাজী মহাশয় তাঁর পদে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর চরণামৃত পেয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থাপিত বিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দরের মন্দির অভিমুখে রওনা হোলেন, আমরাও পরমানন্দে তাঁর সঙ্গে চলেছি

তিনি এসেই প্রথমে মন্দিরের দরজায় দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন,—তারপর ধীরে ধীরে এসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সামনে দণ্ডবৎ করলেন,—দাঁড়িয়ে চোখের জলে ভাসছেন! থর থর অঙ্গ কাঁপছে!

আমি পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর এই সাত্ত্বিক ভাব দর্শন কচ্ছি আর নিজেকে কৃতার্থ বোধ কচ্ছি। তারপর তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে পরিক্রমা করে, দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন,—সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আমি তাঁর এই অভিনব প্রণাম-প্রণালী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—দণ্ডবৎ কর। আমি তাঁর আদেশে তাঁরই মতন ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করলাম এবং তাঁরই মত গড়াগড়ি দিয়ে উঠলাম। শ্রীবাবাজী মহাশয় আমার মুখপানে তাকিয়ে মৃদু হাসতে লাগলেন, বললেন,—"এই বুঝি প্রথম দণ্ডবৎ?" "পহিলহি রাগ" এই বলে বেশ মৃদু মন্দ হাসতে হাসতে শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী, সিদ্ধ মহাত্মার সমাধি আশ্রমে এসে পৌঁছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের কাছেই তাঁর সমাধি। দর্শন মাত্রই তিনি যেন ছিন্নমূল তরুর মত হয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পড়ে থেকে উঠে দাঁড়ালেন! চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। গোরা-গোরা-গোরা নাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ কোরছেন,—আর সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী, থর থর অঙ্গ কাঁপছে। ওষ্ঠাধরে দ্রুত কম্পন হোচ্ছে। আবার দেহটিও এমন দারুণ কম্পিত হচ্ছেন যে মনে হয় বুঝি বা পড়ে যাবেন। শ্রীনিতাই দাস বাবাজী ও শ্রীবসন্ত দাস বাবাজী মহাশয় তাঁর খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন, পাছে তিনি পড়ে যান এই ভয়ে তাঁরা আগলে রাখলেন। এক এক·

বার হুঙ্কার দিচ্ছেন আর গোরা গোরা ব'লে ক্রন্দন কোচ্ছেন, আমি তাঁর এই অভিনব ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রায় ২০ মিনিট কাল এমনি ভাবে থেকে ভাব সম্বরণ করলেন; তিনি প্রকৃতিস্থ হলে ওখানকার একজন সেবাইত বাবাজী মহাশয় শ্রীচরণামৃত দিলেন, তিনি পান করে আবার সেই শ্রীসিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি আশ্রমের সামনে একটা কুটিরে এলেন; একজন অতি বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তথায় ছিলেন, তিনি তাঁকে দণ্ডবৎ করে তাঁর কাছেই বসলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজ তাঁকে খুব স্নেহ ভরে কথা বলতে লাগলেন।

আমরা সবাই শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের দেখাদেখি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি করে তাঁর কাছে বসলাম। আবার স্নেহাপ্লুত নয়নে শ্রীলবাবাজী মহারাজ আমার দিকে তাকালেন, সাহস পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এই যে সমাধিতে দণ্ডবৎ করলেন, ইঁনি কে? কি নাম ইঁহার? তিনি সহাস্য বদনে বলছি বলেই বলতে আরম্ভ করলেন,— "ইঁহাকে এই শ্রীনবদ্বীপ ধামে সবাই সিদ্ধ পুরুষ বলেন। ইঁনি একনিষ্ঠ শ্রীগৌর ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গই ছিল তাঁর জীবনের সর্ব্বস্ব। শ্রীগৌরাঙ্গ নাম-রূপ-গুণ-লীলা ভজন ছাড়া তাঁর আর যেন কিছুই ছিল না। এরূপ একনিষ্ঠ শ্রীগৌর ভক্ত জগতে দুর্লভ। নাম শ্রীসিদ্ধ চৈতন্যদাস। এঁর মতন আর একজন দেখেছিলাম শ্রীবৃন্দাবনে,— শ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহাশয়। সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয় একখানা খাতায় রোজ—গোরা-গোরা,—নাম লিখতেন।"

"এখনও সে-খাতাখানা বরাহনগর পাঠ বাড়ীতে আছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গে গোরা গোরা নাম সর্ব্বদাই লেখা থাকত। সর্ব্বদা নদীয়া-নাগরী ভাবে বিভাবিত থাকতেন। পুরুষ অভিমান তাঁর মোটেই ছিল না। এক এক দিন শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাম দিকে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে কত প্রীতির কথা বলতেন। তাঁর চরিত্র অতুলনীয়। এমন কি দুর্জ্জেয়ও

বলা যায়। আমি তাঁকে দর্শন করেছি, তাঁর জীবনের একটা অপূর্ব্ব কাহিনী তোমাদের বলছি।”

“কি উন্নত ভাব, কিন্তু সে ভাব ক-টি লোকে বোঝে। সেই ভাবের জন্য তাঁকে মারও খেতে হয়েছে। শোনো, বলছি—সর্ব্বদা মহাপ্রভুর ধ্যানে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসী ভাবে সর্ব্বদা মগ্ন থাকতেন। নদীয়া লীলা ছাড়া কোন স্মরণ মননই যেন তাঁর ছিল না। একদিন শ্রীমহাপ্রভুর চিন্তা করতে করতে তিনি বিভাবিত হয়ে পড়েছেন। নিজের পুরুষ অভিমান চলে গেছে। যেন নিজে নদে নাগরী হয়েছেন, ঢুলে ঢুলে গৌর গরবে গরবিনী হয়ে চলছেন। বাম পদ আগে চলেছে। মাথায় একটু কাপড় টেনে দিয়েছেন, হেলে দুলে মা গঙ্গার দিকে চলেছেন। হঠাৎ সামনে একটি বধূ গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছে, তাকে দেখেই তার গলা জড়িয়ে ধরে বলছেন,—গৌর সুন্দরকে গঙ্গার তীরে দেখেছ বুঝি? তাই এ-আনন্দে গরব করে চলেছ! এই বলে বধূকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। ঐ বধূটি একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় গৃহস্থ নারী, তিনি ঐ বাবাজীর এই ব্যবহার দেখে হতভম্ব ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন।”

“পাশে সব নদেবাসী পুরুষরা আসছিলেন, তারা বাবাজীর এই ব্যবহার দেখে তাঁকে ধরে ফেললেন এবং বেশ উত্তমমধ্যম প্রহার দিলেন;—চড়টা, ঘুষিটা শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হতে লাগল,—বেটা বদমায়েস, দিনের বেলায় গঙ্গার ধারে, মেয়ে মানুষের গলা জড়িয়ে ধরে প্রেম দেখাচ্ছে! তাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে এবং প্রহারের চোটে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন এবং নিজের এই প্রকার ব্যবহার হয়েছে বুঝে একটু লজ্জিত হয়েও পড়লেন, তারপর তিনি ধীরে ধীরে গঙ্গা অভিমুখে স্নান করতে চলে গেলেন। বধূটী গিয়ে বাড়ীতে বলল; তার বাবা শুনবামাত্র ছুটে এলেন এবং গঙ্গার ধারে শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরে ক্ষমা চাইলেন; এবং

বললেন,—মেয়েটি আপনাকে চেনে না। আহা! ঐ সব পাষণ্ডি লোকে আপনাকে প্রহার করেছে! এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয় আদ্যোপান্ত সব বললেন। নদেবাসী সবাই একথা জানলেন।

হায়রে কলিকাল! এত বড় একটা মহৎ ভাবের আদরও কেউ বোঝেনা। তাঁকে এই জন্য প্রহার খেতে হোলো! ঠিক এমনিতর একটা মধুর লীলা শ্রীবৃন্দাবনে হয়েছিল আমার মনে পড়ছে; বলছি, শোনো। এই বলে তিনি বলতে লাগলেন।

শ্রীলবাবাজী মহাশয় বলছেন,—শ্রীবৃন্দাবনে একজন খুব নৈষ্ঠিক ও প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর ভিতর প্রায় সময়ই শ্রীবলরামের আবেশ হত। তিনি শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে রোজ আসতেন এবং অনেক সময় দণ্ডবৎ প্রণতি না করেই শ্রীগোবিন্দজীর সামনে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন তিনি সকালে শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করতে এসেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন কোচ্ছেন। নিজের ভিতর বলরামের আবেশ এসেছে,—কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবে, আমার ছোট ভাই সে, কংসের চরেরা যদি কোন বিপদে ফেলে বা তার কোন ক্ষতি করে তাই আমি দাদা-বলাই, পায়ের ধূলা নিয়ে গিয়ে মাথায় মেখে দিয়ে আসি,—এই আবেশ তাঁর হৃদয়কে বিহ্বল ক'রে তুলেছে! আর থাকতে পারলেন না। অমনি ছুটে গিয়ে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ক'রে একটী চরণ উঠিয়ে বললেন,—"লে কানাইয়া মেরে পায়ের ধূলা লেলে।" পূজারীরা এই অভিনব ব্যাপার দেখে তাঁকে ধরে বেঁধে মন্দিরের আঙ্গিনায় এনে খুব প্রহার করলেন। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখো! গোবিন্দজীর সামনে পা উঠিয়ে ধরেছে, বেটা ভণ্ড বাবাজী। ভাব না কলা, আমরা এতদিন সেবা করছি আমাদের ভাব হোলনা, ঐ বৈরাগী বেটার এত ভাব হোলো। বেশ দু'ঘা খেলো, বেশ কয়দিন মনে থাকবে। এই বলে সবাই হাসতে

লাগলেন। শ্রীবাবাজী মহাশয়েরও ভাবের নেশা কাটল কোন কথাই না বলে নীরবে নিজ কুটীরে ফিরে গেলেন। প্রহারে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয়েছে। আমায় পরদিন দেখতে পেয়ে ডেকে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বললেন, আমি কেঁদে ফেললাম। হায়রে এমন উন্নত অবস্থা উহার, এত বড় ভাবেরও আদর হোলো না। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় এই কথা শেষ করে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে উঠে বললেন,—চল, শ্রীনিতাই বাড়ী। নিতাইকে চেন তুমি? পতিত পাবন নিতাই, যে মার খেয়ে প্রেম দেয় তাঁকে দেখবে চল!

শ্রীল বাবাজী মহারাজ চলেছেন; আমারও নিতাই চাঁদকে দেখবার তীব্র বাসনা জাগল; আমরাও শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দর্শনে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গেই বেশী কথা বলছেন, তাই আমার আনন্দও আর ধরে না। এই এতটুকু সময়ের মধ্যে শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী আমরা ৩০।৪০ জন হয়ে পড়েছি। অনেক ত্যাগী বৈষ্ণবও এসেছেন, আবার গৃহী বাবু ভক্তও আছেন, শ্রীনিতাই চাঁদের দরজায় এসে পৌঁছিলাম আর বাবাজী মহাশয় অমনি দরজায় দণ্ডবৎ ক'রে আস্তে আস্তে নিতাই চাঁদ দর্শন কোত্তে যাচ্ছেন। তখনও দর্শন হয়নি,—শ্রীঅঙ্গ থর থর করে কাঁপছে, এই বুঝি টলে পড়েন, তাই শ্রীবসন্তদাস বাবাজী মহাশয় ও নিতাইদাস বাবাজী মহাশয় তাঁকে আগলে রেখে সাবধানে চলছেন। যেই তাঁর শ্রীনিতাই চাঁদ দর্শন হোলো, অমনি একটী হুঙ্কার দিলেন, সমস্ত শরীর পুলকাবৃত হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। নিতাই চাঁদকে দেখে এবার যেন খুব বেশী বিহ্বল হয়ে পড়লেন, এইরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে অশ্রু কম্প পুলকে বিভূষিত হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর স্থির হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। পূজারী চরণামৃত দিলেন, তিনি পেলেন আমরাও পেলাম, প্রভুর সেবার জন্য পূজারীকে একটী টাকা দিতে তিনি পারিষদকে বললেন।

শ্রীবাবাজী মহাশয় দর্শনে এসেছেন! তাই তিনি শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে হরিসভার গৌরের ওখানে পোড়ামার ওখানে প্রণামী এক এক টাকা দিতে বলেছেন। কেহ যদিও ভেট চাইল না তবুও তিনি দিলেন। তিনি খালি হাতে কখনও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতেন না, এটা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম। গৃহস্থ ভক্তেরা যারা সঙ্গে ছিলেন তারা সবাই ভেট দিয়ে দর্শন করলেন। এইরূপ ভাবে দর্শন করতে করতে আমরা ফিরে এলাম তখন প্রায় ৭টা ৮টা হবে।

আরতি হোচ্ছে, ঠাকুরের বৈঠক খানার গাদীতে আরতি হোল তারপর তিনি শ্রীগৌরহরি দাস মহান্তজীর সমাধি স্থানে আরতি দর্শন করে নামের সঙ্গে আস্তে আস্তে এলেন, মহান্ত মহারাজের সামনে আরতি ও নাম কীর্ত্তন প্রায় আধ ঘণ্টা হোলো, তারপর শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের আরতি হতে লাগল। শ্রীবাবাজী মহাশয় তাঁর সামনে এসেই খুব বিহ্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। আরতি দেখতে দেখতে ব্যাকুল প্রাণে নাম ধরলেন নিজেই,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" খুব টেনে নাম ধরেছেন মধুর কণ্ঠ, কণ্ঠের তেজ কি! যেন গগন মণ্ডল ফেটে যাবার উপক্রম! শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাম ধরেছেন, চারিদিক থেকে নামের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, থর থর করে কাঁপছেন আর ব্যাকুল প্রাণে নাম করছেন। সবাই তাঁর দোয়ারকি কচ্ছেন, হঠাৎ কীর্ত্তন ধরলেন,—"পাগলের প্রাণারাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।" নিজে দু'হাত তুলে নাচতে লাগলেন, পারিষদরাও নাচতে লাগলেন; আমিও নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। কতক্ষণ যে কীর্ত্তন হোলো তারপর কি হোলো—আমি কিছুই জানিনা। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা কাঞ্চন হয়ে যায় শুনেছি, আমিও আজ শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সান্নিধ্য পেয়ে কেমনতর যেন হয়ে পড়লাম! তারপর যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম শ্রীলবাবাজী মহাশয় মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন আর হাসছেন, আর একজন

আমার মাথায় বাতাস কচ্ছেন। আমি অপ্রতিভের মত উঠে বসলাম, শ্রীবাবাজী মহাশয় হেসে আমার দিকে তাকালেন, আমিও তাকালাম; —বললেন,"১টা বেজে গেছে, তোমাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। ছটাকে মাতাল কোথাকার। চল, প্রসাদ পাবে।" আমি আর কাল বিলম্ব না করে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ঘরে গেলাম, তাঁর কাছেই পাতায় প্রসাদ দিয়ে বললেন—"দেখ্ তো কত রাত হয়ে গেছে! খুব কীর্ত্তন জমেছিল, খুব নাচছিলে, কাপড় চোপড় ঠিক ছিল না, ভাগ্যি আমি ধরেছিলাম নইলে বারান্দা থেকে পড়ে একেবারে মাথাটা ফেটে যেত।" অপ্রস্তুতের মত মাথা নীচু ক'রে কত অপরাধীর মত বসে বসে প্রসাদ পেলাম। শ্রীবাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়া হল, আমি প্রসাদ পেয়ে হাত ধুয়ে তাঁর কাছে আসতে লজ্জিত হলাম, এত দীর্ঘ সময়ে কি হয়েছিল কিছুই স্মরণ নাই, চোখে জল আসছে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছি। অমনি ডাকলেন,— "ময়না! ও ঘুম আসছে বুঝি?" তাঁর এই স্নেহভরা ডাক শুনে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি হেসে বললেন,— "যাও ঐ আমার খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়।" আমি তখনই শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কথামত তাঁর খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, আর অমনি নিদ্রা দেবী আমায় কবলিত ক'রে ফেললো। এই সময় হতে শ্রীবাবাজী মহাশয় আমায় কখনও ব্রহ্মচারী আবার কখন আদর করে—ময়না—বলতেন,—এমনই এক অপূর্ব্ব স্নেহ তিনি আমার উপর বর্ষণ কোর্ত্তে লাগলেন।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম শ্রীবাবাজী মহাশয় আমার পাশে ঘুমিয়ে আছেন! আমি যেই শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে এই অবস্থায় দেখলাম আর অমনি তিনি উঠে বসে,—"জয় নিতাই জয় নিতাই—বললেন। নীচে মেঘলাল দাদা শুয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে লোমবস্ত্র নিয়ে শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পায়খানা বাড়ী গেলেন, এই সময় মেঘলাল দাদা শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সেবা করতেন; জমিদারী,

ব্যবসা, স্ত্রী ও পুত্র, সব ছেড়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গলাভ ক'রে তাঁর সেবায় জীবন ধন্য করছেন। তাঁর বাড়ী ছিল টাঙ্গাইল সাবডিভিসনে। তাঁর শ্রীগুরুনিষ্ঠা অপূর্ব্ব ছিল।

শ্রীবাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে এলেন, আমিও তাড়াতাড়ি গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু একটু অন্ধকারে তখন শৌচাদি সেরে স্নান ক'রে চলে এলাম। শ্রীবাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথায় শৌচাদি করলে ?" আমি কহিলাম,—গঙ্গার ধারে। —"জল কোথায় পেলে ?" বললাম,—একটা মাটির ভাঁড় কূয়োর ধারে ছিল তাই নিয়েছি। অমনি শ্রীবাবাজী মহাশয় হেসে হেসে বলতে লাগলেন,—"সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়।" সবাই হেসে উঠল, আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কারণ আমি তখন মাত্র সতেরো বছরে পড়েছি, ও কথার মানে কিছুই বুঝিলাম না, পরে বুঝেছি। মেঘলাল দাদা ও উপেনদাদা কাছেই ছিলেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"ওকে একখানা কম্বল, একটা লোটা আর একখানা গামছা কিনে দেবে।" তাঁরা বললেন,—বেশতো একটু পরেই কিনে আনব। আমার তখন লোটা কম্বল কিছুই ছিল না, যেখানে সেখানে মাটিতে ঘুমোতুম. কেউ ডেকে খেতে দিলে খেতুম ; এমনি করেই জীবন কাটছিল কিন্তু শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কাছে এসে অবধি একেবারে সব উল্টে গেল। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু তিনি যেন একাধারে আমার হয়েছেন, এতে আমার আর আনন্দ ধরে না, আমার যেন একাধারে সব তিনিই, এতে আমার কত আনন্দ, আমি যেন একেবারে দিশে হারা হয়ে পড়ছি। ভাবছি, এত ভালবাসা সইবে কি আমার !

একটু পরেই শ্রীবাবাজী মহাশয় ডাকলেন,—"ব্রহ্মচারী এসো" আমি চকিতের মত কাছে এসে দাঁড়ালাম। "চল, শ্রীবাস আঙ্গিনায়," এই বলে তিনি সমাজ বাড়ী পরিক্রমা করলেন। তারপর শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন, পরে শ্রীমহান্ত গৌরহরি

দাস মহারাজকে ও শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়কে পরিক্রমা করলেন, কাছে খুব বড় একটা আম গাছ ছিল, তার ছায়ায় শ্রীসখীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে গেটের দিকে রওনা হোলেন। শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটে অনেক ঠাকুর আছেন,— শ্রীজগন্নাথ, নিতাই, গৌর, আরও কত ঠাকুর; তাঁদের দণ্ডবৎ করলেন; তারপর মা গঙ্গাকে দণ্ডবৎ ক'রে পিছন ফিরে রওনা হোলেন। আমি তাঁর পেছনেই আছি, আরো অনেক জন ভক্ত আছেন। সবাই তাঁর সঙ্গে চলেছি।

শ্রীবাস আঙ্গিনার দরজায় এসে তিনি দণ্ডবৎ করলেন তারপর ভিতরে ঢুকলেন; দেখলাম,— দুই গোস্বামী সন্তান, অতি সুন্দর চেহারা,— তাঁদের চরণে দণ্ডবৎ করলেন! দেখাদেখি আমিও করলাম। গোঁসাইজীর নাম শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামী, তিনি শ্রীবাবাজী মহাশয়কে—দাদা—বলেই সম্বোধন করলেন! বললেন,—রামদা' আজ বুঝি অধিবাস কীর্ত্তন হবে, মঠ সাজান দেখলাম। তিনি বললেন,—হাঁ। তারপর গোঁসাইজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,— "এ ছেলেটি কে? ব্রাহ্মণ বুঝি, কবে এসেছে?"—"এই দু'দিন," এই কথা বলতে বলতেই ভিতরে ঢুকলেন। অপূর্ব্ব অভিরাম শ্রীগৌরসুন্দর বিগ্রহ দেখতে লাগলেন। কত দেবদেবীর মূর্ত্তি ঐ মন্দিরে! আমি বললাম,—এত দেবদেবী কেন শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে? বললেন,—"ভগবান শ্রীগৌর সুন্দর এই নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই সব দেবদেবী তাঁকে করজোড়ে স্তুতি করছেন। এই শ্রীবাস আঙ্গিনায় শ্রীমহাপ্রভু নৃত্য করেছেন! কত লীলা তাঁর এখানে।"—এই বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন। উঠে চরণামৃত পেলেন, আমরাও নিলাম।

তারপর শ্রীনবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামীর সমাজে এসেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতে লাগলেন,—চোখ দিয়ে দরদর অশ্রু পড়ছে শরীর মৃদুমন্দ কাঁপছে, আর আস্তে আস্তে বলছেন,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দ'' : অনেকবার এই মধুর নাম করলেন তারপর সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে দণ্ডবৎ করলেন ও আস্তে আস্তে চোখ মুছে বের হোলেন। আমিও ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করে সঙ্গে চললাম, ভাবলুম,- "একজন মানুষের মূর্ত্তি দেখে এত ভক্তি করলেন কেন! ইনিতো দেখি একজন গেরস্থ লোক, শ্রীলবাবাজী মহাশয় এতবড় সাধু, তবুও ওঁকে দেখে কাঁদলেন; গোঁসাইদের দণ্ডবৎ করলেন! অথচ ওঁরা গেরস্থ লোক!" কেন এমন ভক্তি কোচ্ছেন জানবার জন্য কৌতূহল হোলো। কারণ গোস্বামী কা-কে ব'লে আমি জানি না। আমরা কুলীন বামুনের ছেলে, গোসাইদের এত ভক্তি করতে হয় জানি না; তাই মনে কৌতূহল এসেছে; অমনি শ্রীবাবাজী মহাশয় আমার ভাব বুঝতে পেরে বলছেন,—"এঁরা সব শ্রীনিত্যানন্দ সন্তান। এঁদের কাছেই নিতাই চাঁদ ভক্তির ভাণ্ডার রেখেছেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সন্তানদেরও গোস্বামী সন্তান বলে। এঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুকুট মণি, এঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি করলে ভক্তি লাভ হয়।"

"আর ঐ যে দেখলে শ্রীনবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামীর সমাজ,— উনি ছিলেন পরম ভাগবৎ, ভক্তিশাস্ত্রে ঐ রকম জ্ঞান তখন কম লোকেরই ছিল। এঁদের শ্রীবিগ্রহ সেবার পরিপাটি কত। সবাই মহাপ্রভুর সেবা ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ ছাড়া কিছুই খান না। তোমাদের দেশের মত মৎস্য মাংস খান না। শ্রীনবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামী আমায় খুব স্নেহ করতেন। বৈষ্ণব সেবাই এঁদের প্রাণ। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে এঁরা সমস্ত বৈষ্ণবকে বাড়ীতে এনে প্রসাদ দেন। এঁদের বৈষ্ণব সেবার তুলনা নাই। শ্রীনবদ্বীপ চাঁদ গোস্বামীর শ্রীমহাপ্রভুর ও তাঁর পারিষদদের উপর এমনই অপার ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল যে তাহা বলার নয়। তাঁদের অগণিত শিষ্য ও ভক্ত, নিতাই চাঁদের মতন এঁরাও পতিত পাবন। এঁর সঙ্গে যে-কেউ দেখা করতে এলে আগে তাকে বলতে হবে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দ।" এই নাম উচ্চারণ করলে তবেই তিনি দেখা দেবেন বা সে নিজে গিয়ে দেখা করবে,—নাম উচ্চারণ না করলে কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, এমনই নিষ্ঠা তাঁর। আমি তাঁর দুর্লভ সঙ্গ পেয়েছিলাম!"

এই সব বলতে বলতে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে গেলেন, বড় সুন্দর নাট মন্দির, মারবেল পাথরের আঙ্গিনা! সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সোনার গৌরকে দণ্ডবৎ করলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আমায় বললেন,—"ঐ দেখ সোনার গৌর।" বড় সুন্দর মুর্ত্তি, চকচক করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"সবই সোনা দিয়ে তৈয়ারী বুঝি! তাই চক্ চক্ করছে। তিনি বললেন,—'মহাপ্রভুর রূপ জান? —গলিত কাঞ্চনের মত ঝিকি মিকি করে। শোন কুসুমের মত বর্ণ। সে রূপের তুলনা হয় না। কেউ সে-রূপ বর্ণনা ক'রে ওর পায় নি, পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদও লজ্জিত হয়ে যায়, এমন তাঁর রূপ।" এইসব বলতে বলতে দণ্ডবৎ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন, তারপর রাস্তায় এসে বললেন,—"চল, ভজন কুটীর দর্শন করে আসি। এখান থেকে অনেকটা দূর।" তাঁর সঙ্গে সবাই আমরা চলেছি। রাস্তায় যে কেহ শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে দেখছে সেই দণ্ডবৎ প্রণতি কোচ্ছে,—সবাইকে দেখছি প্রীতি-ভক্তি-যুক্ত চিত্ত। আমি ভাবছি,— "এ সাধুকে এত লোকে ভক্তি ক'রে অথচ ইঁনি একজন সহজ, সরল মানুষের মতন, কেউ —ঐ-যে রামদা!—বলে ছুটে এসে দণ্ডবৎ করছে, আবার কেউ তাঁহাকে শ্রীগুরুর মত শ্রদ্ধা ক'রে একেবারে রাস্তায় সাষ্টাঙ্গও পড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা কলসী কাঁখে গঙ্গা স্নানে চলেছে, শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে দেখেই হেসে বলছে,— "ঐ-যে! বাবাজী মহাশয় যাচ্ছেন।"

আবার ভাবছি,—'একটা মানুষের এমন আকর্ষণীয় স্বরূপও তো কই কোথাও দেখিনি,—রাস্তায় চলছেন, মৃদুমন্দ মিষ্টি হাসি সদা মুখে

লেগেই আছে। মানুষটি কি কোন সম্মোহন জানেন? কই তাতো দেখছি না! তিনি একেবারে অতি সাদাসিদে, লাবণ্যময় অহৈতুক স্বরূপ,—ভক্তি-প্রেমের মূর্ত্ত বিগ্রহ।

তাঁর কোন ঘোর পেঁচ নেই। বড় সাধু বলে কোন দেমাকও দেখছি না! নইলে আমার মত একটা ছেলের সঙ্গে এত ভালবাসা কি ক'রে করেন! এইরূপ কত কি ভাবতে ভাবতে তাঁর সঙ্গে চলছি; শেষে আমার মন এই কথাটীতে এসে শান্ত হলো। সে কথাটি এই ঃ তাঁহার অন্তঃকরণ আপামর জনসাধারণের প্রতি প্রেমে সদা উদ্বেলিত; তিনি প্রীতি ও ভালবাসার আধার! এ-ছাড়া তাঁকে আর কিছুই তখন মনে করতে পারিনি। আরোও ভাবলাম,— ইনি আমার বড় প্রিয় বন্ধু, এঁকে ছেড়ে থাকব না। শ্রীলবাবাজী মহাশয় নদের পথে, হেলে দুলে চলেছেন; মাথায় একখানা গামছা রয়েছে.—মাথা ঢাকা, চাদরখানা বেড় দিয়ে পরা। পেছন থেকে দেখলে মনে হয় যেন কে একজন নটন রঙ্গে চলেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পেছনে তাকান, আবার মৃদুমন্দ হাসেন! চলে যাচ্ছেন,—ঠিক যেন খঞ্জন পাখীর মতন চলা। কি মধুর চলন তাঁর, দেখতে আবার ইচ্ছে হয় সেই মধুর চলন ভঙ্গি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সে মধুর নটন ভঙ্গী আর কি দেখতে পাবো! বিধাতা বুঝি আমাদের হৃদয়ে শেল হেনে দিয়েছেন!

যাক, তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই ভজন কুটীরে গিয়ে হাজির হোলাম; প্রথমেই তিনি ভজন কুটীরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন। ভজন কুটীরবাসী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ ছুটে আসলেন, সবাই যথাযোগ্য দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীলবাবাজী মহাশয় অতঃপর সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাজ দর্শন করে, পরিক্রমা করে দণ্ডবৎ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে করলাম। সমাজের সামনে বসে আমাদের বলতে লাগলেন,—"আমাদের গুরুপরম্পরা গাদি এখানে।" মঠের

বৈঠক খানায়, যে মহাপুরুষের চিত্রপট দেখেছ তাঁরই সমাজ এখানে। আমি তখন এসব কথা কিছুই বুঝিনা,—যে কথা স্মরণ হোচ্ছে লিখে যাচ্ছি। তারপর শ্রীচরণামৃত পেয়ে আস্তে আস্তে তাঁর সঙ্গে রওনা হোলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"ঐ-যে প্রাচীন মায়াপুর রামচন্দ্রপুরের চড়া! ঐখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, গঙ্গা গর্ভে লীন হয়ে গেছেন। শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় স্থান নির্দ্দিষ্ট করেছেন, তাঁর প্রমাণ অকাট্য কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির অনেক নীচে চড়ার তলে চলে গেছেন। মন্দিরের চূড়ার কিছু অংশ অনেকেই দেখেছেন, এখনও তাঁরা জীবিত আছেন।"

শ্রীপাদ বললেন,—"মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ এখন ঐ মহাপ্রভুর মন্দিরে রয়েছেন। ঐ-যে দর্শন ক'রে এলে! ঐ মন্দিরের কাছে একটা পুরানো মন্দির আছে, ওতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু থাকতেন, এখন আবার ঐ নূতন মন্দির হয়েছে, ওতেই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন।" শ্রীলবাবাজী মহাশয় বলছেন,—"ঐ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থাপিত। সন্ন্যাসের পর একবার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপ ধামে ফিরে আসেন তখন খড়ম রেখে যান। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঐ খড়ম পূজা করেন, এখনও ঐ পাদুকার মন্দিরে সেবা হয়।" আমি বললাম, "কই! সেই পাদুকা আমায় দেখালেন না তো!" শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন, "ও পাদুকা সব সময় সবাইকে দেখান হয় না। পরে দেখবে।"

এইরূপ ভাবে তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামের কথা বলতে বলতে গঙ্গার তীর দিয়ে আসতে লাগলেন। শ্রীনবদ্বীপ ধামে গঙ্গার তীরে, একজন সিদ্ধ বাবাজী মশায় থাকেন ছইয়ের ভিতর, তিনি দূর থেকে তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে বললেন;— "শ্রীবংশীদাস বাবাজী ওতে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিতাইচাঁদের সঙ্গে ওঁর খুব প্রেম। তাঁদের সঙ্গে আপন মনে কত কথা বলেন।" আমি বললাম, "বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলেন!" শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন,—"হাঁ, বলেন। তাঁর মুখের কাছে তামাক তিনি ধরেন—

খাও বলেন। একদিন তিনি গৌরের জন্য ফুল তুলতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে যান, পা ভেঙ্গে যায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনি হেঁটে এসে মহাপ্রভুর উপর ও শ্রীনিতাই চাঁদের উপর খুব রাগ করলেন। তার পর বলতে লাগলেন,—'তোদের জন্য ফুল তুলতে গেলাম, আর তোরা করলি কি!—আমার পা ভেঙ্গে দিলি! তোদের আমি গলায় দড়ি দিয়ে কুয়োয় নামিয়ে দেবো।' যেমনি বলা ঠিক তেমনি কাজ করলেন। তিনি তাঁদের গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে কুয়োতে নামিয়ে দিলেন। আবার একটু পরেই তাঁদের উপরে উঠিয়ে এনে তিনি বুকে করে কাঁদতে লাগলেন। এমনি তাঁর ভাব! তিনি ডাল চাল আলু বেগুন সব এক সঙ্গে রেঁধেছেন, তাঁদের সামনে রেখেছেন, ভাত নিজেও খাচ্ছেন আবার বলছেন,—'খা-না. তাড়াতাড়ি খা, নইলে আমি সব খেয়ে ফেলবো!' হুকোয় তিনি তামাক টানছেন বসে, আর অমনি উঠে বলছেন 'তামাক খেতে সাধ হয়েছে তোদের, খা-না। এ কড়া তামাক খেতে পারবি?' এমনি তাঁর ভাব। মহতের ক্রিয়া মুদ্রা কেউ বোঝে না। এই জন্য আমি কোন সাধু দেখতে যাই না। দূর থেকে দণ্ডবৎ করি, কি জানি কি দেখতে কি দেখে ফেলবো।" এইরূপ কত কথা বলতে বলতে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটে এলেন। রাস্তায় উঠে একেবারে সমাজ বাড়ী ডান দিকে রেখে শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি শ্রীনৃসিংহ দেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন, পাশে যে ক-টি সমাজ ছিল তা দর্শন করলেন। তারপর তিনি বললেন,—"এই স্থানটি শ্রীভাগবৎ দাস মহান্তের। তিনিই প্রভুর সেবাইত। ঐ দেখ, তিনি বসে তামাক সেবা করছেন; খুব বৃদ্ধ জরাতুর অবস্থা। ভাল করে দেখতেও পান না, সবাইকে চিনতেও পারেন না",—এই কথা ব'লে শ্রীপাদ বাবাজী

মহাশয় তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ ক'রে সমাজ বাড়ীতে ফিরে এলেন, বেলা ১১টা হবে। এসেই তিনি তেল মাখতে বসলেন। উপেনদা', মেঘলাল দা', ফণীকাকা, ও নন্দ কাকা আছেন, জানকীও আছে,—জানকী আমার মত একটী ছেলে। আবার শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয়ও এলেন। এই রকম আর কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব এলেন। মেঘলাল দা' ও উপেন দা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তেল মাখাচ্ছেন। আমাদের দিকে শ্রীপাদ তাকিয়ে বলছেন,—"বৈষ্ণবের বাহ্য বেশ-ব্যবহার দেখতে নেই। এই দেখ, শ্রীভাগবৎ দাস মহান্ত গৃহস্থের মতন, কিন্তু শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় তাঁকে গুরুর মতন দেখতেন। তাঁর কাছেই তিনি প্রথম আসেন এবং তাঁরই উপদেশে ও কৃপায় শ্রীগৌরহরি দাস মহান্ত বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ পান ও তাঁর কাছেই বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীরাজেন বাবু একদিন খুব ব্যাকুল হয়ে শ্রীভাগবৎ দাস মহান্তকে বললেন,—আমি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করব, আমার মায়া বন্ধন কেটে যাবে; কার কাছে যাবো বলে দিন। তিনি বললেন,—সেবাশ্রমে শ্রীগৌরহরি দাস মহান্ত আছেন, তাঁর সঙ্গ লাভ করুন, তাঁর কাছ থেকে বেশ আশ্রয় করবেন।"

"শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় তখন শ্রীধামে রাজেন বাবু বলে পরিচিত, তাঁর তখন সন্ন্যাস হয় নি, সংসার ত্যাগ ক'রে চলে এসেছেন। ধাম দর্শন ক'রে বেড়ান আর ঐ শ্রীভাগবৎ দাস মহান্তজীর কাছে থাকেন। তারপর তিনি তাঁরই আদেশে শ্রীগৌরহরি দাস মহান্তজীর চরণ আশ্রয় করেন।"

"প্রথম দর্শনে তাঁর অস্বাভাবিক কার্য্য দেখে রাজেন বাবু একটু পরিহাস করেছিলেন; তিনি তাঁকে দর্শন করতে এসে দেখেন,—শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয় একটী নিড়েন নিয়ে শাকের খেত নিড়োচ্ছেন। শ্রীরাজেন বাবু তাঁকে এ-কার্য্যে লিপ্ত দেখে ঠাট্টা ক'রে বললেন,—"কি বাবাজী মহাশয়, বাবাজী হয়ে

এখনও শাকের ক্ষেত নিড়োনোর বাসনা গেলনা !" তিনি এই কথা শুনে একবার তাকিয়েই আবার নিড়োতে লাগলেন। শ্রীরাজেন বাবু বললেন,—কি বাবাজী মহাশয় উত্তর দিচ্ছেন না যে! তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,—বাবা! তোমরা বাবু ভায়া লোক, কিইবা বলব! তুমি একবার চিন্তা করে দেখো কার জন্যে করছি; এসব আমার জন্য আমি কিছুই করি না, সবই ঠাকুরের জন্য।"

"শ্রীরাজেন বাবু শ্লেষ করে বললেন,—সবাই ঐ রকমই বলে! এই কথা বলে শ্রীরাজেন বাবু রওনা হলেন, পথে এসে ভাবলেন— "আমি তো ভীষণ অপরাধ করে ফেললাম, একজন প্রাচীন বৈষ্ণবকে দেখে কটাক্ষ ও কটূক্তি ক'রে অপরাধী হয়ে ফিরে এলাম, সত্যিইতো উনি শাক নিড়োচ্ছেন নিজের জন্য তো নয়, ঐ শাক বড় হলে তিনি ঠাকুরের ভোগ দেবেন ও সাধু বৈষ্ণব অতিথিকে খাওয়াবেন, তাঁর তো স্ত্রী পুত্র কেহই নাই, তিনি একা, অনন্য, হায়! এরূপ বৈষ্ণব মহাপুরুষকে আমি কটূক্তি ও বিদ্রূপ করলাম! যাক মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লে আবার ঐ মাটী ধরেই উঠতে হয়; যখন আমি কটূক্তি করে তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছি, তখন তাঁকেই গুরুত্বে বরণ করব এবং তাঁর কাছ থেকেই ভাগবত পরমহংস বেশ গ্রহণ করব।"

"আমি আজই তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ব, সমস্ত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করব, বৈষ্ণব তিনি নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করে আশ্রয় দেবেন,—এই ভাবে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল আর তিনি থাকতে পারলেন না, হৃদয় অনুতাপে দগ্ধীভূত হতে লাগল। ছুটে এসে শ্রীরাজেন বাবু তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে রাজেন বাবু বললেন,—"আমি মহা অপরাধী, আপনার নিকট দোষ করেছি, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে, আমার সংসার বন্ধন মোচন ক'রে দিন এবং আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিন।" শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয় তাঁর এই

আর্ত্তি দেখে তাঁকে উঠিয়ে বুকে তুলে নিলেন এবং সজল নয়নে বুকে সাপটে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন।”

“পরদিন শ্রীরাজেনবাবুকে তিনি ডোর কৌপীন পরিয়ে বৈষ্ণব পরমহংস বেশ দান করলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন,—শ্রীরাধা রমণচরণ দাস। রাজেনবাবু এখন হলেন শ্রীশ্রীরাধা রমণচরণ দাস! সেইদিন হোতেই তিনি ঐ-নামে পরিচিত হোতে লাগলেন। দীন কাঙ্গাল হয়ে তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, ভিক্ষা ক’রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে চাল ডাল সব এনে দেন। ভিক্ষার পদ্ধতি হোচ্ছে নাম করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলে যাবেন! কারও কাছে কিছু চাইতে পারবেন না। অযাচিত ভাবে যে যাহা দিবেন তাহাই ঝোলায় লয়ে চলে আসতে হবে। তখন তিনি সর্ব্বদা কীর্ত্তনানন্দে শ্রীধামের শ্রীবিগ্রহ সব দর্শন করেন ও নিত্য সেবাশ্রমে মহোৎসব ও কীর্ত্তন করেন। আনন্দে তাঁর দিনগুলো কাটতে লাগল।”

“শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয় তাঁর অপূর্ব্ব শ্রীগুরুনিষ্ঠা ও ভজন দেখে মুগ্ধ হোলেন এবং শিষ্যের উপর অফুরন্ত বাৎসল্য প্রেমে দিনগুলো কাটাতে লাগলেন। তারপর শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজ কলিকাতা, পুরী, কটক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করে বেড়ান। এই সময় থেকেই তাঁকে সবাই শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় বলতেন। অনেক দিন পরে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় পুরী ও কটক হতে কলিকাতা হয়ে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করতে আসেন, তখন তিনি প্রথমেই শ্রীভাগবত দাস মহান্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ক’রে, তবে শ্রীগুরু গৌরহরিদাস মহান্তকে দর্শন করতে গেলেন।”

“সবাই বলছেন,—একি ব্যাপার! তিনি শ্রীগুরুকে আগে দণ্ডবৎ না করে, আগে তাঁর কাছে না গিয়ে, শ্রীভাগবত দাস মহান্তকে দর্শন কোর্ত্তে গেলেন, উনিতো একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁর উপর

এত শ্রদ্ধা। আর শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহারাজ একজন বিরক্ত বৈষ্ণব; শ্রীনবদ্বীপ ধাম তাঁর মহিমা-মুখরিত; তাঁকে ফেলে তিনি ওঁকে আগে দণ্ডবৎ করতে গেলেন! এইরূপ সব কথাবার্ত্তা হোচ্ছে; অমনি শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় বললেন,—তাঁর শ্রীচরণই আমি ধামে এসে প্রথম দেখি, তিনিই প্রথমে আমায় থাকতে জায়গা দেন, তিনিই আমাকে শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় লাভ করতে বলেন, তাই তাঁকে আগে দণ্ডবৎ করলাম। কি কৃতজ্ঞতা শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের, কি গুণগ্রাহী তিনি। গুরু বলে কত শ্রদ্ধা করতেন।" এইরূপ কত কথা বলতে বলতে শ্রীবাবাজী মহাশয় গঙ্গা স্নান করতে গেলেন, আমরাও দু' চারজন তাঁর সঙ্গে চললাম। গামছা খানা হাতে নিয়ে তিনি চললেন। একজনা তাঁর ছাতা হাতে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটে এসে গামছাখানা মাথায় দিলেন। মৃদুমন্দ গতিতে হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলেছেন গঙ্গা স্নানে, মা গঙ্গায় চড়া পড়ে গেছে, অনেক দূরে মা গঙ্গা। তাই তিনি হেলে দুলে যাচ্ছেন, হাসি লেগেই আছে। এমন সময় আমি দেখতে পেলাম, ৪।৫টি স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নান ক'রে কাঁকে গঙ্গাজল-ভরা মেটে কলসী নিয়ে আসছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখা মাত্রই তাঁরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন,—"ঐ-যে বাবাজী মহাশয়!" বাবাজী মহাশয় পাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসলেন।

তারপর আমরা গঙ্গার কূলে এসে পৌঁছিলাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় মা গঙ্গাকে দণ্ডবৎ ক'রে জল নিয়ে মাথায় দিলেন। আমি কেবল ভাবছি,—শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের মত আকর্ষী স্বরূপতো কোথায়ও দেখি নাই! তিনি গঙ্গার তীরে এসেছেন, অসংখ্য নারী পুরুষ স্নান করছেন; সবাই বলাবলি করছেন,—"ঐ-যে বাবাজী মহাশয়।" সবাই অনিমিখ নয়নে তাকিয়ে তাঁকে

দেখছে! আমিও তাকিয়ে দেখছি যে চারিদিকে সবার দৃষ্টিই শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের মুখ পানে! আমি এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে তাঁর সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিলাম। শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয় গামছা দিয়ে জল মাথার উপর দিতে লাগলেন তারপর একডুব দিয়ে উঠলেন। জলে দাঁড়িয়ে তিনি—গৌরহরি বোল—দিতে লাগলেন। তাঁর যে কি মধুর কোকিল কণ্ঠস্বর! সুরধুনীর দু'কুল হতে মনোরঞ্জক প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা সবাই আত্মভোলা হয়ে গেলাম; কারণ এমন ভাবে স্নান কোর্ত্তে কোর্ত্তে এমন মধুর হরিনাম কারও মুখে কখনও শুনি নাই। এইরূপ ভাবে গঙ্গা স্নান করে তিনি তীরে উঠলেন, বহির্ব্বাস বদলায়ে, নূতন ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পরলেন। মেঘলাল দা' তাঁর ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস ধুয়ে নিয়ে এলেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয় ওখান থেকে রওনা হলেন, আমরাও মহানন্দে তাঁর সঙ্গে চললাম। ধীর মন্থর গতিতে তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই চলেছি।

মঠে এসে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পেয়ে দণ্ডবৎ করে নিজ ভজন কুটীরে গিয়া আহ্নিক করতে বসলেন। আমিও একটু দূরে তাঁর ধারে বসে আহ্নিক-করা দেখতে লাগলাম;—কত কত ঠাকুরের প্রসাদী বস্ত্র! কত শিশিতে ও কৌটায় চরণামৃত, চরণ তুলসী! সামনে একখণ্ড ভেলভেটের কাপড়ের উপরে তিনি সব রাখতে লাগলেন। কত সাবধানে রাখছেন, কত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তিনি নিজ মস্তকে ঐঁ-সব স্পর্শ করাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কত কেঁপে কেঁপে উঠছেন। আমি ভাবছি,—সর্ব্বদাই তাঁর ভাব, যে-কোন ঠাকুর দেবতা দেখা মাত্রই তিনি কম্প, অশ্রু ও পুলকে বিভূষিত হয়ে পড়েন,—আবার তাঁর এমন বালকের মত সরল হাসি ও কথা! এই সব ভাবছি আর অমনি আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—"এই দেখ! শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদী বস্ত্র, এই দেখ! শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৌপীন।" আমি বললাম—"এঁ-টা

কি, ভেলভেট দিয়ে মোড়া?—একখণ্ড দড়ি বা কাপড় হবে বুঝি!" এইকথা বলতেই তিনি বললেন,—"এ কর্ত্তার ডোর কৌপীন! আমি বললাম,—"কর্ত্তা আবার কে আছেন আপনি ছাড়া।" শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয় বললেন,—"না-রে আমার শ্রীগুরুদেবই আমাদের কর্ত্তা এখানে। আমার শ্রীগুরুদেবের কৌপীন, আমি গলায় পরে আহ্নিক করি।" তাঁর কথা শুনে আমি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

এইরূপ ভাবে তাঁর আহ্নিকের সময় আমি ধারে বসে আছি। হাতে তিলক গুলে কপালে নাভিতে বক্ষে হস্তাদিতে কি সুন্দর তিলক তিনি ধারণ করলেন। তিলকের পাশে পাশে 'গোরা' ছাপ দিতে লাগলেন, আবার গোরা-ছাপ দিয়ে কণ্ঠে বাহুতে ও বক্ষে গোরানামের অলঙ্কারও পরলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"এ-বেশ-ভূষা-তিলক-ছাপ মনে মনে করলে কি হয় না। সবাই বাহিরে কেন করে?" একটুও রুষ্ট না হয়ে অমনি তিনি হেসে বললেন—"বাঃ! বলিহারি! তাহোলে খাওয়া, পরা, স্নান ইত্যাদি সবই তোমরা মনে মনে কর না কেন?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে নিজেই লজ্জিত হলাম, উত্তর আর খুঁজে পাচ্ছি না। তখন তিনি হেসে বললেন—"এই দেহটা একটা মন্দির, মন্দিরে ঠাকুর আসবেন তাই আগের থেকে সাজাতে হয়! মন্দির সুন্দর না দেখলে তিনি আসবেন কেন? বাহির ও অন্তর সুন্দর ক'রে সাজাতে হবে তবে তো প্রভু আসবেন। সুন্দর বেশ না হোলে কাউকেও বাবু বলে কেউ চিনবে না। বেশেতেই সবার দেশ খুলে যায়। দেখ-না মাড়োয়ারীর বেশে মাড়োয়ারী মনে হয়। মেয়েদের সিঁথি সিন্দূর মণ্ডিত দেখলে সধবা, পতিভক্তি পরায়ণা বলে মনে হয়, পরণে সাদা কাপড় দেখলে বিধবা মনে হয়, হ্যাট কোট দেখলে সাহেব বলে মনে হয়, বড় বড় অফিসার বাবুরাও পরেন। চোকা চাপকান না পরে গেলে

জজবাবু হাইকোর্টের উকিল বা ব্যারিষ্টারকেও এজলাসে উঠতেই দেবেন না। তেমনি আমাদের এই বেশ প্রভুর দাস্তের বেশ। এই বেশ দেখলে তবে তিনি অঙ্গীকার করবেন। যাঁরা ভগবৎ প্রেমে আহার নিদ্রা ভুলে যান এমন কি নিজদেহও বিস্মৃত হন তাঁদের কোন বেশেরই অপেক্ষা থাকে না। যেমন শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী ন্যাংটো হয়ে চলেছেন কোন বেশই নাই।"

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলতে লাগলেন,—"দু'টি পথ আছে, একটা রাগের পথ আর একটা বিধির পথ। যেমন ছোট একটা লাউ হয়েছে। তার মুখে ফুল রয়েছে, মনে কর ফুলটি বিধি, আর লাউটি রাগ। যদি প্রথমেই ফুলটি কেটে ফেল তবে লাউ আর বাড়বেনা, শুকিয়ে পচে যাবে, লাউয়ের অস্তিত্বও দেখতে পাবে না; আবার ফুল না কেটে, রেখে দিলে লাউটি বেশ বেড়ে উঠবে এবং ফুলটি এমনিই পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি বিধির পথে ভক্তের চলতে চলতে রাগ হবে। প্রথমে কেউ বিধি লঙ্ঘন করলে ঐ রকম লাউয়ের মতন সে পচে যাবে, আর রাগ-ভক্তি হবে না তাই প্রথম বৈধী-ভক্তি যাজন চাই এই বৈধী-ভক্তি যাজন কোর্ত্তে কোর্ত্তে ভক্তের রাগ-ভক্তি আসতে পারে! প্রেম দুর্ল্ভ, রাগ-ভক্তি সুদুর্ল্ভ,—কেবল শ্রীগুরু কৃপায় হয়। রাগ-ভক্তি ব্রজবাসীদের, এ-কি সবার হয়! যদি কারও লালসা হয় ঐ ব্রজবাসীদের মতন, যদি শ্রীগুরু বৈষ্ণব অযাচিত করুণা করেন তবে হবে, বুঝতে পারলে?" এইরূপ তিনি কথা বার্ত্তা বলতে বলতে নীরব হলেন। সব চরণামৃত শিশিতে ছিল, তিনি পেলেন, গলায় প্রসাদী বস্ত্র ধারণ করলেন, তারপর আহ্নিক কোর্ত্তে কোর্ত্তে চোখ বুজলেন।

আমি ভাবছি,—এখন কি করি, বসে বসে তাঁকে দেখবো না চলে যাবো, কই কিছুই তো তিনি বললেন না। অমনি একজন বললেন,—ব্রহ্মচারী, শীগ্গির বেরিয়ে এস, শ্রীল বাবাজী

মহাশয় আহ্নিক করবেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তার এই বিরক্তি সূচক কথা শুনে বললেন, "না, ও যাবে না, এখানে থাকবে।"

এখন তিনি চুপ করলেন তাঁর কথা শুনে। আমিও নীরবে আপন মনে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আহ্নিক করছেন আর অমনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন, তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। এক-একবার শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয় এমন হুঙ্কার দিতে লাগলেন যে আমি ভীত হয়ে পড়ছি। এইরূপ ভাবে তাঁর প্রায় দু' ঘণ্টা কাটল। তারপর চোখ মুখ মুছে তিনি প্রসাদী মালা, পট্ট ডুরি প্রভৃতি সব মস্তকে স্পর্শ করাইয়া ঝোলায় ভরলেন। আর অমনি মধ্যাহ্ন আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, তিনি দর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, আর সেবক এসে চাদরটি হাতে দিল, ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নে যুগল আরতি দর্শন করতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম। তখনও তাঁর ভাব যায় নি, দর্শন করছেন আর কেঁপে কেঁপে উঠছেন। সাত্ত্বিক ভাব প্রায় সময়েই তাঁর শ্রীঅঙ্গে দেখতাম। শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গ পেয়ে ও তাঁর স্নেহ ধারায় সিক্ত হয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি! আর মা ভাই ও আত্মীয় স্বজনের কথা যেন ভুলেই গেছি। তার পর প্রসাদ পাবার পালা পড়ল, সবাই প্রসাদ পেতে বসে গেলেন।

শ্রীলবাবাজী মহাশয়ও ঘুরে ঘুরে সবার প্রসাদ পাওয়া দেখে নিজের কুটীরে এসে আমাকে ডাকলেন,—"এস! প্রসাদ পেয়ে নেও।" আমি বললাম—"সবাই পঙ্গতে বসল, আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে বসি।" তিনি বললেন—"না, আমার কাছে বস, কেউ তোমায় কিছু বলে বসবে!" তখন আমার গলায় একটি ছোট রুদ্রাক্ষ মালা ও একটী তুলসীর মালা ঝুলান ছিল,—বামুনাই তখন খুব! মাথায় চুল, গলায় পৈতা, পরিধানে ছোট একটি কাপড়,—তখন নিজেই ঐ বেশ পরেছিলাম। এই সমস্ত কারণে বোধ

হয় শ্রীলবাবাজী মহাশয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে বসতে দিলেন না। আবার ভাবছি,—ব্রাহ্মণ আমি, আমি সবার সঙ্গে বসবো কেন? আর শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের মত অত স্নেহে কেহই প্রসাদ দেবে না নিশ্চয়ই, তখন আমিই বা যাবো কেন! এইসব ভাবতে ভাবতে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের পাশেই প্রসাদ পেতে বসলাম। প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল, শ্রীলবাবাজী মহাশয় বিশ্রাম কোর্ত্তে খাটে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর ঘরের বারান্দায় এসে বসলাম। এমন সময় শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয় আমার কাছে এসে খুব স্নেহ বশে কত কথা বলতে লাগলেন, এই দেখে মঠের অনেক সাধু বৈষ্ণব এসে আমাব কাছে বসলেন। বহুদিনের কথা, তবুও অনেকের নামই মনে আছে। শ্রীবসন্ত দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীনিতাই দাস বাবাজী মহাশয়, বিজয় চাটুয্যে মশায়, প্রিয়নাথ দাস, নরোত্তম দাস, কিঙ্কর দাস, বড় রমণ দাস, ছোট রমণ দাস, উপেন দাস, মদন দাস, ভগবান দাস প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ তখন বাবাজী মহারাজের কাছে থাকেন। বিহারী দাস বাবাজী মহাশয় আমায় সবার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। সবাই আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, "কোথা থেকে এলে, কি নাম তোমার" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে লাগলেন, আমি যথাযথ উত্তর দিতে লাগলাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় স্নেহ করেন। তাই তাঁরা প্রীতির ব্যবহার করলেন।

শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীশান্তিরাম দাস নামে তিনজন বৈষ্ণব আমার কাছে এসে হাত ধরে খুব প্রীতির ব্যবহার কোর্ত্তে লাগলেন। এঁরা তিনজনা শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য। আমার জন্মভূমি মাগুরার কাছে মদনপুর বলে একটা জায়গা আছে সেইখানে তাঁদের বাড়ী ছিল, এখন তাঁরা বৈষ্ণব হয়েছেন, ভেক গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশে জন্মস্থান ছিল। তাই দেশের লোক দেখে চিনলেন। আমার কাকা শ্রীপূর্ণচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় খুব বড় খ্যাতি সম্পন্ন উকিল, তাঁর তখন ঐ মাগুরায় খুব প্রভাব। তাঁরা তাঁকে চেনেন। আমি তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে, আমার দাদাদেরও তাঁরা চিনেন বলে আমায় খুব প্রীতি কোল্লেন। তারপর আমি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে সাধু সেজেছি, এটা তাদের ঠিক ভাল লাগছিল না; তাঁরা বল্লেন,—এত ছোটবেলায় মাত্র ১৭ বৎসর বয়স তোমার, কেন সংসার ছেড়ে এলে। আমি বললাম,—"আমি এমনতরই হয়ে পড়লাম। গৃহে থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিলনা। একবার ১২ বছর বয়সে সাধু সেজে আমি ঘর থেকে পালিয়ে যাই। আমি পথে পথে ঠাকুরের নাম করে বেড়াতাম। কখন কেউ ডেকে খেতে দিত, আবার কখন জুটতোও না। ক্ষুধার জ্বালায় মাঠের মটর কলাই সিম ইত্যাদি খেতাম, রাস্তার ধারের কুল খেয়েও জীবন যাপন কোর্ত্তাম। এই রকমে মাস খানেক আমার কেটে গেল; কেঁদে কেঁদে আমি ঠাকুরের নাম করে বেড়াতাম। বাড়ীর সব আমায় খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে খুঁজে আমায় ধরে নিয়ে এল। খুব মার খেলাম। তারপর আবার পড়াশুনা কোর্ত্তে লাগলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি এমনিতর হয়ে গেছি। তারপর আবার আমি ৬ মাস পরে পালিয়ে যাই, আবার আমাকে সবাই ধরে নিয়ে আসেন, আবার পড়াশুনা আরম্ভ করলাম! এইবার শেষবার ১৫ বৎসর বয়সেই আমি বাড়ী থেকে একেবারে বেরিয়ে পড়েছি। আর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করিনা। স্কুলে পড়বার সময়, যখন আমার বয়স ১৩ বৎসর, তখন শ্রীবাবাজী মহাশয়কে দেখি। সেই থেকেই তাঁর কথা ভুলতে পারিনি; তাই এতদিন পরে খুঁজে খুঁজে তাঁকে পেয়েছি, আর আমি তাঁকে ছাড়বনা।" এই বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। কান্নার শব্দ শুনে শ্রীবাবাজী মহাশয় বাহিরে এসে আমার এই অবস্থা দেখে সব বুঝে ফেললেন। আমি তাঁকে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়লাম,

অমনি শ্রীবাবাজী মহাশয়—ময়না পাখী—বলে হেসে ফেললেন, আমিও হেসে ফেললাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় ঘরে চলে গেলেন।

দুপুর কেটে গেল, বিকেল বেলা আসল, আর গেটের ধারে অনেক ঘোড়ার গাড়ী এসে থামল। কলকাতা থেকে বহুলোক এসেছেন, আজ নবরাত্র নামযজ্ঞের অধিবাস হবে, তাই সব আসছেন; এই কথা সবার মুখে শুনলাম। শ্রীলবাবাজী মহাশয় মালা জপ কোর্ত্তে কোর্ত্তে বাহিরে চেয়ারে বসলেন, আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, এমন সময় বহুলোক এসে শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণতি কোর্ত্তে লাগলেন। কত লোক এসেছে! প্রায় ১০।১২ খানা ঘোড়াগাড়ীতে লোক এসেছে। আমি মনে মনে ভাবছি,—"এত আকিঞ্চন একটী মানুষকে দেখবার জন্য, কি আকর্ষণ!"

সবাই পোটলা পুটলী নামিয়ে ছুটে ছুটে এসে, কেউ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কোচ্ছে, কেউ অনিমিষ নয়নে তাঁকে দেখছে আর তাদের চোখের জল পড়ছে। কত লোক যে এল তার সংখ্যা নেই। আমি কাউকেই চিনি না। তিন চারজন ভক্তের কথা বেশ মনে আছে। একজনা শ্রীবাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করেই, খুব হাস্য পরিহাস কোর্ত্তে লাগলেন। কত হাসি ঠাট্টা শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে করছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই লোকটীর সখ্য প্রীতি দেখে। সেই সময়ের, একজনের বেশ একটি হাসির কথা মনে পড়ল। শুনলাম এঁর নাম চারুদা, খুব রসিক ভক্ত, এমন নাকি কেউ নেই। খুব ভালবাসেন শ্রীবাবাজী মহাশয়কে, তাঁর সঙ্গে সখ্য প্রীতিতে মসগুল হয়ে থাকেন; তিনিই বলছেন হেসে,—"দিনতো কেটে যাচ্ছে চাকরী ক'রে, আত্মীয় স্বজন সেবা ক'রে,—কেবল পচামাল ঘাঁটছি! কবে আপনার এই ঝোলাটার মধ্যে বসতে পাবো! আপনার হাতে ঝুলবো! কেমন দেখাবে?" শ্রীবাবাজী মহাশয় হেসে বলছেন,—"ঝোলায় কি করে যাবে চারু?" চারুদা' বললেন—"কেন! একটা যা-কিছু হয়ে থাকব

ওস্তে, তা হোলেই তো মিটে গেল। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের ঝোলার মধ্যে থাকার ভাগ্য চাই! আমি আপনার ঝোলায় যা-কিছু হয়ে আপনার হাতে থাকব সে সৌভাগ্য কি আর এ জীবনে হবে?" এই সব হাস্ত পরিহাস শুনে শ্রীবাবাজী মহাশয় ও তাঁর ভক্তেরা সবাই খুব হাসতে লাগলেন। চারুদার কাছেই দেখলাম, একজন সুন্দর সুঠাম বলবান পুরুষ, লাল আভাযুক্ত চেহারা, ব্রাহ্মণ দেহ, গলায় পৈতা, একটা চাদর গায়, কি সুন্দর মাসকুলার দেহ, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, আবার একজনা দেখলাম তিনিও হাস্য পরিহাস করছেন; শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কাছে নাম শুনলাম—"যুগল।" তিনিও চারুদার মতন এই রকম শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সখ্য প্রীতি করছেন, যুগলদা'কে আমি চিনে ফেলেছি। কলুটোলায় শীলেদের বাড়ীতে আমি যখন শ্রীবাবাজী মহাশয়কে দেখতে যাই, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। পাশেই তাঁর সোনা রূপার দোকান ছিল। একদিন তাঁর দোকানে বসেছিলাম। তাঁর কপালে ও সর্ব্বাঙ্গে তিলক দেখে বুঝেছিলাম, ইনি একজন গৃহী ভক্ত, আমায় খুব প্রীতি করে কথা বলেছিলেন; তাই তাঁকে ভুলিনি। ঐ সুন্দর ব্রাহ্মণটির নাম শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য চারুদার দেশে বাড়ী, চালড়ীপোতা তাঁদের বাসস্থান; এঁরা তুইজনাই শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের নাকি খুব প্রিয়। যুগলদা', চারুদা' ও বলাইদা' এঁরা শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে থাকবেনই, এঁরা না হলে নাকি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের ভাল লাগেনা। সব অফিসার লোক, অফিসের পরেই বাড়ী না গিয়ে ছুটে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের কাছে আসেন, তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তন নর্ত্তন করেন। তাঁরা রাত্রিতে তাঁর কাছেই থাকেন আবার সকালে স্নান ক'রে কোন রকমে প্রসাদ পেয়ে আবার আফিসে চলে যান।

আমি এদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, সুন্দর মুখমণ্ডল, হাসিভরা মুখ! আবার শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের আনন্দে

উপরের সারিতে (বাম হইতে দক্ষিণে) ঃ—শ্রীনিমাই চরণ দাস, পাগলদা', বিশ্বম্ভরদা', (বরাহনগর প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ম্মীবৃন্দ) সর্বশ্রী রাখাল চন্দ্র দেব, জগদীশ নন্দী, বলরাম নন্দী, নির্মল মুখোপাধ্যায়, শিশির মৈত্র; হরিসাধনদা', ত্রিলোচন, বাদল, বিপিন। মধ্যের সারিতে—জীবনদা', শ্রীল বাবাজী মহারাজ, যুগলদা' ও পণ্ডিত মহাশয়। নীচের সারিতে—

এঁরা বেশ নস্য টানছেন। নস্যির ডিবা দেখেই শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন,—ও চারু, একটু দাওতো দেখি। অমনি চারুদা' ডিবে খুলে সামনে ধরলেন। শ্রীবাবাজী মহাশয় হেসে নস্য একটু নিলেন। চারুদা'ও হাসতে হাসতে বলছেন—আমাদের মাথায় ঠুলি, মাথা সর্ব্বদাই ঢাকা থাকে। আপনার কাছে এলেই ঢাকনি খুলে যায়। আপনার সঙ্গই এই রকম ঢাকনি খুলে দেয় আমাদের। আমাদের জাতি মান ইজ্জৎ আর থাকেনা—এমন লোকের পাল্লায় পড়েছি! খুব হাসির হুল্লোড় উঠতে লাগল, সবাই হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

তারপর সবাইকে শ্রীবাবাজী মহাশয় বললেন,—হাত মুখ ধুয়ে থাকবার জায়গা ঠিক করে নেও। পোটলা পুটলী নিয়ে তাঁরা থাকার জায়গা ঠিক করতে গেল। এমন সময় শান্তিরাম দাস বাবাজী ও কালাকৃষ্ণ দাস বাবাজী এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। দু'জনা-কেই চিনে ফেললাম। এঁরা সব অনেক দিনের বাবাজী, আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন এঁরা সব কীর্ত্তন কোত্তে আসেন,—এক বাড়ীতে মালসা ভোগ দিয়ে, আমায় এঁরা নিমন্ত্রণ করে মালসা ভোগের প্রসাদ ও ছানা-চিনি-প্রসাদ খুব করে খাইয়ে ছিলেন। তাই তাঁদের দেখে খুব আনন্দ হোল, শ্রীবৈষ্ণবের কৃপাই মানব জীবনের একমাত্র সম্বল। কোন রকমে যদি বৈষ্ণবসঙ্গ হয়, তবে সেইটিই তার মাহেন্দ্রক্ষণ। বৈষ্ণবের কৃপা না হোলে কিছুই হয়না। তাঁরা হেসে বললেন—"যেদিন থেকে তোমায় দেখেছি তখনই তোমাকে আমাদের কাছে পেতে ইচ্ছে হতো,' আর তুমি আমাদের মতই হও এই কামনা করেছিলাম। ঠিক তুমি এসে পড়েছ।" এই কথা শুনে, তাঁদের আমি দণ্ডবৎ প্রণতি করলাম। এমন সময় অদ্বৈত দাস বাবাজী, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গুরুভাই হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বললেন,—"কিহে ময়না, আমাদের কাছে এসে পড়েছো! মাগুরায় স্কুলে যখন পড়তে তখন আমি,

বলেছিলাম, কথাটা মনে আছে। সংসার ছেড়ে আসবেই তুমি, এই কথা বলেছিলাম।" আমি আজ্ঞে বলে তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম তিনি টুকুমণি বলে মুখ ধরে আদর করলেন।

তারপর দেখলাম অনেক মেয়েরা এসে শ্রীলবাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করছে। আমার দুই তিন জনার কথা মনে আছে। তালতলা থেকে হরিমতি দিদি ও চাংড়ীপোতা থেকে দিদিমণি এসেছেন। তারা শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের চরণে এসে দণ্ডবৎ করেই উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছেন,—কেমন আছেন? শ্রীবাবাজী মহাশয় মৃদু হেসে বলছেন—"ঠাকুরের কৃপা ভালই রেখেছেন।" এইরূপ প্রীতিযুক্ত হাস্যে কথা বলছেন, তারাও হাসছে সব কথা শুনে। আমি ভাবছি,—কি পুরুষ কি নারী, সবার সঙ্গেই কেমন একটা সখ্য প্রীতি, এঁর আপন পর কেউ নাই বুঝি! যাকে দেখেন তিনি, সেই যেন তাঁর কত আপন জন। বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ নারী যে এঁকে দেখে সেই মসগুল হয়ে যায়। কত মেয়েরা এসে তাঁকে প্রণাম দণ্ডবৎ করছে। শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের সেবার জন্য কত রূপার থালা, গ্লাস তারা এনেছে। শ্রীলবাবাজী মহাশয় বসে আহ্নিক করবার জন্য সুন্দর সুন্দর আসন এনেছেন তারা। তারা বড় বড় দোপাট্টা চাদর বহির্ব্বাস, ভাল ভাল সাদা গামছা এনেছেন। কত ফল, মিষ্টি শ্রীপাদের কাছে রেখে তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। উর্ম্মিলা নাম করে একটি মেয়ে সুন্দর চাল, ভাল ভাল আচার এনে রেখেছে। শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের জন্য সুন্দর একটি ভেলভেটের পাদুকাও এনেছে। এই সমস্ত বস্তু দেখে হাসতে হাসতে আমার দিকে তিনি তাকিয়ে বলছেন—"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।"

"ময়না, দেখতে পাচ্ছ! ছোট বেলা থেকে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন ডাল, ভাত তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে স্কুলে যেতাম, যদি ভাজা একটু পেতাম

তবে ধন্য হোয়ে যেতাম। যদি আমার জ্বর হত তবে জ্বর ছাড়লে একবেলা রুটি দিত। আমি একটা জামা আর দু'খানা কাপড় পরতাম, শীতের সময় একটা গেঞ্জি পরতাম, আর দেখছ, আজকাল আমি ঠাকুরের নাম একটু করি, দোহাই দেই, তাই কত জুটছে! সাধুর বেশ পরেছি তাই কত আসছে জিনিষ। যদি ঠিক ঠিক আমি নাম করতাম, যদি প্রভুকে সত্যিই ভালবাসতুম তাহলে কিনা হোতো! যাক এগুলো সব দিদির কাছে নিয়ে যাও, ঠাকুরের সেবায় লাগবে। সামান্য কিছু চাদর বহির্ব্বাস রেখে দাও।" তাঁরা সব অনিচ্ছার সঙ্গে ও-সমস্ত জিনিষ সখীমার কাছে দিয়ে এলেন। আমি ভাবছি,—ইনি এতবড় মহাপুরুষ, কতলোক এঁকে মানে, আর ইনি অনায়াসেই নিজেকে তুচ্ছ ক'রে কথা কইছেন। এতটুকু অহঙ্কার নাই, আমি এই সব বসে বসে ভাবছি সেখানে।

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাদা মহাশয় এলেন, তারপর মধুজেঠা ও শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ শাস্ত্রী এলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁদের খুব শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দণ্ডবৎ ক'রে আসনে বসতে বললেন। শ্রীপাদ শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন, মুখখানা ধরে কত প্রীতিযুক্ত হয়ে কথা বললেন এবং দু'জনাই চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন। তারপর শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর আসনে বসলেন, শ্রীলবাবাজী মহাশয়ও সবারই কাছে হাঁটুগাড়া দিয়ে বসলেন, এই রকম তাঁর কত প্রীতির ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলাম। তারপর দেখছি সবাই কত সিধে সাজিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীধামের সব ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীলবাবাজী মহাশয় এই সব দেখতে বললেন। সখীমা শ্রীধামের ঠাকুরদের জন্য কাপড় ও বাল্যভোগ সাজিয়ে এক এক জনার মাথায় দিয়ে দিলেন। তারা সব নাম কীর্ত্তন করতে করতে রওনা হোলেন। চারিদিকেই

দেখছি যেন আনন্দের ফোয়ারা বইছে। কানাই দা, নিতাই শ্রীগোবর্দ্ধন কাকা, সখীমার সঙ্গে এই সব কাজে যোগ দিয়েছেন। সর্ব্বদাই তারা সখীমার কাছে কাছে ঘুরছেন, কত লোক আসছে তাঁরা সবার সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন কাকা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গুরুভাই। তিনি শ্রীরাধারমণের ও মহান্ত শ্রীগৌর হরি মহারাজের সমাধি সেবা করেন। আমি তাঁকে গিয়ে দণ্ডবৎ করলাম, তিনি খুব প্রীতিযুক্ত হয়ে আলিঙ্গন করলেন। এই রকম ভাবে সবারই স্নেহ ধারায় সিঞ্চিত হতে লাগলাম। ভাবছি ভাগ্য আমার খুব ভাল, নইলে এখানে এসে এদের সঙ্গ পাবো কেন? আমি ভাবছি শ্রীবাবাজী মহাশয় যখন আমায় ভাল বেসেছেন তখন এর চাইতে আর শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কিই-বা আছে!

নাট মন্দিরে নব রাত্রির উৎসবের মঞ্চ সাজান হয়েছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আরতি আরম্ভ হল। শ্রীগোপীদাস বাবাজী ঘুরে ঘুরে আরতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। ঠাকুর দেবতার বড় বড় চিত্রপট দিয়ে মঞ্চ সাজান হয়েছে, কি সুন্দর সাজানর পরিপাটি! আমি শ্রীবাবাজী মহাশয়ের পেছনে থেকে সব দেখছি আর আত্ম-ভোলা হয়ে পড়েছি, এমনতর ঠাকুরের আরতি তো কখনও দেখিনি, এমন সুন্দর ঠাকুর সাজানও কোথায়ও দেখিনি। আমার কাছে সবই নূতন, বড়ই মধুর লাগছে। আরতি শেষ হোলো। লোকে লোকারণ্য সেই নাট মন্দির! তারপর শ্রীলবাবাজী মহাশয় বললেন,—"আসন পেতে কীর্ত্তনের যোগাড় কর।" বলার সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাট মন্দিরের নীচে এসে দাঁড়ালেন। কত কত লোক এসে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি করতে লাগল, তারপর তিনি শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় ও শ্রীল মহান্ত মহারাজের সমাধিতে দণ্ডবৎ ক'রে বৈঠক খানায় দণ্ডবৎ ক'রে আসলেন, আর চারিদিক থেকে—হরিবোল—ধ্বনিতে মুখরিত হতে

লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ডান দিকে, একটী সুন্দর গালিচা পাতা হল, তাতে ধামের শ্রীগোস্বামীবৃন্দ এসে বসলেন।

সবাইকে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দণ্ডবৎ করে কীর্ত্তনে বসলেন। হস্তে করতাল, দুধারে দু'জনা মৃদঙ্গ বাদক,—শ্রীহরেকৃষ্ট দাদা ও ভগবান দা বসলেন; শ্রীঅদ্বৈত কাকা, চারুদা', যুগলদা', বলাই দা' এই রকম কত লোক তার ডাইনে বামে পিছনে বসলেন। আরও অনেক লোক তাঁকে ঘিরে কীর্ত্তনে বসলেন।

মৃদঙ্গ করতাল নিয়ে সবাই নিস্তব্ধ হয়ে বসেছেন, এখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়—"শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল"—বলে করতাল দু'হাতে নিয়ে, মাথা নিচু ক'রে দণ্ডবৎ প্রণতি করতে লাগলেন। মৃদঙ্গ করতাল বাজতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কম্পিত হচ্ছেন। হস্তস্থিত করতাল থর থর করে কাঁপছে। সমস্ত দেহই কাঁপতে লাগল তাঁর, এক একবার স্মরণ করতে করতে যেন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়ছেন,—মনে হচ্ছে তিনি কাতর প্রাণে কত প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে, শ্রীগুরুদেবের কাছে করছেন। এইরূপ ভাবে দণ্ডবৎ ক'রে শ্রীপাদ আবার—"শ্রীগুরু প্রেমানন্দে গৌর হরি বোল"—বলে যেই "নিতাই গৌর"—বলতে বলতেই ভাবে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলেন, আকুল প্রাণে তিনি কেঁদে উঠলেন।

আমি ভাবছি, এত ব্যাকুল প্রাণে কাঁদার কারণ কি? অমনি মৃদুকণ্ঠে তিনি নিজের মনেই বলছেন,—"জয় রাধারমণ"—তখন বুঝলাম তাঁর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা মনে উ'ঠছে, তাঁর বিরহ এত ভীষণভাবে আবির্ভূ'ত হয়েছে, যে তিনি নিজেকে সামলাতেই পাচ্ছেন না। শ্রীগুরুতে তাঁর কি প্রীতি, শ্রীগুরুকে স্মরণ করে এমন ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে তো কখনও কাউকে দেখিনি। যেমন শিশু সন্তান মা'র জন্য ব্যাকুল প্রাণে কাঁদে, ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে,—তাই বা কি করে বলি; শ্রীগুরুবিরহের বেদনা এত মর্ম্মস্পর্শী যে তাঁকে একেবারে বিকল করে দিচ্ছে। আস্তে

আস্তে তাঁর ভাব শান্ত হল। আবার—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—বলে নাম ধরলেন। সমস্ত নাট মন্দির, আস পাশ কত অসংখ্য লোকে ভরে গেছে। চারিদিক হতে নামের ধ্বনি মুখরিত হতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর উদারা, মুদারা তারা ছাড়িয়ে চলেছে। তাঁর মুখে নামের লহর এমন চলেছে যে কয়েক মুর্ত্তি শ্রীগোস্বামী সন্তান, আরও কত বাবু. কত বাবাজী মহাশয় হঠাৎ দাঁড়িয়ে কি মধুর নৃত্যভঙ্গি করতে লাগলেন! সে যে কি মধুর নৃত্য তা বলে বুঝাতে পারব না। এইরূপ ভাবে শুধু—"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—প্রায় দেড়ঘণ্টা চলল, তারপর শ্রীলবাবাজী মহাশয়,—"জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচী নন্দন"—কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।

আর অশ্রু পুলক কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব এসে তাঁর দেহে আবির্ভূত হতে লাগল। ভাবকে তিনি এমনভাবে ধারণ করেন যে বলে বোঝান যায়না। মানুষের একটু ভাব হলেই সে দিশে হারা হয়ে যায়। কাপড় চোপড়ও ঠিক থাকেনা। আর ভাবছি তাঁর এত ভাবময় দেহ, এমন কম্প, অশ্রু, পুলক, তবুও তিনি সততই সামলিয়ে চলেন। একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন না। ভাবকে সামলাতে তাঁর মত এমন করে কাউকে তো দেখতে পাইনি। তাই মনে কত কি ভাবছি আর আমি তাঁর শ্রীমুখের পানে তাকিয়ে আছি। সর্ব্বদাই তিনি চোখের জলে ভাসছেন আর কীর্ত্তন করছেন।

শ্রীঅদ্বৈত কাকা তাঁর চোখের জল গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ কীর্ত্তনে একটী আঁখর তিনি দিলেন,—"গমন নটন লীলা, শচীমাতার নয়ন তারার গমন নটন লীলা" আরও কত কথা; এইরূপ—গমন নটন লীলা—কতবার গাইলেন তারপর "ভাগ্যবতী সুরধুনী কুল, পদাঙ্কিত ভূমি রে" যেই বলা আর একেবারে ব্যাকুল প্রাণে কেঁদে উঠলেন। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল,

শরীর এমন কম্পিত হচ্ছে, মস্তক এমন ভাবে ঘূর্ণিত হচ্ছে যে বলে বোঝান যায় না! তাঁর অজস্র চোখের, নাকের জল চারিদিকে সিঞ্চিত হচ্ছে। কত লোকের গায়ে গিয়ে পড়ছে। তারপর একটু স্থির হয়ে বসলেন বটে কিন্তু বুক-ফাটা কান্না আরম্ভ হল,—মৃদু-মৃদু ঠোঁট কাঁপছে, কি যেন বলছেন বোঝা যায়না; এইরূপ ভাবে তখন কীর্ত্তনের মাতন চলছে। প্রায় এক ঘণ্টা এই রকম মাতন হলো। আসে পাশে সমস্ত লোকই কাঁদছে দেখলাম, তারপর মাতন থামল, আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরলেন। রাত্রি প্রায় বারোটা অবধি কীর্ত্তন হল মঞ্চের কাছে বসে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অতি মধুর স্বরে টেনে নাম ধরলেন,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" আর অমনি অসংখ্য লোকের মুখ হতে এই মধুর নাম উচ্চারিত হতে লাগল। সমস্ত মন্দির যেন কীর্ত্তনের শব্দে ঝমঝম করে বেজে উঠল, আকাশ বাতাস কম্পিত হতে লাগল। সে যে কি নাম-কলরোল উত্থিত হল তা আমার লেখনী দ্বারা ভাষায় ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মঞ্চ ঘুরে ঘুরে নাম কচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ঘুরছি। তারপর আরম্ভ হল মাতন কীর্ত্তন,—"পাগলের প্রাণারাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে যেই নাচতে আরম্ভ করলেন আর অমনি সমস্ত লোক নাচতে লাগল, আমিও নাচতে নাচতে নিজেকে ভুলে গেছি, আর আমার কিছুই মনে নাই। তারপর যখন আমার জ্ঞান হ'ল তখন রাত্রি দুইটা, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কাছে বসে আছেন, সখীমার কোলে আমার মাথা রয়েছে,—শুয়ে পড়ে আছি। সখীমার কোলে আছি, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কাছে বসে আছেন—চোখ মেলে যেই দেখলাম, অমনি লজ্জিত হয়ে উঠে বসলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বললেন,—"ছটাকে মাতাল, নিশি হ'ল ভোর ডাকছে ভ্রমর"—বলতেই

সবাই হেসে উঠল আমিও হেসে উঠলাম। তারপর সখীমাকে দণ্ডবৎ করলাম। সখীমা বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—নব অনুরাগ কিনা তাই অমন হয়ে পড়েছে, বলেই তিনি চলে গেলেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ঘরে গেলাম। মঠের সবারই প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে। যে যার গৃহে চলে গেছে। অমন জঁাকাল মঠ, তখন লোকজন শূন্য। মেঘলাল দা', শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে প্রসাদ পেতে বসালেন, আমাকেও ডেকে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে পাতা দিয়ে বসিয়ে বললেন,—"তোমার জন্য এত রাত হয়ে গেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়া হয়নি। কেবল নাট মন্দিরে গড়াগড়ি দিচ্ছিলে, কাঁদছিলে, পাছে মঞ্চ হতে পড়ে যাও তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তোমাকে ধরে রেখেছিলেন, একেবারে দিশে হারা হয়ে গিয়েছিলে, কাপড় চোপড়ও ঠিক ছিলনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তোমাকে ছটাকে মাতাল বলেন, কথাটা খুব ঠিক। এমন বিহ্বল হলে চলে কি ?" আমি অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বঁসে রইলাম, আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে।

নিজে অনেক অন্যায় করে ফেলেছি বলে অনুতাপও আসছে আবার ভয়ও হোচ্ছে। প্রসাদ আর মুখে দিচ্ছি না অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নেহ ভরে ডাকলেন,—"ময়না, এই নেও ডাল পুরী প্রসাদ।" অমনি আমার সব দুঃখ ঘুচে গেল, হেসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে খেতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি শ্রীবাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেলেন, হাত মুখ ধুয়েই শুয়ে পড়লেন, আমায় কাছে ডাকলেন আমিও পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখি শ্রীলবাবাজী মহাশয় পাশে নাই। ভাবলাম,—ঐ-যে মঙ্গল আরতির ঘণ্টা বাজছে। বোধহয় দর্শন করতে গেছেন—এই ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। খানিক পরে শ্রীল

বাবাজী মহাশয় এসে হাত ধরে টেনে উঠালেন, আর শাসন বাক্য বললেন—"ব্রহ্মচারী! এত ঘুমোবে কেন?" কে তাঁর কথা শোনে; ঘুমের ঘোর কাটেনি,—আবার যেই শুয়ে পড়লাম তখন তিনি চুলের মুট ধরে উঠিয়ে বসালেন। আমি অগত্যা উঠলাম; হাত মুখ ধুতে চলে গেলাম। হঠাৎ একজন বলে ফেললেন,—শ্রীলবাবাজী মহাশয় ওকে যখন এত আদর করছেন তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হবে।

শ্রীলবাবাজী মহাশয় তাঁর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন,—"তোমার তাতে কি! তোমার তো কোন ক্ষতি করেনি। যদি কেউ প্রথম এলো, অমনি তুমি তার পোঁদে লাগবে। সে আমার স্নেহ ভালবাসা পাবেই, ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, ছোটবেলা ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছে—এই সব স্নেহ ভালবাসা না দিলে ওদের মঙ্গল হবে কি ক'রে! তুমিও দেখি আমার বিচার কর, এসব বলা ঠিক না!" তারা চুপ করে রইল আমি শুনতে শুনতে ওখান হতে চলে গেলাম! মনে মনে ভাবছি ও আমায় হিংসা করছে, কারণ শ্রীলবাবাজী মহাশয় অত্যধিক ভালবাসেন আমায়। মনে মনে ভাবছি ইহাই কি কারণ! তাতো নয়, তিনিতো সবাইকে ভালবাসেন। মুরতিমন্ত ভালবাসার স্বরূপইতো শ্রীলবাবাজী মহাশয়, তিনি কা-কে না ভালবাসেন! এই যে হাজার লোক ছুটে এসেছে ওঁর কাছে, কত সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরাও ছুটে এসেছে, একমাত্র ওঁরই প্রীতি-আকর্ষণে তো! তবে ও আমায় কেন যে এমন করে কথা বলে কিছুই বুঝি না! তারপর সব সাধুরা তিলক মালা পরা, আমি তিলক পরিনা, মালার কণ্ঠী পরিনা; তাই কি কারণ! ক-ই কত লোক তাঁর কাছে আসছে সবাইতো তিলক মালা পরেনা; তবুওতো তারা শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের ভালবাসার পাত্র বলে মনে হোচ্ছে। আমি সবার ছোট বলেই কি এমন ব্যবহার পাই! এমন সময় শ্রীফণি কাকা জানকীকে সঙ্গে করে শ্রীলবাবাজী

মহাশয়ের কাছে এলেন। আমাকে দেখেই—"কি-হে ব্রহ্মচারী শীলদের বাড়ীর কথা মনে আছে, তোমায় বাড়ী ফিরে যেতে বলি, পড়তে বলি, আর বুঝি যাওনি বেশতো ভালই হয়েছে। এই দেখ তোমার মতন আর একটি ছোট ছেলে জানকী সেবাশ্রমে থাকে আবার দাদার কাছেও আসে। বেশী সময় আমার কাছেই থাকে।"

এইরূপ ভাবে ফণি কাকা আমার সঙ্গে কথা বলছেন, ঠিক এমন সময় বসন্ত কাকা (পূর্ব্বে পুলিশ ইন্স্পেক্টর ছিলেন এখন শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের চরণাশ্রয় করে বাবাজী হয়েছেন,—সুন্দর লাগ্ন দেহ, খুব মোটাসোটা শরীর) আমার মাথায় ও গায়ে হাত দিয়ে খুব স্নেহ করতে লাগলেন। চুলে হাত দিয়ে বলছেন;— "বেশ চুলগুলো। এ-গুলো কেটে ফেলাই ভাল, চুলেতে বড় আকর্ষণ আসে মানুষের, মেয়েরাও আকৃষ্ট হয়।" আমি তাঁর কথা শুনে ভাবছি,—চুলতো সাধুরা রাখে, এ-তে কি দোষ হোলো! আমিতো মেয়েদের সঙ্গে মিশি না, কারণ মা আমায় বলেছিলেন,— মেয়েরা স্নেহ, যত্ন ক'রে, ও-টা মাতৃভাবের জন্য। মেয়েরা সবাই মা, আমার মা একদিন আমায় এ-কথা বলে দিয়েছিলেন তবে কেন এসব কথা বলছেন! এমন সময় আর এক বাবাজী এসে বসলেন, শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের শিষ্য তিনি। তিনি বললেন,— তোমায় কাল মন্ত্র দিয়ে মাথা মোড়াব শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের কাছে; তোমায় তিনি বাবাজী ক'রে ছাড়বেন। আমি শুনেই একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম,—"আমি কাউকেই গুরু করব না, মন্ত্রও নেবোনা; এমনি ভাবেই শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকব, তাতে আপনার কি?" তিনি বললেন,—"তুলসীর কণ্ঠী গলায় না থাকলে আমাদের দলে থাকতে পারবে না।" আমি বললাম,— "আমি দলটল কিছু বুঝিনা, আমি ভালবাসা পেয়েছি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের। আমি থাকব তাঁর কাছে, দেখি আপনি আমায় কি করেন।"

এই কথা বলেই আমি চুপ ক'রে থাকলাম। তাঁর এইরূপ ব্যবহারে আমার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল। এমন সময় শ্রীলবাবাজী মহাশয় আসতেই তিনি থত মত খেলেন, শ্রীল আমার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললেন,—"এমন করে কাঁদছ কেন?" আমি চোখের জল মুছে আনুপূর্ব্বিক সব কথা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে শ্রীলবাবাজী মহাশয় একটু কুপিত হয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন;—"তুমি যে কি সাধু একজন হয়েছ তিলক মালা পরে! একেবারে সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছ! একটা ছেলে মানুষ ব্রাহ্মণের ছোঁড়া আমার কাছে এসেছে, সরল নিষ্কপট ছেলে! এ প্রথম এসেছে, কিছুই বোঝে না; এর সঙ্গে তিলক মালা পর, মন্ত্র নেও—এ-সব কথা বলে কেন একে বিরক্ত করছ? তুমিই এবার গুরু হয়েছ দেখছি! ফের ওর সঙ্গে এমন করতো তোমায় দেখিয়ে দোবো!" ওঁনার বকুনি দেখে আমি নীরব হয়ে গেলাম আর ভাবলাম বাবাজী মহাশয় যখন আমার দিকে তখন আর ভাবনা কি,—এই মনে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন—"ওর সঙ্গে মিশোনা, আমার কাছে থাকবে।"

এইরূপ ভাবে সেই ব্যক্তি অপদস্থ হয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবছি,—উনি আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করলেন, ওঁকে গিয়ে খুব ভক্তি করি, দণ্ডবৎ করি, তা হলে উনি প্রসন্ন হবেন। এই মনে করে আমি ওঁনাকে গিয়ে দণ্ডবৎ করলাম, উনি আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন.—"সত্যিই বলছি ভাই, তোমায় আমি হিংসা করি নাই; তুমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছ, আমরাও সংসার ছেড়ে এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে মন্ত্র নিয়েছি, তুমিও নিয়ে আমাদের মত হও!" আমার কিন্তু ঐ একই কথা,— "আমি ব্রাহ্মণের ছেলে—গুরু করবার জন্য যেচে যাবো না কারও কাছে মন্ত্র নিতে; গুরু নিজে এসে আমায় মন্ত্র দেবেন। এইরূপ

ভাবে কথাবার্ত্তা বলে আমি শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের কাছে ফিরে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তখন শ্রীধামের ঠাকুর বাড়ী দর্শনে যাচ্ছেন, অসংখ্য লোক তাঁর সঙ্গে, আমিও সবাইকে পাশ কাটিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বললেন,—"এসেছ ময়না পাখী।" আমি অমনি হেসে উঠলাম। তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বের মতন ঠাকুর দর্শন ও দণ্ডবৎ ক'রে একটু সকালেই আমরা ফিরে এলাম। ভোর থেকেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় নিজেই দলবল নিয়ে নাম আরম্ভ করেছেন, আমি তখন ঘুমিয়ে আছি। খুব নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। সবাই মঞ্চ ঘিরে কি মধুর নাম করছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসে নামের কাছে প্রথমে দণ্ডবৎ ক'রে দু'চার বার মঞ্চ পরিক্রমা করে আবার দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। তারপর শ্রীরাধারমণের সমাধিতে দণ্ডবৎ ক'রে এসে তেল মাখতে বসলেন। আমিও তাঁর কাছে বসলাম, কত ভক্ত তাঁকে ঘিরে বসেছে! মেঘলাল দা', উপেন দা' (যিনি পরে নিতাইরমণ দাস বাবাজী হয়েছেন) শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তেল মাখাতে লাগলেন। কত হাস্য পরিহাস করতে করতে তিনি তখন একটা কথা বলেন; সে কথাটি বহুবার তাঁর মুখে শুনেছি, কথাটা এই, "খোসা দেখিস না, ঠকে যাবি। পারিস তো ভিতরটা দেখিস। এবার প্রভুর প্রচ্ছন্ন অবতার। তাঁর শক্তি প্রচ্ছন্নভাবেই বেশী খেলবে। সাজ গোজে বড় অভিমান ইত্যাদি।" এই কথা প্রথম তাঁর সঙ্গ পেয়েই শুনেছি, আবার বহুদিন প্রায় ৫০ বৎসর ধরে এই কথা অনেকবার শুনেছি। কি অমূল্য কথা, আমি এ-গুলো ছাপিয়ে রেখেছি।

এমন সময় চারুদা', বলাইদা', যুগলদা', মাখনদা' সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এঁদের দেখে আনন্দে বসতে বললেন এবং অনেক কথা বলতে লাগলেন। কত ঠাট্টা, কত প্রীতির ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

চারুদা', বলাইদা', যুগলদা', মাখনদা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ব্যবহৃত তেল মাখলেন। চারুদা'র সঙ্গে তাঁর বেশ সখ্য-প্রীতি; তাই চারুদা' হেসে বলছেন—"এই তেল আমি সবচেয়ে উত্তম স্থানে মাখব।" এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও একটু হাসলেন।

আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে রইলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—উত্তম স্থান মস্তক তো জানি, তাতে এত হাসছেন কেন সব? আমার কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"মানুষের মস্তকই উত্তম স্থান। এই মস্তকই শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের চরণে প্রণত হয় বলে উত্তম। বুঝেছো ময়না?" আমি বললাম,—হাঁ, বুঝেছি! তারপর আমিও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পিঠে তেল মাখাতে গেলাম। এই প্রথম শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে একটু তেল মাখাবার সৌভাগ্য পেলাম! পিঠে মাখিয়ে আবার পায়ে মাখালাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন—"যা! বামুন এসে পায় তেল দিল।" আমি একটু হেসে তেল মাখাতে লাগলুম।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বহু ভক্ত ও আমি গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম। শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটের দিকে বাবুরা ও মেয়েরা ধীরে ধীরে চলছেন গঙ্গাস্নানে। তাঁরা হঠাৎ শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখতে পেয়ে সবাই আনন্দে অধীর হয়ে বলল,—"ঐ-যে বাবাজী মহাশয় যাচ্ছেন।" কলকাতা থেকে কত বাবু ও মেয়ে ভক্তরাও এসেছেন। আশ্রম তখন জমজম করছে। আজ তিনি একটু তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান ক'রে এলেন,—নাম-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে তাই বুঝি একটু তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে ফিরে এলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে আমি, প্রিয়নাথ কাকা, রমণদা', চারুদা', মাখনদা',—বলাইদা', তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে অরুণ ও মেয়ে লালী—সবাই তাঁর সঙ্গে চলেছি। তিনি খুব চঞ্চল পদে,

চলে এলেন। এক এক বার আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কি মধুর চলন তাঁর, যেন খঞ্জন পাখীর মতন নেচে চলেছেন! আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে হাঁপিয়ে গেলাম। তিনি হাসতে হাসতে চলে এলেন নামের কাছে, সেখানে দণ্ডবৎ ক'রে আহ্নিক করতে ঘরে গিয়ে বসলেন। আমি চারুদা', বলাইদা, মাখনদা', যুগলদা', লালী ও অরুণ কাছেই বসলাম।

তিনি আহ্নিকের ঝোলা চাইলেন। সেবক এনে দিল, শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটী একটী করে যথাপূর্ব্ব প্রসাদী বস্ত্র, তিলক, চরণ-তুলসী ও চরণামৃত সাজিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি তিলক ধারণ করলেন, এখন সবাই সেখান হতে উঠে গেলেন। আমিও তাঁদের দেখা দেখি উঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরের বারান্দায় গিয়ে এক পাশে বসে গায়ত্রী জপ করতে লাগলাম। চাঁঙ্গড়ী পোতার বলাই দা', আমার কাছেই আহ্নিক করতে বসলেন,—কণ্ঠে কণ্ঠি মালা, সুন্দর তিলক ধারণ করে, তিনি আমাকে বললেন—"তুমি তুলসীর কণ্ঠি পর, তিলক কর আমাদের মত।" আমি বললাম,— "না", শ্রীল বাবাজী মহাশয় যদি কৃপা করে তিলক দেন, তুলসী মালা দেন তবে পরব। আমি আপনাদের কারও কথা শুনবোনা।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই কথা শুনতে পেয়ে আমায় ডেকে বললেন,—"ময়না! তিলক পরবে?" আমি বললাম— "আপনি বললে নিশ্চয়ই পরব," এই শুনে তিনি বল্লেন,—"তবে এস আমার কাছে।"

তিনি নিজে হাতে ক'রে আমার দ্বাদশ অঙ্গে তিলক পরিয়ে দিলেন। গলায় যে কণ্ঠি নেই! অমনি নিজের ঝোলা হতে একটী কণ্ঠি নিয়ে তিনপেঁচ করে তিনি আমায় পরিয়ে দিলেন!— আমার গলায় তুলসীর একটী ঝুলান মালা ছিল। আমি বললাম,— "এ-মালা কিন্তু ফেলবো না।" তিনি বললেন,—"বেশতো থাক-না কেন!"

তারপর আমি বাহিরে এসে বসলাম বলাইদা'র কাছে; তাঁকে বললাম—"আপনার আয়নাখানা দিন তো, দেখি কেমন হয়েছে!" তারপর আমি নিজেকে তিলক-পরা দেখে বেশ সুখী হলাম;—শ্রীল বাবাজী মহাশয় পরিয়ে দিয়েছেন! এই আনন্দে আটখানা হয়ে গেলাম।

বেশ করে চুল আঁচড়ালাম, চাদর একখানা শ্রীল বাবাজী মহাশয় দিয়েছিলেন, তাই বেড় দিয়ে তাঁর মতন ক'রে পরে, ঠাকুরকে গিয়ে দণ্ডবৎ করলাম। তারপর সখীমাকে দণ্ডবৎ করলাম। সখীমা হেসে বললেন—"বেশ দেখাচ্ছে তো তোমাকে।" তারপর গোবর্দ্ধন কাকাকে দণ্ডবৎ করলাম, তিনি আদর করে পিঠে হাত বুলালেন। কানাইদা' হেসে বলছেন—"বেশ হয়েছে, এইতো বাবাজী হয়েছ!" আমি বললাম,—"বাবাজী হবো কেন, বামুনের ছেলে আমি!" কানাইদা' হেসে বললেন,—"কত বামুন আমরা দেখলাম!" এই রকম হাস্য পরিহাস হল। তারপর ঠাকুরের আরতি হল, দেখলাম। মদনদা' ভগবান দা' আমায় সঙ্গে ক'রে পঙ্গতে প্রসাদ পেতে নিয়ে গেলেন, গোবর্দ্ধন কাকা আদর ক'রে আমাকে ডাকলেন; আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। সখীমা নিজ হাতে আমাদের প্রসাদ দিতে লাগলেন আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"বামুনের জাত গেল বাবাজীদের সঙ্গে খেতে বসে।" আমি হেসে ফেললাম।

তারপর আমাদের প্রসাদ পাওয়া শেষ হল, হাত মুখ ধুয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের বারান্দায় এসে বসলাম। তখনও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক হয়নি। কপাট বন্ধ, এক একবার হুঙ্কার দিচ্ছেন আহ্নিক করতে করতে। দুটো বাজল, আহ্নিক সারা হল। আমি তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে যাই নাই। আমায় একজন বলেছেন,—"শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে প্রসাদ পেতে যেয়োনা। ওটা ঠিক না।" এইসব বুঝিয়ে আমায় ও

পঙ্গতে নিয়ে গেছিলো। তাই আমি প্রসাদ পেয়ে এসেছি, তাঁর কাছে যাইনি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসেই আমায় ডাকছেন—"ব্রহ্মচারী কোথায়? তাকে ডাক।" অমনি মেঘলাল দা' আমায় ডেকে বল্লেন,—"শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে ডাকছেন।" দু'তিন জন বলে উঠলো,—ও প্রসাদ পেয়েছে পঙ্গতে। এই কথা শ্রীল বাবাজী মহাশয় শুনে বললেন,—"বেশতো, ডাক-না আমার কাছে।"

আমি হাসতে হাসতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। তিনি হেসে কাছে বসতে বললেন, আমি বসলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসছেন, আমায় বললেন,—"প্রসাদ পাবে?" আমি বললাম,—"প্রসাদ পেয়ে এলাম বাবাজী মহাশয়দের সঙ্গে।" শুনেই বললেন,—"ও বুঝি তোমায় বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে গেছে?" আমি বললাম,—হাঁ।—"ও নানান কথা বুঝিয়েছে বুঝি?" আমি চুপ করে রইলাম। আমি ভাবছি, শ্রীল বাবাজী মহাশয় সব কি ক'রে বুঝে ফেলেন!—ও আমায় কত বুঝিয়ে প্রসাদ পেতে নিয়ে গেল, সে যে কি কথা বলেছে সবই তো দেখি ইনি বুঝে ফেলেছেন। কথার ভাবে তো তাইই মনে হোচ্ছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তো জ্যোতিষী নন, তবুও দেখি সবই বুঝে ফ্লেলেন!

অতএব শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে কোন কথাই গোপন করব না। সব কথা তাঁকে বললাম। তিনি শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—"আমি সব বুঝেছি, তুমি আমার কাছে দুপুরে প্রসাদ পেয়ো, রাত্রে চারু, বলাই ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের ওখানে প্রসাদ পেয়ো।" আমি—আচ্ছা—বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসলাম, মেঘলাল দা' পাখা-খানা হাতে দিলেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করতে লাগলাম। তিনি প্রসাদ পেতে পেতে হঠাৎ বললেন—"এই নাও প্রসাদ।" আমি হাত পাতলুম,—একটী সুন্দর ছোট রূপার থালায় সন্দেশ রয়েছে। তিনি আমার হাতে

থালাটাই ধরে দিলেন। ৩।৪টি সন্দেশ ছিল, একটীর একটু তিনি ভেঙ্গে খেয়েছেন মাত্র। আমি বসে বসে আনন্দে পেতে লাগলাম। জানলা দিয়ে একজন আমায় দেখে হাসছে আর আস্তে আস্তে বলছে,—বেশ মজা বটে!

এমনি ভাবে তাঁর প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় খাটে বিশ্রাম করতে গেলেন, আমিও তাঁর কাছে গিয়ে পাশে শুয়ে পড়লাম। একজন আমার দিকে কটমটিয়ে তাকাল, আমি চোখ বুজে রইলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করে, ৪টার সময়ে উঠে শৌচাদি সেরে মালা জপ করতে লাগলেন। তারপর তিনি চেয়ারে এসে বসলেন। তাঁর পাশে একটা তেল মাখবার টুল ছিল আমি তাতেই বসলাম। অগণিত ভক্ত এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করতে লাগল। অজস্র টাকা, নোট তাঁর পায়ের কাছে পড়ছে! ওদিকে কোন দৃষ্টিই নেই। কিন্তু কেউ 'উৎসবের ভিক্ষা'— এই কথা বলতেই কোঁচড় পেতে টাকা নিচ্ছেন। বিজয় কাকা শ্রীল বাবাজী মশায়ের গুরুভাই—ব্রাহ্মণ। তিনি মঠেই থাকেন। কি জানি কেন এক-এক দিন এক-এক বার আমায় দেখে যান মাত্র। হঠাৎ তিনি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম ও তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমায় ঘরে নিয়ে একটা রাজভোগ প্রসাদ দিলেন। প্রসাদের মহিমা খুব বর্ণন করলেন,—কুকুরের উচ্ছিষ্টও যদি হয়, তবুও মহাপ্রসাদ নষ্ট হয় না; কিন্তু দেখ, এখন যদি মাটিতে প্রসাদ পড়ে যায়, তবে আর বেটারা খায় না! শ্রীগুরুদেব কুকুরের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ খেতে দ্বিধা করতেন না। কুকুরের মহোৎসব করেছিলেন, তাদের মুখের প্রসাদও তুলে খেয়েছিলেন।

আমি বললাম—"কুকুরের মহোৎসব কি রকম?" তিনি বললেন,—"বলছি শোনো, ভক্তিদাসী বলে একটা মেয়ে কুকুর তখন মঠে থাকত, সে প্রসাদ ছাড়া খেতনা। সে একদিন

কীর্ত্তনের ভিতর দেহ রাখল। শ্রীগুরুদেব ভক্ত সঙ্গে কাঁধে ক'রে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার সমাধি দিলেন। পরদিন তার মহোৎসব হবে বলে নবদ্বীপ বাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হল, কেউ এল না নিমন্ত্রণে; তখন তিনি নবদ্বীপ দাদাকে বললেন,—নদের সমস্ত কুকুরকে নিমন্ত্রণ করে আস, অমনি তিনি রওনা হোলেন, ধামের কুকুর দেখা মাত্র করজোড়ে বলছেন,—ভক্তি দাসী দেহ রক্ষা করেছেন, কাল তাঁর উৎসব,—আপনাদের নিমন্ত্রণ, যাবেন। তার পরের দিন ৪।৫ শত কুকুর সারি সারি এসে প্রসাদ পেতে বসল, কেহই ঝগড়া করল না। কুকুরের স্বভাব পর্য্যন্ত ত্যাগ হয়ে গেছে! এই সব দেখবার জন্য, নদের লোক ছুটে এল, এই অবাক কাণ্ড দেখে আমার শ্রীগুরু দেবের মহিমা বুঝলো সবে। আমার শ্রীগুরুদেব সবাইকে ঠিক করে দেবেন! কলির দাঁত ভেঙ্গে দেন তিনি! বুঝলে তো? তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কাছে ঘনঘন এস।" এই সব কথা বলছেন, তখন বলাইদা' এলেন তাঁর কাছে; শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য তাঁর নাম,—ব্রাহ্মণ দেখলেই খুব প্রীতি করেন। ভাবলুম—"ইনি ব্রাহ্মণ তাই ব্রাহ্মণকে ভাল বাসেন।" তিনি বললেন,—"আমার গুরুদেবের জীবনী পড়ো, সব বুঝবে। আমার গুরুদেবের অসীম প্রভাব,—সব ঠিক ক'রে দেবেন; বুঝছো তো কথা;" আমি বললাম—"হাঁ।"

তারপর আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। আমি মঠে নবাগত একটী ছেলে,—তাঁর কাছে এসেছি, শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রীতি করেন. তাই সবাই স্নেহ করেন। এমন সময় উর্ম্মিলা মায়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বামুন ব'লে খুব শ্রদ্ধাভক্তি ক'রে আমায় বললেন,—"আমাদের ওখানে একবার যেতে হবে।" আমি বললাম,—"বেশ মা যাবো।" তিনি বললেন,—"সন্ধ্যার পর যেয়ো, একটু মিষ্টি প্রসাদ রেখেছি—তুমি বাবা খেয়ে আসবে। শ্রীল বাবাজী মশায় তোমায় ভালবাসেন, তাই তোমায় ডাকছি।" সন্ধ্যার

পরে রমণদা'র সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলাম ; সন্দেশ, রাজভোগ খেতে দিলেন, আমি তাঁকে মাতৃ সম্বোধন ক'রে আনন্দে প্রসাদ পেয়ে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথায় গেছিলে ?" আমি বললাম,—"উর্ম্মিলা মা আমায় প্রসাদ পেতে ডেকেছিলেন, মিষ্টি প্রসাদ পেয়ে এলাম।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে কে গেছিলে ?" আমি বললাম,—"রমণদা' ও আমি।" অমনি বাবাজী মহাশয় বললেন,—"আমি না পাঠালে কখনও কারও বাড়ী খেতে যাবে না। তোমায় সবাই ভালবেসে, ডাকবে, যেয়ো না।" আমি বললাম,—"না আর যাবো না।" বললেন,—"বাড়ী ছেড়ে, মা, ভাই ও বোন ছেড়ে এসেছ, আবার মা পাতান কেন ?" আমি বললাম,—"মা পাতাইনি ; ডাকলেন মেয়েটি, তাই 'মা' সম্বোধন করেছি !" তিনি বললেন,—যদিও প্রসাদ তবুও আমার সঙ্গে গিয়ে খাবে।—আমাদের কল্যাণ যাতে হয় তার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা সারা জীবন ভোর দেখেছি। তাঁর সমস্ত কথার ভিতরই দেখতে পেতাম, একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

এইরকম পরমানন্দে দিন কেটে যাচ্ছে ; নয় দিন নয় রাত অখণ্ড কীর্ত্তন চলছে। আবার একদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কীর্ত্তনে নাচতে নাচতে তেমনি হয়ে গেছি,—কেবল গড়াগড়ি দিচ্ছি, কেবল কাঁদছি! শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় ধরে রেখেছিলেন, কীর্ত্তন শেষ হলে আমার চেতন হল,—এমনি করেই আমার দিন কাটছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কয়েকদিন ভক্তবাড়ী গেছলাম, কত প্রসাদ তাঁর সঙ্গে পেলাম, কত জনার সঙ্গে পরিচয় হল। হরিমতি দিদি, উর্ম্মিলা দিদি, মুঙ্গেরের দিদি, যুগলদা'র দিদি, চারুদা', বলাইদা' ও দিদিমণি প্রভৃতি কত ভক্তের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আমার উপর স্নেহ প্রীতি দেখে, হরিমতি দিদিও আমায় খুব স্নেহের চোখে

দেখলেন, বললেন—"এবার কলকাতায় গেলে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ী যেয়ো।" আমি তাঁর অপূর্ব্ব গুরুনিষ্ঠা ও গুরুসেবা দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছি। নিত্য সকালে বিকেলে নিজে হাতে করে ভোগ দিয়ে ফল, মিষ্টি নিয়ে আসেন। শ্রীপাদের আহ্নিক করার পূর্ব্বে কত কত মিষ্টি প্রসাদের ভার আসে। সব বৈষ্ণবদের বিলিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় নিজে সামান্য একটু খান। কোন জিনিষেই তাঁর লোভ দেখি না। কেবল ঠাকুরের কথা, কেবল প্রীতির ব্যবহার। যে আসে তাকেই ভালবাসেন। তাঁর যেন আপন পর কেউ নাই। সবাই যেন তাঁর নিজ জন।

আমি এমন সময় দেখতে পেলাম,—একজন বৃদ্ধামা আসছেন। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে দেখামাত্র সবাই গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে খুব ভক্তি ভরে দণ্ডবৎ করছেন। কত সাধুও দণ্ডবৎ করছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি,—এ মেয়েমানুষটি বোধ হয় খুব সিদ্ধা হয়েছেন, তাই এত ভক্তি করছেন সবাই। সুন্দর একটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ঝুলান। পাশে বলাই দা' ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ইনি কে!" বলাইদা' বললেন,—"ইনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মা,—গর্ভধারিণী।" এই কথা শুনে আমি ছুটে তাঁর চরণে মস্তক রেখে দণ্ডবৎ করলাম। অমনি আমার মাথায় তিনি হাত দিয়ে স্নেহ ভরে বললেন,—"রাধিকার শিষ্য হইছস্ নাকি, বামুনের ছাওয়াল তুমি?" আমি বললাম,—"হাঁ, কিন্তু শিষ্য হই নাই।" "রাধিকা কহানে আছে"—তিনি এই বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে গেলেন, তাঁকে দেখে শ্রীল বাবাজী মহাশয় অমনি তাঁর শ্রীচরণে মস্তক রেখে দণ্ডবৎ করলেন, মা তাঁর মাথায় মুখের থুতু দিয়ে আশীষ করলেন। মা স্নেহ বসে সন্তানের মাথায় থুতু দেন মঙ্গলের জন্য। আমি আমার মাকেও এমনি দেখেছি তাই হাসতে লাগলাম।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন, মা সহাস্য বদনে বললেন,—"রাধিকা, আমি রান্না চড়াইয়া আইছি, মটরের ডাল বসাইয়া আইছি। আজ দুপুরে ওখানে খাইবা। গোবর্দ্ধনকে লইয়া যাইবা। আর এই ছাওয়ালটাকে লইয়া যাইবা। এই তিনজন যাইবা খাইতে।" বাবাজী মহাশয় হেসে কহিলেন,—"আচ্ছা যামু।" তাঁর মা চলে গেলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বলছেন—"ফরিদপুরের বাঙ্গাল আমি তুমিও বুঝি যশুরে বাঙ্গাল, আবার আমাদেরও শ্রীগুরুদেবের বাড়ী নড়াল সাবডিভিষণ, মহিষ খোলায়। বাঙ্গালই সব এখানে,— নবদ্বীপেও বাঙ্গাল বেশী।" এই সব হাস্য পরিহাস হতে লাগল।

আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু সকাল সকালই স্নান আহ্নিক পূজা সেরে ঠাকুরের আরতি দর্শন ক'রে তাঁর মায়ের ওখানে গোবর্দ্ধন কাকা ও আমাকে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। তিনি গেটের ধারে শ্রীফণিদাস বাবাজীকে দেখতে পেলেন, তিনিও সঙ্গে প্রসাদ পেতে চললেন। আমরা চার জন মিলে তাঁর ওখানে চললাম। চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মা দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। আমাদের দেখেই তিনি হেসে বলছেন—"আইছস আও, ভোগ হইয়া গেছে দেরী ক'রছ কিএর লগে।" আমি ভেতরে ঢুকেই দেখি, একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব ও তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন,—দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করেছেন! জ্বল জ্বল করছে তিলক।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করলেন, তারপর তাঁকে একটী আসনে বসিয়ে তিনি বাতাস করতে লাগলেন। আমি গোবর্দ্ধন কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ইনি কে? তিনি বললেন,—"এঁর নাম পাঁচু বাবু, কলকাতার একজন ধনবান মার্চ্চেণ্ট। খুব শ্রীগুরুভক্তি ওঁদের। সস্ত্রীক এখানে এসেছেন। এই বাড়ীটা ওঁদেরই; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মাকে এখানে রেখে সেবা

করেন। মা-ই থাকেন এখানে, উৎসব দেখতে এঁরা এসেছেন। এঁরা খুব প্রেমিক ভক্ত। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কলকাতায় এখন সদলবলে তাঁর বাড়ীতেই থাকেন। এঁর শ্রীগুরু সেবার তুলনা নেই। শ্রীগুরু ও তাঁর পারিষদের সেবাই এঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

এই কথা শুনে পাঁচুবাবুকে দণ্ডবৎ করবার আমার বাসনা জাগল কিন্তু আমার গলায় পৈতা, ব্রাহ্মণ আমি,—কেন দণ্ডবৎ করব এই কথা মনে হল। গলায় পৈতা থাকলে বেশ একটা ব্রাহ্মণ অভিমান থাকেই। অভিমান কিছুতেই যেতে চায় না, ও যেন আমাদের সঙ্গের সাথী হয়ে রয়েছে। কত শুনছি, কত পড়ছি যে অভিমান ত্যাগ না হোলে কিছুই হয় না। কি দুর্জ্জয় প্রভাব এই অভিমানের!—শ্রীল বাবাজীমহাশয়ের কাছে রয়েছি, এমন নিরভিমান মহতের কাছে রয়েছি, তবুও অভিমান যায় না! এই ভাবছি। এমন সময় শ্রীফণিদাস বাবাজী বলে উঠলেন,—"দাদা চল প্রসাদ পেতে যাই।" অমনি সবাই উঠে প্রসাদ পেতে বসলাম। আমরা চারজনই পাশাপাশি বসলাম। শ্রীল বাবাজীমহাশয়ের মা আমাদের প্রসাদ পাতে দিতে লাগলেন, আর একটী সুন্দর পাথরের থালায় ও বাটীতে, তাঁর রাধিকাকে প্রসাদ দিয়ে বললেন—"খাও, এই সুক্তা দিছি, তুমি ভালবাস, রাঁধছি আমি। আগে খাও।" আমাদেরও সুক্তা তিনি দিয়েছেন। আমরা প্রসাদ পেতে সবাই আরম্ভ করেছি, শুক্তা মেখে আমি প্রসাদ দু'চার গ্রাস খেয়েছি, কি সুন্দর স্বাদ,—আজ অনেকদিন পরে এমন শুক্ত প্রসাদ পেলাম! অমনি আমার মা'র কথা মনে হল,—এমনি করেই, আমার মা শুক্তো রাঁধতেন। আমার মা'র কথা মনে ক'রে চোখে জল এল, একটু ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। চোখ দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল পড়তে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সব বুঝে ফেললেন, বললেন,—"মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়ে, তাঁর সেবায় বঞ্চিত হলে কারও জীবন

সুখকর হয় না। এ সংসারে মায়ের স্নেহ ভালবাসাতেই মানুষ বড় হয়ে ওঠে। এই দেখ, আমি ঘর দুয়োর ছেড়ে বাবাজী হয়েছি, তবুও মা'র সেবা ছাড়তে পারিনি। মাকে এখানে রেখেছি ও তাঁর সেবা করি।"

তিনি আমাকে বল্লেন,—"তোমার যতদিন শরীর থাকবে বৎসরে অন্তত একবার করেও মাকে দেখে এসো। তিনি একটু চোখের দেখা পেলেই সুখী হবেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরেও মাকে ৭ বার প্রদক্ষিণ ক'রে দণ্ডবৎ ক'রে তাঁর আদেশেই শ্রীনীলাচলে থাকতেন। মায়ের ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না।" আমি বললাম,—"আমিও তাই করব, মাকে শীঘ্রই দেখতে যাবো। মা'র কথা মনে পড়ে মন উতলা হয়ে পড়েছে।" শ্রীপাদ বললেন,—"মায়ের অফুরন্ত স্নেহ ক-টি লোকই বা বোঝে!" —"আমি আপনাকে দেখে সব বুঝছি এবং আমি বাড়ীতে থাকতে কোন দিনই মা'র কথায় অবহেলা করি নি। একটী দিনের জন্যও মা'র অবাধ্য হই নি। তাঁদের ছেড়ে আমি সংসার বিরাগী হব একথা মাকে একদিন বলেছিলাম। মা—হাঁ-বা-না—কিছুই বলেন নি; কেবল চোখের জল ফেলেছিলেন।

আমার মা'র কথা শুনে শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের মা-ও বললেন,—"কত সাধ্য সাধনা করে রাধিকাকে পাইছিলাম। সেও ছাইরা চইলা গিছিলো। কত কাণ্ড ক'রে সবার মমতা ছাড়িয়া এখানে এসে তাকে পাইছি। আর তাকে ছাইরা যামুনা। এই দেখনা এই শুক্তা তাকে রাঁইধা দিতাম, কত ভাত খাইত এই শুকতা দিয়ে। আবার এই নবদ্বীপে তাকে পাইছি তাই দিবার পাল্লাম শুক্তা রাঁইধা। এই শুক্তাই তার সব চেয়ে ভাল লাগে।"

শ্রীপাদের মা এইরূপ ভাবে পুত্র বাৎসল্যের কথা আমায় বলতে লাগলেন। আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অগণিত ভক্ত। কত কত প্রসাদ-ভার আসে তাঁর কাছে। আহ্নিক করবার সময়

অসংখ্য প্রসাদের থালা তাঁর কাছে ভক্তেরা নিয়ে আসেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মা-ও প্রসাদ নিয়ে মঠে কখনও কখনও আসেন। আবার এক-এক দিন শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর ওখানে দু'চার জন ভক্ত নিয়ে প্রসাদ পেতেও যান। নবরাত্রি উৎসব হোচ্ছে মঠে! অগণিত ভক্ত আসছেন। একদিন শ্রীপাদ ও আমরা তাঁর মায়ের ওখানে প্রসাদ পেতে গেছি। তখন দেখতে পেলাম শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত পাবার জন্য অনেক ভক্ত এসে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রসাদ পেয়ে তিনি বললেন,—"ব্রহ্মচারী, এদের প্রসাদ মেখে একটু একটু ক'রে সবাইকে দাও। এরা প্রসাদ নিয়ে মঠে গিয়ে পঙ্গতে বসবে।"

আমি শ্রীল বাবাজীমহাশয়ের কথা মত সব প্রসাদ এক সঙ্গে মেখে একটু একটু ক'রে সবাইকে দিলাম। সবাই প্রসাদ নিয়ে মঠে চলে এলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও প্রসাদ পেয়ে উঠতেই এক ঠোঙ্গা পান পাঁচুদা তাঁর হাতে দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পান-প্রসাদ পেতে লাগলেন। কি সুন্দর গন্ধ পানে, নাসিকায় সুবাস আসছে। আমি ব্রহ্মচারী বলে পান খাই না কিন্তু ঐ পানের সুগন্ধ দেখে ইচ্ছা হল যদি শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেচে তাঁর মুখের পান-প্রসাদ দেন তবে খাবো। আমি কখনও কারও উচ্ছিষ্ট খেতাম না কিন্তু প্রথমে এসেই তাঁর অধরামৃত-প্রসাদ পেয়েছিলাম,—ঐ অধরামৃত যে কত স্নেহ-বাৎসল্য ভরা তা বুঝেছিলাম বলেই কোন দিনই আমি আপত্তি করিনি। তবে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ছাড়া আর কারও উচ্ছিষ্ট খেতাম না।

এইরূপ মনে মনে ভাবছি অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার ডান হাত খানা ধরে বললেন,—"হাত পাত," আমি হাত পাতলাম, সেই প্রসাদ—চিবানো-পান হাতে দিলেন, আমি অম্লান বদনে খেয়ে ফেললাম। হেসে হেসে বলছেন—"তোমার বামুনের জাত একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল।" আমি হেসে হেসে বলছি,—

"আগেই তো ঐ সেদিন অধরামৃত দিয়েছেন, জাত নষ্ট হয়েই তো গেছে। তাই বলে আর অন্য কারও এঁটো আমি খাবোনা! এই যে কত সাধু দেখছি এরা যেন কখনও আমায় এঁটো দেয়না, জানেন, একদিন আমাকে একজন পাত থেকে খাবার উঠিয়ে দিয়েছিল, আমি পাতা ছেড়ে উঠে চলে গেছলাম। তিনি কাছেই ছিলেন একটু লজ্জিত হলেন।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"কে দিয়েছিল?" আমি নাম করি নাই এই ভয়ে, পাছে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তার উপর রাগান্বিত হন। আমি বললাম,—"আমাদের দেশে প্রায়ই নীচ লোকে তিলক মালা পরে সাধু হয়। ভদ্র লোকে তিলক মালা পরে না!"

আমার এই কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কত উপদেশ দিতে লাগলেন,—"যারা নীচ জাতি তারা সর্ব্বদাই মনে রাখবে আমরা নীচ, তা' হোলে সাধু হলেও অভিমান আসবেনা। আর যারা ব্রাহ্মণ উত্তম জাতি তারা উত্তম বংশ ও জাতের কথা ভুলে যাবে,—নীচু হবে তবে তো ভক্তি আসবে। জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব ও রূপ-যৌবন এই সমস্তে ভীষণ অহঙ্কার বাড়ে!—এইসব না ভুললে ভক্তি আসবে না। তারপর যে একান্ত ভক্ত সে নীচ জাতি হোলেও সবারই পূজ্য।"

"ঐ দেখ-না যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হল, কত ঋষি মুনির সেবা হল কিন্তু তাতেও ত যজ্ঞ পূর্ণ হল না! যজ্ঞ পূর্ণ হলে শঙ্খঘণ্টা এমনিই বেজে উঠবে কিন্তু কই ঘণ্টা বাজলনা। যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কই সখা শঙ্খঘণ্টাতো বাজে না, আমার যজ্ঞ অপূর্ণ হয়ে থাকল!' স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'এক মহৎ ছিদ্র রয়ে গেছে, তাই যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি।' যুধিষ্ঠির বললেন,—'বলো বলো সখা, কি ত্রুটি আমার হয়েছে?' শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'তুমি পরম ভাগবতের বা কোন বৈষ্ণবের সেবা কর নি; তাঁকে গৃহে এনে সেবা কর নি, এই একটী দোষ।' যুধিষ্ঠির বললেন—'এই লক্ষ

লোকের সেবা হল তাতেও হয় নি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন— 'না— বৈষ্ণব এইসব যজ্ঞে আসেন না। তাঁরা সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকেন, তাঁদের চেনা বড় কঠিন।' যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে বললেন,—'বল বল সখা কোথায় আছেন সে বৈষ্ণব।' শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'ঐ দূর গ্রামে এক মুচী আছে, সে পরম ভাগবত! তার নাম বাল্মীকি —রুইদাস। তাঁকে সসম্মানে গৃহে এনে সেবা কর তবে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হবে।' এই কথা বলতেই যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুনকে বললেন,—'যাও তোমরা সসম্মানে তাঁকে ডেকে আন আমাদের গৃহে।' দ্রৌপদীকে আদেশ করলেন,—'উত্তম উত্তম বস্তু রান্না ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন ক'রে সেই প্রসাদ তাঁকে পাকশালা গৃহে বসে খাওয়াবে।' ভীম অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি বাল্মীকির গৃহে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তিনি জুতা সেলাই করছিলেন আর গুন গুন ক'রে কৃষ্ণনাম করছিলেন। ভীম, অর্জ্জুনকে দুয়ারে দেখে তিনি থতমত খেয়ে গেলেন। ভীম অর্জ্জুন যেই তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন, অমনি রুইদাস বলে উঠলেন,—'ছি-ছি একি করেন আপনারা; আমি নীচজাতি—মুচি, তাকি জানেন না?' তাঁরা বললেন,—'আপনাকে আমরা নিমন্ত্রণ করতে এসেছি—আজ আমাদের গৃহে ভোজন করবেন।' কিছুতেই তিনি যেতে রাজী হননা, বলতে লাগলেন,— "উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলতে যদি বলেন তবে সব ব্রাহ্মণের বা সমস্ত লোকের পাতা ফেলতে যাবো।' ভীম অর্জ্জুন বলতে লাগলেন,— 'না-না তা নয়, আপনি কৃপা ক'রে আমাদের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করবেন।' এইরূপ ভাবে কত সাধ্য সাধনা ক'রে তাঁকে নিয়ে আসা হ'ল। সব মাঙ্গলিক—কদলী বৃক্ষ, মঙ্গল ঘট ও হলুদ জল ঠিক ছিল, যেই রুইদাসকে গৃহে নিয়ে এসেছেন অমনি হুলুধ্বনি হতে লাগল, হলুদ জল সিঞ্চিত হতে লাগল। যুধিষ্ঠির সসম্মানে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন; দ্রৌপদী পদধৌত ক'রে একেবারে তারপর তাঁকে বসায়ে বীজন করতে লাগলেন। তাঁর

বসবার আসন পাকশালাগৃহে হল, উত্তম উত্তম প্রসাদ-ভার তাঁর সামনে আসল,—উত্তম পরমান্ন, কত সুন্দর শাক, শুকতা তাঁর সামনে ধরা হল। শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে রুইদাস প্রসাদ পেতে বসলেন। প্রথমেই পরমান্ন প্রসাদ পেতে আরম্ভ করলেন; শাক শুকতা আগে না খেয়েই 'তস্মৈ' পেতে লাগলেন। দ্রৌপদী মনে ভাবছেন,—নীচ জাতি কিনা তাই আহারের রীতি জানেন না, আগেই পরমান্ন খেতে লাগলেন। দ্রৌপদী বৈষ্ণবকে নীচ জাতি মনে ক'রে তাঁর ব্যবহার এইভাবে বিচার করায় অপরাধী হলেন তাই শঙ্খ আর বাজে না। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন,—'একি হল, বৈষ্ণব সেবা করছি অথচ শঙ্খ ঘণ্টা বাজে না।' অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'দ্রৌপদী ঐ বৈষ্ণবের জাতি বিচার মনে মনে করেছে, তাই অপরাধ সঞ্চয় হয়েছে। জিজ্ঞাসা কর দ্রৌপদীকে।' অমনি দ্রৌপদী মনে যাহা করেছিলেন তাহাই আনুপূর্ব্বিক বললেন। 'পরম ভাগবত, তিনি জিহ্বার লালসা করবেন কেন? পরমান্ন ভোগ ঠাকুরের সব চেয়ে প্রিয়, সেই জন্য এর একনাম 'তস্মৈ' অর্থাৎ তোমারিই। এই ভোগ প্রভু কেমন গ্রহণ করেছেন, প্রসাদের আস্বাদন কেমন হয়েছে, তিনি তাই জানবার জন্য শাক শুক্তো প্রসাদ আগে না খেয়ে পরমান্নই আগে আস্বাদন করলেন',—বৈষ্ণবের এই ব্যবহার দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণ মুখে শুনলেন এবং বুঝলেন যে তাঁকে অবজ্ঞা করার দরুণ যজ্ঞ পূর্ণ হলনা, শঙ্খ ঘণ্টা বাজল না।

তারপর দ্রৌপদী নিজের ত্রুটী-অপরাধ বুঝতে পেরে করজোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, এবং প্রপন্ন হয়ে নিজ দোষ স্বীকার করলেন। তারপর রুইদাস বাল্মীকির গ্রাসে গ্রাসেই শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল। বৈষ্ণবের জাতি নিয়ে কেহ পাছে বিচার করে, বৈষ্ণব নীচ জাতি হলে পাছে তাঁ-কে অবজ্ঞা ক'রে, ভক্তি বলে নীচ জাতিও যে শ্রেষ্ঠ আসন পায়, শ্রীকৃষ্ণ তাই ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখালেন, মহাভারতে লেখা আছে এ কথা। বড়গুণ

সম্পন্ন ব্রাহ্মণও যদি শ্রীহরিতে ভক্তি না করেন তবে সে চণ্ডাল হতেও অধম; আবার নীচ চণ্ডাল কুলে জন্ম যাঁর তিনিও যদি শ্রীহরি ভক্তিতে বলীয়ান হন তবে তাঁর মহিমাই ব্রাহ্মণ হতে শ্রেষ্ঠ; শাস্ত্র এর জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। ভক্তি বলে সবাই বড় হয়, আর ভক্তি হীনের সবই পণ্ডশ্রম হয়। এইসব কথা বলে শ্রীপাদ আমাদের বুঝাতে লাগলেন।

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা মঠে এলাম। মঠে প্রসাদ পাচ্ছেন সব, আর নিতাই গুণ গানে, গৌর গুণ গানে তাঁরা ধ্বনি দিচ্ছেন, আমি দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। একজন বাবাজী মহাশয় বললেন,—প্রসাদ পাবেনা ? আমি বললাম—"না, পেয়েছি।" অমনি আর একজন বললেন,—"বড় গাছের সঙ্গে ভাব করেছে, আর ভাবনা কি! কত রাজভোগ গড়াগড়ি যাচ্ছে।" আমি বললাম,—"আপনারাও তো বড় গাছে দড়ি বেঁধেছেন আপনাদেরই বা কম কি!" এই বলে হাসতে হাসতে ওখান থেকে আমি চলে গেলাম।

আজ নবরাত্রি সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের শেষ দিন। অপূর্ব্ব নাম ধ্বনি চারদিকে মুখরিত হচ্ছে। উৎকল বাসী বহু ভক্ত এসেছেন। তাঁরা অতি মধুর প্রাণ মাতান সুরে নাম কীর্ত্তন করছেন। নাম ক'রে ঠাকুরের মঞ্চ ঘুরে ঘুরে তালে তালে কি মধুর নৃত্য করছেন তাঁরা! আমরা উৎকল দেশের এই মধুর কীর্ত্তন সুর শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। প্রাণ মন নেচে উঠল। আর থাকতে পারলাম না। কীর্ত্তনে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে নাচতে লাগলাম। ছোট রমণদা' অতি সুন্দর মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন। শ্রীবসন্ত দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীনন্দ দাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি নৃত্যে যোগ দিয়েছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না, আমিও গিয়ে কীর্ত্তনে নাচছি। কানাইদা'ও এসে যোগ দিলেন। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হতে লাগল, তারপর কীর্ত্তন শান্ত হল।

কত লোকে ভাবে গড়াগড়ি দিতে লাগল। কানাইদা'র ভাব আর থামেনা, দিনভোরই কাঁপছেন কেবল। উৎকল বাসীদের এমনি ভক্তি ভাবের অপূর্ব্ব নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। উৎকল বাসীদের এমন মধুর নাম কীর্ত্তন কখনও শুনি নাই; জীবনে প্রথম এইরূপ কীর্ত্তন শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়েই বলতে লাগলেন,—"দেখেছ! কি সুন্দর নাম কীর্ত্তন ওরা করছে। এরূপ ভাবে নাম কীর্ত্তন তোমাদের বাঙ্গলা দেশেও হয় না।"

—"উৎকল দেশে শ্রীজগন্নাথের নাম ও শ্রীনিতাই শ্রীগৌরের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত। জগতের নাথ—শ্রীজগন্নাথ পুরীতেই আবির্ভূত হয়েছেন! পৃথিবীর কোথাও প্রকটিত না হয়ে উৎকল দেশেই স্বয়ং নীলাম্বুধি তীরে দারুব্রহ্ম রূপে প্রকটিত হলেন! ভক্তিভরে উৎকল বাসী তাঁকে সেবা করবেন বলেই তো সেখানে প্রকটিত হলেন! আবার গৌর কিশোর সন্ন্যাসের পর চব্বিশ বৎসর কাল পুরীতেই কাটালেন। মাত্র ৬ বৎসর তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে গেছিলেন। তাঁদের ভক্তির বিশেষত্ব আছে বলেই তিনি পুরীতে কাটালেন! উৎকল দেশেই সাক্ষী গোপাল প্রকটিত রয়েছেন!" আমি বললাম,—"সাক্ষী গোপাল কি?" তিনি বললেন,—"পরে বলব। উড়িষ্যা দেশে প্রত্যেক গ্রামেই ঠাকুরের মন্দির রয়েছে, অতি নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে সবাই সেবা করেন। তাঁরা বৈষ্ণবকে বাবাজী মহাপ্রভু ছাড়া কথা বলেন না। শ্রীভগবানে ও ভক্তে তাঁদের অতুলনীয় নিষ্ঠা। এ-প্রীতি ভারতে আর কোথায়ও দেখিনা। শ্রীজগন্নাথ যখন রথে ওঠেন তখন ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুকে দর্শন করতে আসেন। এত বড় বিরাট উৎসব, এত লোক সমাগম আর কোথাও হয় না। তাই উৎকল দেশ আমাদের এত ভাল লাগে। আবার আমাদের কর্ত্তার (শ্রীগুরুদেব) এই উৎকল দেশই অতি প্রিয় বিহার ভূমি।

এই উৎকল দেশেই তিনি বেশী থাকতেন। নীলাচল, কটক, কণ্টাবাড়ী, জাজপুর, বালেশ্বর ও কোন্দ্রাপাড়া তাঁর সতত বিহার ভূমি ছিল। কত আনন্দ করেছেন সেথা। কীর্ত্তনে নাচতে নাচতে উৎকলের পথে নামের ধ্বনি মুখরিত হত। তাঁকে তো দেখ নাই, তাঁর কথা আমি কি বলব! 'চরিত-সুধা' পড়ো, সব বুঝবে এবং উৎকল দেশে তাঁর যে-লীলা-কাহিনী তা পড়ে ধন্য হবে। আমি শ্রীগুরু আদেশে কলকাতায় থাকি কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে নীলাচলে, বুঝেছ!" এইসব কত কথা তিনি আমায় বলতে লাগলেন, আমার চোখে জল এল। আমি বললাম,—"আমাকে এই নীলাচল ধাম দেখাবেন তো?" তখন আমি কিছুই জানিনা, কোথায় কটক, কোথায় নীলাচল,—কেবল তাঁর মুখে শুনেই আমার লোভ হল দেখবার। এইরূপ কত কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দর্শনে গেলেন আমরাও একটু পাশ কাটালাম।

আজ নবরাত্রি যজ্ঞের শেষ কীর্ত্তন। রাত্রি ৮॥ টার সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে বসলেন। অগণিত ভক্ত এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে ঘিরে বসেছেন,— অদ্বৈত কাকা, চারুদা', বলাইদা', যুগলদা', বিহারীদাস বাবাজী মহাশয়, রমণদা', উপেনদা', রামচরণ, প্রিয়নাথ কাকা, বসন্ত কাকা, ভগবানদা'; এইরূপ বহু ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তন করছেন। এখন ইঁহারা সবাই নিত্যধামে চলে গেছেন। একমাত্র যুগলদা' এখনও প্রকট রয়েছেন। শ্রীপাঠ বাড়ীতে আছেন।

তারপর অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আরম্ভ হল। সমস্ত মঠ কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হতে লাগল। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হল। তারপর শ্রীপাদ আবার দাঁড়িয়ে— "পাগলের প্রাণারাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—এই বলতেই সবাই যেন গর্জ্জে উঠে অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ করলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এমন নৃত্য আরম্ভ

করেছেন যে আমি তা বলে বুঝাতে পারবো না। আড়াইটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের মাতন চলল। তারপর কীর্ত্তন একটু শান্ত হল, সবাই প্রসাদ পেতে গেলেন ; সকলে একটু বিশ্রাম করলেন, আবার ভোরে নাম আরম্ভ হল। আজ নবরাত্রি কীর্ত্তন শেষ হবে! ভোরে নাম আরম্ভ ক'রে তারপর নাম করতে করতে আশ্রম পরিক্রমণ ও সংক্ষিপ্ত নগর কীর্ত্তন ক'রে নাম-যজ্ঞ সমাপ্ত হল।

আজ শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের তিরোভাব তিথি! শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর সূচক কীর্ত্তন করবেন। সমাজ বাড়ীর বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সামিয়ানা টাঙ্গান হয়েছে, সেখানে বসে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর শ্রীগুরুদেবের সূচক কীর্ত্তন করবেন। অগণিত লোক এসে আঙ্গিনায় বসে গেছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সাধু বৈষ্ণব ও গোস্বামিসন্তানগণও এসে বসেছেন। গৃহের ছাদ বারান্দা সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে তাঁর কাছে বসে আছি। অজস্র ধারে তিনি শ্রীগুরু-বিরহে কাঁদছেন! আর শরীর কাঁপছে, কীর্ত্তনে যাচ্ছেন না। আপন মনে বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কি বলছেন আর আকুল প্রাণে কাঁদছেন! এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাদামহাশয়, শ্রীরাখালানন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামী শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে এলেন, আর অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় ব্যাকুল প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন! শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাদা মহাশয় তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আস্তে আস্তে ভাব সম্বরণ ক'রে কীর্ত্তনের আসরে এসে বসলেন,—খোল করতাল বেজে উঠল; শ্রীল বাবাজী মহাশয় করতাল লয়ে দণ্ডবৎ ক'রে যেই কীর্ত্তন আরম্ভ করতে গেলেন,—জয়রে—বলতে বলতেই আকুল ক্রন্দনে বিবশ-বিধুর হয়ে উঠলেন,—আর—শ্রীরাধারমণ—বলতেও পাচ্ছেন না। কেবল বুক-ফাটা কান্না আরম্ভ হল! তাঁর সেই শ্রীগুরু বিরহে আকুল ক্রন্দন দেখে সমস্ত

নরনারী নিঝুমে নিঝরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁদের কান্না দেখে আমারও চোখে জল আসল। এক এক বার তিনি এমন হুঙ্কার দিচ্ছেন যে তা বলবার নয়, শেষে বালকের মত কান্না আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রাণ-ফাটা কান্না যে দেখেছে সেই বুঝেছে শ্রীগুরুবিরহ কি নিদারুণ, কি ভালবাসাই গুরুকে বেসেছেন, যে তাঁর বিরহে নামও উচ্চারণ করতে পাচ্ছেন না। তাঁকে স্মরণ করা মাত্রই তিনি কেবল ব্যাকুল প্রাণে কাঁদছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে, মস্তক ঘূর্ণিত হচ্ছে আর আসে পাশে তাঁর নয়নের প্রেম-নীর সিঞ্চিত হচ্ছে। এমন ভাবে নয়ন বারি পড়ছে যে বলে বোঝাতে পারবো না। অদ্বৈত কাকা, অনবরত চোখ মুখ গামছা দিয়ে মোছাচ্ছেন, তবুও কান্না থামেনা। তাঁর সেই কীর্ত্তনের সময় সমস্ত লোকেরই চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে। এইরূপ ভাবে এক ঘণ্টা কেটে যাবার পর ভাব একটু শান্ত হলে তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁর এই অপূর্ব্ব শ্রীগুরু-বিরহ-লীলা কীর্ত্তন প্রথম শুনলাম আর কখনও শুনিনি, আর কোথাও শুনবার সৌভাগ্য আর বুঝি হবেনা! যতদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রকট ছিলেন তিনি নিজেই এই কীর্ত্তন করতেন;—যিনি তাঁর কীর্ত্তন শুনেছেন, তিনিই বুঝতে পেরেছেন,—"শ্রীগুরু তাঁর কাছে কি অপূর্ব্ব রত্ন ছিলেন।"

আমি ভাষার ভিতর দিয়ে তাহা বর্ণনা করতে কোন দিনই পারব না। দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন ধরলেন—"পাগলের প্রাণারাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।" এই নামে সেখানে অনেক মাতামাতি হল। শেষে তিনি শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাধি মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত কীর্ত্তন করলেন, কত আবদার ক'রে, কত ব্যাকুল হয়ে কীর্ত্তনমুখে কত যে প্রার্থনা করতে লাগলেন তা' আমার ক্ষুদ্র লেখনী কি ক'রে বর্ণনা করবে! তারপর তিনি কীর্ত্তনের স্থানে এসে নাম সমাপন ক'রে দণ্ডবৎ করলেন, কীর্ত্তন শেষ করতে একটা বেজে গেল।

এখন তিনি নিজ ঘরে এসে বিশ্রাম করলেন। তারপর স্নানের সময় হল, তিনি একটী টুলে বসলেন। দু'দিন আগে শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের মহাভিষেক-স্নান হয়ে গেছে। ১০৮ কলসী জল দিয়ে সেদিন শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের স্নান হয়েছিল। দেহ রাখবার পূর্ব্বদিন নাকি এই রকম স্নান করেছিলেন! ঘটে-ভরা সেই স্নানজল ঘরে ছিল তাই তিনি একটু খেলেন ও মস্তকে দিলেন। তারপর শ্রীরাধারমণের প্রসাদি মরিচজলও একটু খেলেন। তখনও তাঁর ভাবের ঘোর কাটেনি, এমন সময় আমি সামনে এসে বসলাম চুপ করে। দু' এক বার তাকালেন এবং বললেন,—স্নান করেছ? আমি বললাম,—না।

তাঁর সেবকেরা তেল মাখাতে বসল, তেল মেখে শ্রীল বাবাজী মহাশয় গঙ্গাস্নানে চললেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চললাম। গঙ্গাস্নান করে দুইটার সময় তিনি ফিরে এলেন। এসেই শ্রীপাদ আহ্নিকে বসলেন। আমরা মহোৎসবের রান্নার দিকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, অনেক উনুন জ্বলছে। ডাল তরকারী রাঁধবার জন্য বড় বড় কড়াই, বড় বড় খুন্তি সব দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলাম। অনেক তরকারি স্তুপীকৃত হয়ে আছে। অন্নও ঠিক যেন ছোট পাহাড়ের মত। বড় বড় এক একটা টবে ডাল ঢালা হচ্ছে, প্রায় দশ জন পূজারী রান্না কোচ্ছেন। তারপর ঠাকুরের ভোগ কীর্ত্তন হল। ৬৪ মহান্তের ভোগও হল। তারপর সেই অসংখ্য নরনারীকে প্রসাদ-বিতরণ-ব্যবস্থার জন্য পাতা পড়তে লাগল। বৈষ্ণব সাধুরা একদিকে বসলেন। কলিকাতার ভক্তেরাও বসলেন। কত কত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যে যেখানে পারল বসে গেলেন। মঠের সমস্ত স্থান জুড়ে সবাই প্রসাদ পেতে বসলেন। অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ পাতে পড়তে লাগল, অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদের গন্ধ বের হচ্ছে। ডাল তরকারী, লাপ্‌ড়া, অম্বল, বঁদে, দই যে যত চাইছে তাঁরা সবাইকে তত দিচ্ছেন।

অকাতরে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে, ঠিক যেন জগন্নাথ ক্ষেত্র হয়ে

পড়েছে। কোন দ্বিধা নেই, ব্রাহ্মণ. শূদ্র, ধনী, কাঙ্গাল সব এক সঙ্গে পর পর বসে প্রসাদ পাচ্ছেন। জাতি বিচার কিছুই নাই। মহাপ্রসাদের মহিমা আমি তখন বুঝতে পাচ্ছি। তখনও আমি জানিনা বা দেখিনি—শ্রীজগন্নাথ ধাম, কেবল শুনেছি মাত্র শ্রীপাদের মুখে। আজ নয়নে দেখলাম মহাপ্রসাদের মহিমা! শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় যখন কৃপা ক'রে শ্রীজগন্নাথ ধামে নিয়ে যান তখনও ঠিক এই রকম মহাপ্রসাদের মহিমা দেখেছি আনন্দবাজারে। এই ধামে নাকি শুধু শ্রীজগন্নাথের মহিমা ও মহাপ্রসাদের মহিমাই প্রধান: জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠিক এই রকমই সমাজবাড়ীতে দেখেছি,—এখনও দেখতে পাই।

তারপর সখীমা মালপোয়া প্রসাদ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। অমনি—হরি হরি ধ্বনি—উত্থিত হতে লাগল। জয় শ্রীরাধারমণ ব'লে সবাই উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে লাগল, কেউবা জয় সখীমা ব'লে চেঁচাতে লাগল। সখীমার পেছনে ঝুড়ি ভরে মালপোয়া নিয়ে ৪।৫ জন দাঁড়াল। সখীমা অতি দ্রুত মালপোয়া বিতরণ ক'রে যাচ্ছেন; যেই ঝুড়ির মালপোয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে অমনি আর একজন ঝুড়ি হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ান! তিনি মালপোয়া কি সুন্দর পরিবেষণ করছেন। দেখে নয়ন তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছে। কত প্রীতি যুক্ত হয়ে, কত সহাস্য বদনে কত দ্রুত সখীমা পরিবেষণ করছেন তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। পঙ্গত থেকে যেই সব উঠে গেলেন অমনি পাতা পরিষ্কার না হতে হতেই আবার ঐ পাতাতেই অসংখ্য লোক বসে গেলেন, আবার ঐ রকম সব প্রসাদ বিতরণ হল, এমনি ভাবে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মহোৎসব হল। মহোৎসব শেষ হলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে যাওয়া মাত্রই দেখছি তিনি প্রসাদ পেতে বসছেন;—মঠের সমস্ত লোকের প্রসাদ না-পাওয়া হলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসেন না; আবার দেখলাম, তিনি সমস্ত ভক্তের অধরামৃত নিয়ে তবে বসেন,—এমন

সময় একভক্ত একটী মেটে গ্লাসে ক'রে প্রসাদ আনল।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ প্রসাদ হাত পেতে নিয়ে আগে পেলেন। তারপর প্রসাদ পেতে বসলেন। আমি কাছে গিয়ে বসলাম,—বললেন, —"প্রসাদ পেয়েছ ?"—বললাম,—"দুপুরে চারুদা', বলাইদা'র সঙ্গে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে এসেছি।" —"ভালই করেছ, বেশতো আবার আমার সঙ্গে বস।" বলা মাত্রই আমি একটা পাতা নিয়ে বসলাম, সেবক পাতে মহাপ্রসাদ দিতে লাগল, অমনি শ্রীল মহাশয় নিজ হাতে একটি গ্লাস হতে মাখা-প্রসাদ দিয়ে বললেন,— "খেয়ে ফেল, ভক্তের অধরামৃত দিয়েছি।" আমি বললাম,—"কোথাকার ভক্ত ?" অমনি বললেন,—"ধামবাসী সবারই অধরামৃত, এই উৎসবে যত ভক্ত খেয়েছেন তাঁদের অধরামৃত।" আমি বললাম,— "এই উৎসবের ?" তিনি বললেন,—"হাঁ, আমার শ্রীগুরুদেব আজ কত মুর্ত্তিতে প্রকট হয়েছেন জান ? দীন কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত ও গেরস্ত এইরূপ কত মুর্ত্তিতে এসে গ্রহণ করলেন, তারপর এ চিন্ময় ধাম, অপ্রাকৃত ধাম ! ধামবাসীও সব অপ্রাকৃত, প্রাকৃত বুদ্ধি করতে নেই। জানতো কুকুরের অধরামৃতও আমার শ্রীগুরুদেব খেয়েছেন ! কুকুরও ভক্ত। ধামের সবার অপ্রাকৃত দেহ। ধাম বাসীর বিচার করতে নেই।" আমি এই সমস্ত শুনে ভাবছি,—এরকম নিষ্ঠা, এত উন্নত ভাব নিয়ে কেউ কি জীবন যাপন করতে পারে !

আমি এই সব শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বহু সুকৃতির ফলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ পেয়েছি, এমন সুন্দর সুন্দর কথা শুনছি, কত স্নেহ ভালবাসা তাঁর কাছে পাচ্ছি, এই মনে ক'রে আনন্দে আমার হৃদয় ভরে যাচ্ছে। প্রসাদ পেয়ে তিনি বাইরে এসে চেয়ারে বসলেন, এমন সময় দেখলাম, গঙ্গা হতে কতকগুলো লোক স্নান ক'রে নাম করতে করতে আসছেন। আমি দৌড়ে গেটের কাছে যেতেই দেখি, সখীমা অনেক ভক্ত সঙ্গে স্নান ক'রে আসছেন। আমাকে দেখেই হাসলেন, বললেন,—"চল প্রসাদ

পেতে।” অমনি তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরের দিকে গেলাম। তাড়াতাড়ি সবার প্রসাদ পাবার পাতা হয়েছে। এঁনারা এখনও প্রসাদ পাননি। এঁনারাই সব পরিবেশন ক'রে উৎসবে ভক্ত বৃন্দকে প্রসাদ দিয়েছেন। সমস্ত দিন তাঁদের প্রসাদ পাওয়া হয়নি। সবার সেবা হয়ে গেলে তাঁরা স্নান ক'রে এলেন, এখন তাঁরা প্রসাদ পাবেন। রাত্রি তখন এগারটা হবে। আমাকেও কাছে একটি পাতা দিলেন, আমি বল্লাম,—প্রসাদ পেয়েছি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে। অমনি সখীমা বললেন,—“তাতে কি হয়েছে! আবার পাও-না।” আমি আর কোন দ্বিধা না-করে তাঁদের সঙ্গে বসে অল্প অল্প প্রসাদ পেলাম।

পরমানন্দে সবার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে যে যার আসনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের বারান্দায় আপন মনে বসে আছি, মঠ তখন প্রায় জন মানব শূন্য। হঠাৎ দেখছি, সখীমা একটা বাতি নিয়ে ধীরে ধীরে গেটের কাছে গেলেন, কৌতূহলবসে আমিও কাছে গেলাম, দেখলাম তিনি ভূমিষ্ট হয়ে গেটে প্রণাম করলেন। আমি ভাবছি এখানে কেন প্রণাম করছেন। রাত্রি তখন একটা, নিঝুম সব। কেবল শ্রীগোবর্দ্ধন কাকাকে দেখছি. শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাধির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর সখীমা ঠাকুরের চরণামৃত পেয়ে ধীরে ধীরে শ্রীগৌরহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের বারান্দায় এসে দণ্ডবৎ ক'রে তাঁর চরণামৃত পেয়ে, শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের বারান্দায় এসে দণ্ডবৎ ক'রে খুব চরণামৃত খাচ্ছেন,—বার বার পঞ্চপাত্রের হাতা দিয়ে মুখে ফেলছেন, কত যে প্রীতি কত যে আনন্দ তা আমি বলে বুঝাতে পারব না। আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই সব দেখছি। এখন তিনি বিশ্রাম করতে যাবেন, আমার দিকে তাকালেন; আমি কৌতূহল বসে জিজ্ঞাসা করলাম—“গেটে কেন প্রণাম করলেন? ওখানে তো ঠাকুর দেবতা কেউ নেই,” অমনি হেসে বললেন,—“এই যে যত ভক্ত বৈষ্ণব মঠে এসে প্রসাদ পেলেন,

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রীমতী ললিতাসখী দাসী

ওদের চরণধূলি গেটে আছে কিনা তাই দণ্ডবৎ ক'রে মাথায় রজ নিলাম। তিনি বললেন,—"ভক্তের দয়া না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম। ভক্তের পদধূলির মহিমা তখনও বুঝি নাই, ভক্তের কৃপার যে কত বড় মহীয়সী শক্তি, ভক্ত-পদ-রজ যে শ্রেষ্ঠ সম্বল এই ভক্তি পথের, সে কথা তাঁদের মুখ থেকেই শুনেছি প্রথম, আবার তাঁরা নিজেই আচরণ ক'রেও দেখিয়েছেন! মুখে শাস্ত্রের ভাল ভাল কথা, মহাজনের বাণী অনেকের মুখেই শুনি কিন্তু নিজে আচরণ ক'রে ক-টি লোকে আর দেখায়! শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও সখীমা নিজে আচরণ করেই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আমার পাষাণ হৃদয়ে সে বীজ অঙ্কুরিত হল কই? অভিমান রূপ পর্ব্বতের উপর বসে রইলাম, তাই বঞ্চিত হয়ে পড়েছি, সিঞ্চিত হতে পারলাম কই! তারপর সখীমা,—"যাও শোওগে,"—বলেই নিজের ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করলেন। আমি তাঁর বারান্দাতেই একপাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সিমেণ্টের উপরে গামছা বিছিয়ে নিয়েই আমি শুলাম আর অমনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মঙ্গল আরতির ঘণ্টা বাজল, ঘুম ভেঙ্গে গেল। সখীমা ও শ্রীল বাবাজী মহাশয় আগেই উঠেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় মঙ্গল আরতি দেখছেন আর সখীমা একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে মন্দির পরিক্রমা করছেন। সখীমা পরিক্রমা করেই পায়খানা বাড়ীতে চলে গেলেন। শৌচাদি সেরে স্নান ক'রে তিনি এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরের দিকে গেলেন,—তখন রৌদ্র উঠেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলেন,—কাছে একটা নারিকেল গাছ ছিল, আমি তার তলায় দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমায় ইঙ্গিত করলেন—তাঁকে দণ্ডবৎ করতে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে তেনাকে দণ্ডবৎ করলাম। সখীমা আদর করলেন আমায়।

এইরূপ ভাবে দিন কাটছে আমার।

আজ মঠে কালকের মত আর অত লোকজন নাই। উৎসব শেষ হয়েছে, আবার শুনতে পেলাম—কাল শ্রীগৌরহরি দাস মহান্ত বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব মহোৎসব;—বিরাট নগর কীর্ত্তন হবে এবং শ্রীপাদের সঙ্গে সবাই শ্রীনবদ্বীপ ধামের সব ঠাকুর বাড়ী পরিক্রমা ক'রে আসবেন ।

আজ বিকেলে নাট মন্দিরে ভাগবৎ পাঠ হবে, গান কীর্ত্তন হবে। চারটা বাজল, এখন ঠাকুর শ্রীরাখালানন্দ শাস্ত্রী ভাগবৎ পাঠ করবেন; অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি,—এই কথা শুনে তাঁর পাঠ শুনবার ইচ্ছা হল; আমিও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে এসে পিছনে বসলাম ও তাঁর পাঠ শুনলাম। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন! সমস্ত লোক নীরব নিথর হয়ে তাঁর মুখে শ্রীগৌর কথা শুনতে লাগলেন। পাঠের পর গান হবে। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরলেন। অপূর্ব্ব মধুর তাঁর প্রাণ-মাতান কণ্ঠ। তাঁর কণ্ঠ হতে যেন মধুবর্ষণ হতে লাগল। অসংখ্য নারী পুরুষ তাঁর গান কীর্ত্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় চোখের জলে ভাসছেন! গানটি এখনও আমার মনে আছে;—"এমন মধুমাখা হরিনাম নিতাই কোথা হতে এনেছে। এ-নাম একবার শুনে আমার হৃদয়-বীণ আপনি বেজে উঠেছে।" ইত্যাদি। আবার শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী গান ধরলেন, নিজ রচিত গান একটি,—"কাঁচা সোনার বর্ণ ধরেছে, হল করা তাঁর রূপের বাহার কেবল বাহিরে। ঢাকলে কি আর স্বভাব চাপা যায়, আঁকা বাঁকা চাল চলন আর বাঁক নয়নে চায়, বলবো কি সে এমনি হেসে পরিচয় দেয় মিল কোরে।" ইত্যাদি। তারপর আর একজন গাইলেন তাঁর নাম অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য, সুন্দর চেহারা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা কিন্তু বড় মধুর আকর্ষণ তাঁর গানে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর গান শুনছেন আর অঝোর নয়নে

ঝুরছেন। তাকিয়ে চারদিকে দেখছি সবাই কাঁদছে। কি প্রাণ মাতান গান! কি প্রীতি যুক্ত গান! এখনও সে গানটি সম্পূর্ণ আমার মনে আছে! গানটি এই—"গোরারূপ সদাই পড়ে মনে। আমি ভুলিতে যতন করি বেদনাতে মরি প্রাণে। দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবেশী, তবু গোরা ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে। গোরালাগি এত জ্বালা তবু সে মোর জপমালা কি-গুণ করেছে গোরা হেলা হল কুল মানে।" এই গানটি সবাইকে যেন ব্যাকুল করে ফেললো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবে বিভাবিত হয়ে পড়লেন। একটু পরেই ভাব সম্বরণ হল, কীর্ত্তনও শেষ হল। আরতির সময় ঘণ্টা বেজে উঠলো, সবাই আরতি দর্শন করতে লাগলেন। শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু সরে এসে আমতলায় দাঁড়ালেন, আমি গিয়ে দণ্ডবৎ করলাম। আমায় তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে নূতন এসেছি। তিনুদা'র মতনই ছেলে মানুষ আমি, তাই তাঁরা খুব স্নেহ প্রীতি করতে লাগলেন। সেদিন রাত্রে দীনেশ বাবু অনাথ বাবু, সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সখীমার কাছে প্রসাদ পেলেন। আমিও তখন তাঁদের কাছে ছিলাম।

তারপর ধামের কত গোস্বামী সন্তান এলেন, সখীমা তাঁদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা ক'রে বসতে আসন দিলেন এবং তাঁদের প্রসাদও পেতে অনুরোধ করলেন। ফল, মুল, লুচি মিষ্টি প্রভৃতি পাকী প্রসাদ তাঁরা গ্রহণ করলেন। এই রকম সেদিনটা আনন্দে কেটে গেল। রাত্রিতে আমরা সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলাম। সকাল হল, মধুর নামধ্বনি কর্ণে এসে পৌছিল, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল,—পরিক্রমা ক'রে নাম কীর্ত্তন করছেন সবে। মুরারী দা', গোপী দা', রমণদা', ছোট রমণ দা', জানকী, মদনদা', শ্রীরাধাচরণ দাদা, কানাইদা', নিতাই ও তারকদা' সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকেন।

ভগবানদা' ও ছোট রমণদা' খোল বাজাচ্ছেন আর সবাই নাচতে নাচতে মন্দির পরিক্রমা করছেন, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় নিজ কুটির হতে বের হয়ে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। প্রভাতি সুরে নিজেই নাম ধরলেন। নামের ধ্বনিতে প্রাণমন সবার কেড়ে নিল! যে যেখানে ছিল ছুটে আসতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠ ধ্বনি শুনে নারী পুরুষ সবাই ছুটে ছুটে আসল! দু'তিন বার পরিক্রমা ক'রে নাম বন্ধ করলেন, আর বললেন—"শীঘ্র শীঘ্র নগর কীর্ত্তনের যোগাড় কর।" তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় নিজ ভজন কুটিরে গিয়ে বসলেন। সখীমা আবার তাঁর কাছে এলেন। শ্রীপাদ তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন ও নগর কীর্ত্তনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

আমি নাট মন্দিরে গিয়ে দেখি অসংখ্য লোক নিশান, খুন্তি নিয়ে প্রস্তুত হোচ্ছেন, নগর কীর্ত্তনে যাবেন বলে। অসংখ্য ফুলের মালা শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয়ের হাতে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে এসে বৈঠকখানায় দণ্ডবৎ করলেন তারপর শ্রীমহান্ত মহারাজ ও শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাজে দণ্ডবৎ ক'রে নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ালেন; আর চারিদিক থেকে—হরিবোল—ধ্বনি উঠতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীহস্তে বড় নিতাই দাদা করতাল দিলেন। মদনদা', ছোট রমণদা', হরেকেষ্ট দাদা, ভগবান দাদা, কিঙ্কর কাকা প্রভৃতি বৈষ্ণব বৃন্দ তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনাসক্ত বায়ান। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে —নিতাই গৌর হরিবোল—বলে দণ্ডবৎ করলেন আর সবাই হরি বোল—বলে দণ্ডবৎ করে দাঁড়ালেন। মধুর মৃদঙ্গ করতাল তালে তালে বেজে উঠল!

শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয় প্রথমে ঠাকুরদের মালা চন্দন পরালেন তারপর মৃদঙ্গে ও খুন্তিতে; অতঃপর সমস্ত গোস্বামীদের গলায় মালা পরালেন ও কপালে চন্দন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

দাদা মহাশয়ের গলায় মালা ও কপালে চন্দন দিয়ে, তিনি যত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছিলেন সবাইকে মালা চন্দন দিলেন তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দিয়ে তবে তার পরিষদ দিগকে দিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীগুরু প্রেমানন্দে—নিতাই গৌর হরিবোল—বলে দণ্ডবৎ করলেন, মধুর মৃদঙ্গ বাজতে লাগল। হরি হরি বোল—চারিদিকে সবাই বলতে লাগলেন। হুলু হুলু ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হতে লাগল। মৃদঙ্গ বাজনা শেষ হল; আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে—নিতাই গৌর হরিবোল—বলেই দণ্ডবৎ করতঃ উঠে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করতে লাগলেন,—"এস নদীয়ার চাঁদ গোরা, এস সঙ্কীর্ত্তন পিতা"—এই সঙ্কীর্ত্তন ক'রে মহাপ্রভুকে ও পারিষদবৃন্দকে আহ্বান করলেন; প্রায় আধ ঘণ্টা এই কীর্ত্তন করলেন তারপর—"প্রকট অপ্রকট লীলার দুইত বিধান, প্রকট লীলায় করেন হরি স্বয়ং নৃত্য গান। অপ্রকট নাম রূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কীর্ত্তন বিহারী হয়ে আছেন বর্ত্তমান। হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাহি জানি। শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র মানি!" —বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে! শরীর থর থর করে কাঁপছে! শিমুলের কাঁটার মত শরীরে পুলকাবলী! শরীর এমন কাঁপতে লাগল যে মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যাবেন—অমনি শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয় পিছন থেকে তাঁকে ধরে দাঁড়ালেন। প্রায় ২০ মিনিট কাল এমনি ভাবে বিভাবিত হয়ে রইলেন, একটু ভাব সাম্য হোলে আবার গাইলেন,—"হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাহি জানি। শ্যাম সুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র মানি। সেই হরি গৌর হরি নদীয়া বিহরে। হরে কৃষ্ণ নাম প্রেমে জগৎ নিস্তারে। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর। সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের কুমার! গদাধরের বামে শ্রীবাস নরহরি। চৌষট্টি মহান্ত দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি। চারিদিকে পারিষদ মণ্ডলী করিয়া। তাঁর

মাঝে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া। সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া।" তিনি যেই এই শেষ কথাটি বললেন, অমনি হুঙ্কার দিয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন, লম্ফ দিয়া প্রায় দুই হাত উপরে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছে! ভাবাবেশে কেবল উঠছেন আর পড়ছেন! শ্রীবিহারী দাস বাবাজী মহাশয় ও নিতাইদা' তাঁকে খুব সাবধানে আগলে রেখেছেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের এই সকল সাত্ত্বিক ভাব দর্শন ক'রে চারিদিকেই হরিবোল ধ্বনি—উত্থিত হল,—হুলু হুলু ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হতে লাগল। চারিদিক হতে ফুলের পাপড়ি বর্ষিত হল সে যে কি প্রেমের ঢেউ উঠল তা' আমি বলে বা লিখে ব্যক্ত করতে পারবো না!

শ্রীবসন্তদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীশ্যামদাস বাবাজী, শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী ও সমস্ত গোস্বামিবৃন্দ পরমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ভাব একটু শান্ত হল আবার কীর্ত্তন ধরলেন,—"সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া। হরে কৃষ্ণ নাম প্রেম যান বিলাইয়া। ব'লে আবার বল হরি নাম আবার বল, মধুর এই হরে কৃষ্ণ নাম আবার বল।" নাট মন্দিরে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ ক'রে বের হলেন। নিশান খুন্তি আগে চলেছেন। গোস্বামিগণ ক্ষুন্তি নিয়েছেন, দুই ধারে মৃদঙ্গ বাদক বাজাতে বাজাতে চলেছেন—তাঁদের পিছনে শ্রীল বাবাজী মহাশয়, তাঁকে ঘিরে পারিষদবৃন্দ চলেছেন এই নাম করে—"আবার বল হরি নাম আবার বল, মধুর হরে কৃষ্ণ নাম আবার বল।" এইরূপ ভাবে সমাজ বাড়ী পরিক্রমা ক'রে, শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ ক'রে, আবার নাম ধরলেন,—গৌর হরি হরি বোল। এই নাম ধরে কিছুদূর এগিয়ে বৈঠকখানা ঘরে দণ্ডবৎ ক'রে আঙ্গিনায় আসলেন। আর অমনি মাতন আরম্ভ হল;—গৌর হরি হরি বোল, প্রেম দাতা নিতাই বলে গৌরহরি হরি বোল। অপূর্ব্ব

নৃত্য সবাই আরম্ভ করলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা এইরূপ মধুর নাম ও নৃত্য হল। চার পাঁচ জনার ভাব হয়ে গেল,—মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

তারপর শ্রীপাদ নাম ধরে গেটের বাহির হলেন। অসংখ্য নর-নারী আকুল প্রাণে চলেছেন তাঁর কীর্ত্তনের সঙ্গে। সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে আকুল প্রাণে চলেছেন! আবার অনেকে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করবেন ব'লে আগেই গিয়ে পেছনে হেঁটে চলেছেন। কি মধুর দৃশ্য! সবারই মুখে হরি নাম। প্রায় হাজার লোকের মুখে এই নাম ধ্বনি উঠছে। যিনি আসছেন তিনি এসে নামে যোগদান করছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে শ্রীবাস আঙ্গিনায় এসে দণ্ডবৎ করলেন। তারপর নাটমন্দিরে কীর্ত্তন করতে লাগলেন; শ্রীল গৌরচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীল চৈতন্যচাঁদ গোস্বামী মালা চন্দন সবাইকে দিলেন। কীর্ত্তন নর্ত্তন আরও হল, খানিকক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে তারপর নদের পথে বের হলেন! সে যে কি আনন্দ তা বলে বোঝাতে পারবো না। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একখানা সাদা গামছা দিয়ে মস্তক ঢেকেছেন,—কানের পাশ দিয়ে গামছাখানা ঘোরান, চাদর বেড়দিয়ে পরা, বেশ এঁটে সেঁটে পরা! দু' হাত তুলে হেলে দুলে তিনি নৃত্য ক'রে চলেছেন, পারিষদ সকলও নৃত্য করছেন। কি মধুর তাঁদের নৃত্য ভঙ্গী এই নদের পথে! আবাল বৃদ্ধ বনিতা সারি সারি চলেছে তাঁদের সঙ্গে, এই কীর্ত্তন নর্ত্তন দেখবার জন্য। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে মৃদু হাসির লহরী উঠছে, আর অপূর্ব্ব নৃত্য রঙ্গে চলেছেন। সে যে কি মাধুরী বর্ষণ হচ্ছে তার উপমা আমি কি দিয়েই বা দিব। লেখনী স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। নৃত্য করতে করতে শ্রীপোড়ামা তলায় এসে দণ্ডবৎ করলেন। সেখানে খুব নৃত্য কীর্ত্তন হল।

তারপর ওখানে একটী চৌমাথায় দাঁড়িয়ে একটি পদ ধরলেন।

পারিষদ সব দোয়ারকি করতে লাগলেন। কীর্ত্তনটি এই—"পাষণ্ড দলন বাণ নিত্যানন্দ রায়রে। নিতাই আমার আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় রে।" ইত্যাদি। কত আঁখর সমন্বিত ক'রে কি মধুর নিতাই-গুণ গেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কীর্ত্তন নর্ত্তন ক'রে শ্রীহরি সভার গৌরের মন্দিরে নাচতে নাচতে রওনা হলেন। বড় মধুর ভঙ্গীতে নৃত্য করতে করতে চলেছেন! সে নৃত্য ভঙ্গীতে যে কি রসালতা রয়েছে তা আমি কি করেই বা বলবো! আমার মনে হচ্ছে,—হরিসভার নাচা-গৌর দেখতে চলেছেন তাই বুঝি তাঁর এমন মধুর নৃত্য-ছন্দ! কীর্ত্তন করতে করতে মন্দিরে আসলেন আর মন্দিরের সেবাইত শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ গোস্বামীকে দণ্ডবৎ ও শ্রীগৌর সুন্দরকে দণ্ডবৎ ক'রে দাঁড়ালেন; আবার মধুর কীর্ত্তনের রোল উঠল, প্রায় আধ ঘণ্টা কীর্ত্তন নর্ত্তন ক'রে সবাই একটু শান্ত হলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরলেন,—"আমার গৌর সুন্দর নেচে যায়! তোরা দেখবি যদি আয় নাগরি, নেচে যায় প্রাণ গৌর হরি, দেখবি যদি আয় নাগরি, গৃহ কাজ তো সদাই আছে, গৌর নটন দেখবি আয়, গৃহ কাজে পড়ুক বাজ, দেখবি গোরা রসরাজ"—বলেই পদ ধরলেন,—"ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে, চরণ উপর দুলে যেছে কোচাগো।" অমনি কি মধুর আঁখর দিচ্ছেন,—বসন ভেদি কিরণ উঠছে, গৌরের কাঁচা-সোনার অঙ্গের বরণ বসন ভেদি কিরণ উঠছে, চরণ উপর দুলিয়ে যেছে কোঁচাগো। বাঁকমল সোণার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা গো। বাঁকমল সোনার নূপুর বেজে যেছে মধুর মধুর,—বলতে বলতে বড় মিষ্টি হাসির মৃদুমন্দ সুবাস যেন এনে দিলেম! আবার আঁখর দিলেন,—নূপুর বাজে মধুর মধুর, গোরার রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর, নূপুর বাজে মধুর মধুর, মন মজাতে নদীয়া বধুর, নূপুর বাজে মধুর মধুর রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা গো। বলতে বলতে যেন ঢলে মাটিতে পড়ে যাবেন এমনি মনে হচ্ছে,

থর থর অঙ্গ কাঁপছেন, এই দেখে নিতাই দাদা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আগলে ধরলেন,—আবার আকুল হয়ে বলছেন, "রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা গো। ভুবন মুরছা পায়, হেরি ঐ নবরসের গোরারায়, ভুবন মুরছা পায়।" ঠিক এই আঁখরটি দিবার সঙ্গে সঙ্গেই খুব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল, কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আবেশে ঐ শ্রীহরি সভার গৌরের সামনে পড়ে মূর্চ্ছা গেলেন! একটু দূরে একজনা ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন, মুখ দিয়ে রক্তোদ্গম হচ্ছে! একজনা তাঁর মুখে ও মস্তকে জল সিঞ্চন করছেন,—তিনি ঐ শ্রীহরিসভা গৌরের সেবাইত শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ গোস্বামী, তাঁর নাকি কীর্ত্তনে এই রকম আবেশ হয়! —মুখ দিয়ে রক্তোদ্গম হয়! একেবারে উত্তান হয়ে পড়ে আছেন, মধ্যে মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করছেন।

কীর্ত্তন করতে করতে সাত্ত্বিক ভাব সকল শ্রীল বাবাজী মহারাজের মধ্যে এসে আবির্ভূত হচ্ছে! অমনি তিনি ভাব ধারণ ক'রে কীর্ত্তন করছেন কিন্তু কিছুতেই ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ছেন না। ভাব ধারণ করবার অসীম শক্তি তাঁর দেখেছি। আবার পদ ধরলেন,—"দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল",—আঁখর দিচ্ছেন, "যেন চামর দুলছে, চাঁচর চুল নয়, যেন চামর দুলছে, স্বর্ণ সুমেরু শিখরে, যেন চামর দুলছে, মজালে মজালে কুল, চাঁচর চুলে চাঁপার ফুল। কুঁদ মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটাগো। ও যে কুলবতীর কুলের খোঁটা, চাঁচর চুলে ফুলের ঝোঁটা, কুলবতীর কুলের খোঁটা। এই পদ শুনতে শুনতে দেখতে পেলাম,—কয়েক মূর্ত্তি মাথায় কাপড় দিয়ে, অপরূপ নৃত্য ভঙ্গি করছেন, তাঁরা যেন সব নদীয়াবাসিনী রমণী, গৌর সুন্দরকে দেখে এমনি ভাবে রসের ভরে নৃত্য করছেন, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে আছি।

এ-সব ভাব তখন আমি কিছুই বুঝিনা, শেষে বৈষ্ণব মুখে

শুনে বুঝেছি। লোচন দাসের পদাবলীতে এই সব নাগরী ভাবের পদ পড়েছি। —"চন্দন মাখা গোরাগায়, বাহু তুলিয়ে চলে যায়, কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটাগো।"—এই বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় চোখের জলে ভাসছেন, কত প্রীতিতে আঁখর দিচ্ছেন—"একেতো সহজ রূপেই ভুবন ভোলে, তাতে আবার চন্দন মাখা গোরা গায়, চলে যায় আর লয়ে যায়, জাতি কুল লজ্জা ধৈর্য্য, চলে যায় আর লয়ে যায়, কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা গো!" অমনি আঁখর দিলেন,—"ওতো নয় চন্দনের ফোঁটা, ওযে কুলবতীর কুলের খোঁটা, মদন বিজয়ী ধ্বজা, চন্দনের বিন্দু নয় ওযে মদন বিজয়ী ধ্বজা, হার মেনেছে মদন রাজা। মদনের বড় গরব ছিল, জগমাঝে সুপুরুষ বলে, মদনের বড় গরব ছিল সে গরব ভঙ্গ হল, গৌরাঙ্গ মূরতি হেরে, সে গরব ভঙ্গ হল, বিকাইছে গোরার পায়, কামের রতি ছাড়ি পতি, বিকাইছে গোরার পায়,—প্রাণপতি গৌরাঙ্গ বলে, হেরি ঐ শচী দুলালে" যেই এই কথাটি বলা আর অমনি মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল, আর তার সঙ্গে অপরূপ নৃত্য সবাই আরম্ভ করলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট এই মাতন কীর্ত্তন চলতে লাগল। তারপর মৃদঙ্গের মান পড়ল অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় পদ ধরলেন,—"বাহুর হেলন দোলন দেখি, হাতীর শুণ্ড কিসে লিখি, নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা গো।" অতি সুন্দর আঁখর দিচ্ছেন,— "গৌর গড়েছে কোন বিধি, নিঙ্গাড়ি অখিল রসের নিধি, গৌর গড়েছে কোন বিধি, গড়ে বুঝি দেখে নাই সে, দেখলে ছেড়ে দিত না, প্রাণ পুতুলী করে রাখত, দেখলে ছেড়ে দিতনা, কিন্তু গৌর রাজ্যে উল্টো রীতি, একা ভোগ করতে নারে, গৌর রাজ্যে উল্টো রীতি, তাইতে ছেড়ে দিয়েছে তারে, জগজনে দেখবে বলে, তাইতে ছেড়ে দিয়েছে, ভুবন মোহন গোরা, জগজনে দেখবে বলে।" যেই বলা আবার অমনি মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল, সবাই যেন পাগল হয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও খানিকক্ষণ নৃত্য করে শান্ত হয়ে আবার ধরলেন, "মধুর মধুর কয়গো কথা শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা গো।" আবার আঁখর দিলেন,—"অমিয়ার প্রস্রবণ হৃদিকর্ণ রসায়ন, অমিয়ার প্রস্রবণ। শ্রীগৌরাঙ্গ মুখের বচন, অমিয়ার প্রস্রবণ, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা গো। যেন চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝরিল, গৌর হরি হরি বলিল; যেন চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝরিল,—মধুর মধুর গৌর কিশোর মধুর মধুর নাট। মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট। সকলই মধুর গো, মধুর গৌরাঙ্গের সকলই মধুর গো, এবার সবাই মত্ত মধুরে, মধুর গৌরাঙ্গ হেরে, সবাই মত্ত মধুরে, স্বভাব জাগান গোরা, প্রভু নিতাই পাগল করা।"—বলতেই অপূর্ব্ব মাতন আরম্ভ হল। একটু ভাব সামলিয়ে গাইছেন,—"এমন কেউ ব্যথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে, নয়ন ভরে দেখি রূপ খানি। লোচন দাস বলে, কেনে নয়ন দিলি গৌর পানে, দুকুল খেলি আপনা আপনি।" আবার আঁখর দিলেন,—"আমরা কুলের নারী কইতে নারি, গৌর তুমি দাঁড়াও বলে বলতে নারি; মনে করি,—হেরিরূপ মাধুরী! দাঁড়াও বলে বলতে নারি, আমাদের শাশুড়ী ননদী বৈরী, দাঁড়াও বলে বলতে নারি। দেখে যা লো ও নাগরী, গৌর নটন দেখবি আয়। গৃহ কাজতো সদাই আছে। গৌর নটন দেখবি আজ, গৃহ কাজে পড়ুক বাজ, দেখবি গোরা রসরাজ।"

এই সমস্ত অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ক'রে আবার নাম ধরলেন,—"প্রেম দাতা নিতাই বলে গৌর হরি বোল।"—এই নাম ধরে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ ক'রে আবার নদের পথে সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে চললেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাত ঊর্দ্ধে তুলে নাচতে নাচতে চলেছেন আর পারিষদরাও ঠিক অমনি ভাবে চলেছেন। মদনদা', হরেকেষ্ট দা', ছোট রমন দা' ও ভগবান দা' যে কি মধুর মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে চলেছেন তা লিখে বুঝান যাবে না।

চারিদিক থেকে যেন ভক্তেরা সব অলিকুলের মত ছুটে আসছে গুণ গুণ রব ক'রে। মনে হচ্ছে গৌর কিশোর নেচে চলেছেন, পাশে নিতাই চাঁদ প্রেম হিল্লোলে হেলে দুলে চলেছেন,—ঐ রূপ-মাধুরী পান করবার জন্যই বুঝি ভকত ভ্রমর উড়ে উড়ে মধুপান করবার জন্য ছুটে আসছে! হেলে দুলে প্রেম তরঙ্গে নাচতে নাচতে সবাই মহাপ্রভুর বাড়ী এসে পৌঁছে গেলেন, অপরূপ কীর্ত্তন নর্ত্তন আরম্ভ হল। প্রায় আধ ঘণ্টা কীর্ত্তনে সবাই দেহস্মৃতি ভুলে গেছেন। অপরূপ নৃত্য ভঙ্গী! তাতে আবার অপরূপ মৃদঙ্গ-ধ্বনি! আমি একপাশে দাঁড়িয়ে এই অভিনব কীর্ত্তন নর্ত্তন দেখছি। আবার দেখছি,—মেয়েরাও দূরে নাচছে। ভদ্র ঘরের সব বউ তাঁরাও নাচছেন! তাঁদের লজ্জা সরম যেন কোথায় চলে গেছে! কেহ কাঁদছেন, কেহ হাত উর্দ্ধে তুলে নাচছেন। আমি ভাবছি,—এ কি-ব্যাপার,—দুটি কুলবধূ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, আঁখির জলে ভেসে যাচ্ছেন, তারপর একটু স্থির হয়ে বসে শুধু কাঁপছেন, আর দুই চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে; "গৌর হরি গৌর কিশোর" বলে কত আর্ত্তস্বরে মৃদুমন্দ কথা বলছেন! কথাগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে যেন কাউকে বলছেন। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, এ সব কি-ব্যাপার! ভাবলাম, এঁরা বোধ হয় শ্রীগৌর কিশোরকে কীর্ত্তনের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। আবার ভাবছি, তিনি যদি কীর্ত্তনে আসতেন তবে আমিও তো কীর্ত্তনে রয়েছি, তাঁকে দেখতে তো পেতাম; কিন্তু কই! তবে এ কি করে হয় তাহা আমার বিচারে স্থির হল,—এঁরা নিশ্চয়ই স্মরণে তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, সবাই দেখতে পাবে না। ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী যাঁরা তারাই দেখতে পাবেন। মেয়েছেলে যে কীর্ত্তনে এমন অভিভূত হয়ে পড়েন এ আর কখনও দেখিনি। আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন পেলাম!—কীর্ত্তনের এমন শক্তি যে মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়, এমন কি দেহ গেহ

পর্য্যন্ত সে ভুলে যায়! নারীর লজ্জাই প্রধান তাও এঁরা ভুলে গেছেন! বুঝলাম. সঙ্কীর্ত্তনের মহিমাই এই রকম। পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে একদিন এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন,—"হাঁ, এমনই হয়, সঙ্কীর্ত্তন রাসমণ্ডল, শ্রীবৃন্দাবনে যেমন শ্রীরাধাগোবিন্দ রাসে নৃত্য করেছেন অসংখ্য গোপী লয়ে তেমনি এবার তাঁরাই এসেছেন এই নদীয়া ধামে। রাধা ও কৃষ্ণের দুই তনু একীভূত হয়ে, একসঙ্গে মিলিত হয়ে গৌররূপে আবির্ভূত হয়েছেন এই নবদ্বীপ ধামে। সঙ্গে সবাই এসেছেন! তিনি এসেছেন যখন তখন ধামও প্রকটিত হলেন! পারিষদও সব আবির্ভূত হয়েছেন। নন্দ নন্দন এবার শচীনন্দন, বৃন্দাবনে শ্রীযমুনা ছিল এবার নদীয়াতে সুরধুনী, বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি এবার নবদ্বীপে নামের ধ্বনি। বৃন্দাবনে বাঁশীর তান এবার নদীয়াতে হরির গান, বৃন্দাবনে রাখাল সনে ছুটোছুটি, এবার নদীয়াতে লুটোপুটি। বৃন্দাবনে রাসমণ্ডল, এবার নদীয়াতে সংকীর্ত্তন।" এই সব অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত একদিন তাঁর মুখে শুনে কৃতার্থ হয়েছিলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে খুব কীর্ত্তন নর্ত্তন ক'রে, শ্রীল বাবাজী মহাশয় সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাজ দর্শন ক'রে দণ্ডবৎ করলেন। একজন বৃদ্ধ সেবাইত তাঁকে একটী প্রসাদি মালা পরালেন তারপর তিনি ওখান থেকে রওনা হয়ে শ্রীনিতাই চাঁদের মন্দিরে এলেন। এসেই হুঙ্কার দিয়ে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন! ভাবাবেশে মাটি থেকে দুহাত উপরে উঠে পড়ছেন ; কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের রোল উঠল! কি যে অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ হল, তা' আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। মধ্যে মধ্যে অনেকেই "হা নিতাই" বলে আকুল ক্রন্দন করছেন। কেহ-বা রজে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কেহ-বা পড়ে বুক চাপড়াচ্ছেন, কেহ-বা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন আর আপন মনে কথা বলছেন! কীর্ত্তনে সে যে কি-উন্মাদনা এসেছে তা আমি কি করেই বা বর্ণনা করব!—স্মৃতি মানস পটে সমস্ত জেগে উঠছে যদিও অনেক

দিন হয়ে গেছে। অতিরঞ্জিত কথা নয় এ-সব! কেহ যেন পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবেন না।

তারপর কীর্ত্তন একটু শান্ত হল! নিতাই চাঁদের মুখপানে তাকিয়েই শ্রীল বাবাজী মহাশয় অঝোরে ঝুরছেন! সাত্বিক ভাব—অশ্রু কম্প পুলকাবলী তাঁর অঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে, আমি অনিমিখ নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। যেই একটু তাঁর ভাব শান্ত হল অমনি কীর্ত্তন ধরলেন,—"দেখরে নয়ন ভরি নিতাই সুন্দররে। গৌরাঙ্গ প্রণয় রসময় পুরন্দররে। এই পদ দুটি গাহিতেই অপূর্ব্ব আঁখর স্ফূর্ত্তি হল, কীর্ত্তন করতে লাগলেন,—"গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই। প্রেম বিনে আর কিছুই নাই, গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই। মুখে প্রেম-প্রেম সবাই বল, কামকে দেখেই প্রেম বল, প্রেমের অনুভব নাই তাই কামকে দেখেই প্রেম বল। প্রেমের মূরতি আমার প্রভু নিত্যানন্দরে। প্রেমে চলে প্রেমে বলে, প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে, প্রেম বাহু পসারিয়ে প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে, আয় পতিত আয় বলে, প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে। বয়ান ভাসে প্রেমজলে, আয় পতিত আয় বলে বয়ান ভাসে প্রেম জলে, ধেয়ে যায় পতিতের কাছে, কেঁদে কেঁদে তারে পুছে, আর কে কোথা পতিত আছে? আমি বিকাইব প্রেম দিব মুখে গৌর হরি বোল্।" যেই এ-কীর্ত্তন গাইতে গাইতে বললেন অমনি হুঙ্কার গর্জ্জন করে নাচতে লাগলেন, সমস্ত পারিষদ নাচতে লাগলেন; সে যে কি উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ হল তা লিখে বোঝান যাবে না,—থর থর করে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীঅঙ্গ কাঁপছেন দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে! নিতাই দাদা শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে আগলে ধরে আছেন। অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন হচ্ছে,—আমি এ-প্রেম কাহিনী কতটুকুই বা বুঝি, যা দেখেছি তাহাই লিপিবদ্ধ করছি। বহুক্ষণ এইরূপ নৃত্য কীর্ত্তন ক'রে তারপর নিতাই চাঁদকে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে কীর্ত্তন সঙ্গে ভজন কুটিরে রওনা হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন

ক'রে দণ্ডবৎ ক'রে সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে রঙ্গে সুরধুনী কুলে আসলেন। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অপূর্ব্ব হাসি দেখতে পেলাম। কীর্ত্তন ধরলেন,—"যায় নিতাই হেলে দুলে, সুরধুনীর কূলে কূলে। গৌর হরি বোল বলে যায় নিতাই হেলে দুলে, হেম দণ্ড বাহু উর্দ্ধে তুলে যায় নিতাই হেলে দুলে," এই সব কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও হেলে দুলে নাচতে নাচতে চলেছেন, পারিষদ সবও নাচতে নাচতে চলেছেন! কি অপূর্ব্ব নটন ভঙ্গী, কি অপূর্ব্ব হেলন দোলন! অপূর্ব্ব মৃদঙ্গ বাজছে! কি মধুর মৃদঙ্গের বোল! হরেকেষ্ট দাদা ও কিঙ্কর কাকা আবার খোল ধরেছেন,—এমন মধুর মৃদঙ্গ বাজান আর এমন মধুর নৃত্য কখনও দেখিনি, বোধ হয় আর কখনও দেখতে পাবো না! সমস্ত নরনারী একেবারে দিশে হারা হয়ে নৃত্য করতে করতে শ্রীবাস আঙ্গিনার ঘাটে এসে পৌঁছিলেন।

সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে নৃত্য কীর্ত্তন হল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে সুরধুনীর দিকে তাকিয়ে কীর্ত্তন ধরলেন,—"কে যাবি কে যাবি ভাই ভব সিন্ধু পাররে। কে পারে যাবি আয়রে, আমার দয়াল নিতাই ডাকে কে পারে যাবি আয়রে। ধন্য কলি-যুগেতে চৈতন্য অবতার রে। আমার চৈতন্যের ঘাটে অদান খেয়া বয়রে। জরা অন্ধ বধির অবধি পার হয়রে। লাগেনারে পারের কড়ি, বাহু তুলে বলে নিতাই কাণ্ডারী, লাগেনারে পারের কড়ি। আমি পার করে দেই ভববারি। জাতি কুল অধিকার বিচার না করি, আমি পার করে দেই ভববারি। আমি এনেছিরে প্রেমের তরী। আমি লয়ে ফিরি প্রেমের তরী। এই ভব পারের ঘাটে ঘাটে লয়ে ফিরি নামের তরী। আমি পার করে দেই ভববারি। শুধু মুখে বললে গৌর হরি, পার করে দেই ভববারি।" অমনি অপূর্ব্ব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল! খানিকক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তন করে সমাজবাড়ীতে এলেন,—বেলা তখন দুইটা বেজে গেছে; পরিক্রমা ক্রমে নাট মন্দিরে এসে কীর্ত্তন ধরলেন,—"নগর ভ্রমিয়ে

আমার গৌর এল ঘরে। গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে। অমনি ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে। বলে কে এলরে, ও কেরে, ও কেরে, আমার বাপ ঘরে এলরে, আমার বাপের ঠাকুর এলরে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক এল, আমার আঁধার ঘর হল আলো, আঁধার ঘরের মাণিক এল। নদীয়া বাসিনী দেখে যালো আমার আঁধার ঘরের মাণিক এল! আমি দিবসে আঁধার দেখি, ও চাঁদ মুখ না পেখি দিবসে আঁধার দেখি।"—এই সব আঁখর দিচ্ছেন আর অমনি চারিদিক থেকে ক্রন্দন উঠতে লাগল। তাকিয়ে দেখি যে মেয়েরা সব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! ভাবলাম—ওরা সব মা কি-না তাই তাঁদের হৃদয়ে বাৎসল্য-ভাবের আবির্ভাব হয়েছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও বাৎসল্য-ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ছেন, নইলে তাঁর মুখ দিয়ে এমন সুন্দর বাৎসল্য-প্রেমের কথা কেমন করে আসবে!

আমি ভাবছি,--শ্রীল বাবাজী মহাশয় তো পুরুষ দেহধারী! তিনি এ-সমস্ত কথা কি করে বলছেন! শ্রীল বাবাজী মহাশয় তো শচীমা নন, তবুও অবিকল যেন তাঁরই কথা।" আমি ঠিক বুঝতেও পাচ্ছিনা! —অমনি মনে হল, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে শুনেছি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নাকি সমস্ত ভাবেরই আধার,—তবে তাঁর রাধা-ভাবের প্রাবল্যই নাকি সব চেয়ে বেশী। যখন সমস্ত ভাবেরই আধার তিনি, তখন তাঁর ভক্তের ভিতরও সেই সমস্ত গুণ আসতে পারে, এতে আর বিচিত্রতা কি?—এই সব কথা আমার তখন মনে উঠল। আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় আঁখর দিচ্ছেন,— "এল শচীর নয়ন তারা, নদীয়াবাসিনী দেখে যা তোরা এল শচীর নয়ন তারা! বলে এ-কি খেলারে, শচীমাতা গৌরের অঙ্গপানে চেয়ে বলে এ-কি খেলারে! সোনার অঙ্গে ধূলা মাখা এ-কি খেলারে! মা এ-কি সয়রে, দুঃখিনী মায়ে দুঃখ দিতে তোর সোনার অঙ্গে ধূলা মাখা, মা এ-কি সয়রে। মা এ-কি সয়রে! কেবা

দিয়েছে, তোর সোনার অঙ্গে ধূলা মেখে কেবা দিয়েছে। চেয়েও কি দেখে নাই, ভুবন ভোলা বদন খানি, চেয়েও কি দেখে নাই! দেখলে ধূলা দিতে নারিত। ধেয়ে এসে হিয়ায় ধরিত।”

এই সব কথা বলতে বলতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চোখের জল উপচে পড়তে লাগল। খুব কাঁদতে লাগলেন, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, আর বহুক্ষণ কীর্ত্তন কোর্ত্তে পারলেন না, থর থর করে কাঁপতে লাগলেন; তারপর আবার শান্ত হয়ে বলতে লাগলেন,—“অভিমানে শচীমাতা বলেন, ‘আর যেতে দিব না, আমি তোর হাতে সঁপে দিলাম, নরহরি তুই কোথায় ছিলি। পরাণ পুতলি ফেলি নরহরি তুই কোথায় ছিলি। সঙ্কীর্ত্তনে যাবার বেলা হাতে হাতে সঁপে দিলাম। তার এই কি প্রতিফল, নরহরি বল বল, তার এই কি প্রতিফল। সোনার অঙ্গে ধূলা মাখা তার এই কি প্রতিফল।’ অভিমানে শচীমাতা বলেন, ‘আর যেতে দিবনা। সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বম্ভরে আর যেতে দিবনা ঘরে বসে খেলা করবে, ঘরের মাণিক ঘরে থাকবে, ঘরে বসে খেলা করবে’।” এই সব কথা শুনছি আর ভাবছি,—একজন সাধু ঠিক মায়ের মতই কথা বলছেন! শচীমাতার আবেশ তাঁর মধ্যে যেন এসে গেছে, ঠিক যেন তাঁর মতন হয়েই কথা বলছেন! পুরুষ মানুষ কি ক’রে ঠিক এমন হয়ে কথা বলতে পারেন! স্বকর্ণেই তো শুনতে পাচ্ছি,—ঠিক যেন শচীমার মতনই তাঁর কথাবার্ত্তা গুলো, বাৎসল্য-স্নেহেতে যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন! বাৎসল্য-প্রেম হৃদয়ে না আসলে এমনতর কথা কখনও বের হতে পারেনা,—এই সব দেখে শুনে ভাবছি। আবার কীর্ত্তন ধরলেন,—“ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে। নানা-বিধ সেবা করে শ্রান্তি দূর করে। মুখপদ পাখালিল সুশীতল নীরে। শচীমাতা আনি দিল ক্ষীর ননী সরে।” আবার আঁখর দিতে লাগলেন,—“নরহরি খাওয়াও রে। তোমার হাতে খেতে ভালবাসে নরহরি খাওয়াও রে। শচীমাতা কেঁদে বলেন,—‘নরহরি খাওয়ারে।’

নরহরি যতন করি খাওয়ায় গোরারে,—ক্ষীর সর নবনী খাও,—নরহরি কেঁদে বলে, ক্ষীর সর নবনী খাও, বাৎসল্য-প্রেম-মাখা ক্ষীর সর নবনী খাও, নরহরি যতন করি খাওয়ায় গোরারে। মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে। উঠিল আনন্দ রোল, ভোজন বিলাস দেখে উঠিল আনন্দ রোল। বাৎসল্য প্রেমের ভোজন বিলাস দেখে, উঠিল আনন্দ রোল, সবাই বলে হরি বোল, উঠিল আনন্দ রোল।" যেই এই কীর্ত্তন গাইলেন আর চারিদিক হতে আনন্দে হরিবোল ধ্বনি সহস্র কণ্ঠে উত্থিত হল, অপূর্ব্ব উলুধ্বনি হতে লাগল।

আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দিশে হারা হয়ে গেছি! "মায়ের কোলে গৌরহরি,—সবাই বল হরি হরি।" —এইরূপ ভাবে গৌরকে মায়ের কোলে রেখে আবার তিনি কীর্ত্তনে প্রার্থনা করতে লাগলেন,— "এই কৃপা কর মোরে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি, আর কিছু চাইনা, আর যেন ভুলাওনা, দিয়ে মায়ার নানা খেলনা, আর যেন ভুলাওনা! আমরা অনেক দিনতো খেলেছি হে, তোমায় ভুলে পুতুল খেলা অনেকদিন তো খেলেছি হে। নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি। আমাদের প্রভু, পতিতের বন্ধু নিতাই আমাদের প্রভু! তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা, এই কর জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা। অমনি কত কথায় কীর্ত্তনে আঁখর দিচ্ছেন, কি ব্যাকুলতা নিয়ে কথাগুলো বলছেন,—"তখন জনম দাও নাই মোদের, যখন প্রকট লীলায় বিহরিলে, তখন জনম দাও নাই মোদের! তখন জনম দিলিনা বিধি, সেই জনম দিলি যদি, কেন তখন জনম দিলিনা বিধি! আমরা প্রেম পাথারে সাঁতার দিতাম, নিতাই তরঙ্গে নেচে নেচে প্রেম পাথারে সাঁতার দিতাম। নিতাই তরঙ্গে নেচে নেচে, করুণা বাতাসে হেলে দুলে।"—এই কথা বলতেই অপূর্ব্ব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল। তারপর আবার গাইছেন,—"এই কর জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা।" অমনি আঁখর দিচ্ছেন,—"তোমার দাসানুদাসের সঙ্গ দিয়ো যেথায় মোরে রেখোনাকো, দাসানুদাসের সঙ্গ দিও।

আমরা প্রাণ ভরে গাইব, তোমা দোঁহার গুণ-গাথা প্রাণ ভরে গাইব। আমরা ভাই ভাই এক প্রাণে প্রাণ ভরে গাইব।" এই বলে—গৌরহরি হরি বোল—বলে খুব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল। তারপর আবার নাম ধরলেন,—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন।" ইত্যাদি। পূর্ব্বে এ সমস্ত কীর্ত্তন ও তার সঙ্গে অপূর্ব্ব শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা সমস্ত লেখা হয়েছে। তাহাই আঁখর দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীগৌর সুন্দর যে পরতত্ত্ব সীমা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু,—এই শ্রীগৌর কিশোর, তাহা অপূর্ব্ব আঁখরের ভিতর দিয়ে আমাদের পরিবেষণ করেছেন। এই অভিরমণীয় শ্রীগৌর লীলা কথা তাঁর মুখেই আমরা শুনবার সৌভাগ্য পেয়ে নিজেরা ধন্য মনে করেছি।

তারপর দেখতে পেলাম আমাদের সখীমা (শ্রীললিতা দাসী) একটী সুন্দর পাত্রে হলুদজল এনেছেন। পাত্রের মুখে আম্র পল্লব। একটী নূতন গামছা তার উপরে। ঐ দধি-মঙ্গলের হাঁড়ি নিয়ে এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিয়ে, নিজে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় লুটের কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন,—"আয়রে তোরা লুটবি কে আয়। আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়রে!" ইত্যাদি। পূর্ব্বে এই লুটের কীর্ত্তন লেখা হয়েছে তাই আর উল্লেখ করলাম না। লুটের কীর্ত্তন শেষ ক'রে তারপর—গৌর হরি হরি বোল—বলে অপূর্ব্ব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হচ্ছে,—কেউ পড়ছে, কেউ উঠছে, কেউ নাচছে, সে যে কি আনন্দ ও উন্মাদনা তা লিখে বোঝান অসম্ভব! এমন সময় সখীমা (শ্রীললিতা দাসী) একটী বড় থালা করে হরির লুট নিয়ে এলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দধি-মঙ্গল হাঁড়ি মাথায় ক'রে ঐ মঞ্চ ঘুরে নাচতে লাগলেন,—তারপর ঐ হলুদ জল চারিদিকে সিঞ্চন ক'রে; এক অপূর্ব্ব অভিরাম

নৃত্য করতে করতে ঐ দধি মঙ্গল হাঁড়িটি ঐ নাট মন্দিরে ভেঙ্গে ফেললেন! চারিদিক ঐ হলুদ জলে ভেসে গেল। সঙ্গে যে গামছা খানা ছিল, তাতে একটী টাকাও বাঁধা ছিল। অনেকে গামছাখানি কাড়াকাড়ি করল কিন্তু কিঙ্কর কাকার সঙ্গে কেহই পারলনা। তিনি কেড়ে নিয়ে মাথায় বাঁধলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ হলুদ জলের উপর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ক'রে আবার গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তারপর উঠে দণ্ডবৎ ক'রে নিজ ভজন কুটিরে চলে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দণ্ডবৎ গড়াগড়ি দিলাম।

তারপর অসংখ্য নরনারী ঐ জলে ও রজে গড়াগড়ি দিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দের পাথার বইতে লাগল। সখীমা একটী খুব বড় থালা করে হরির লুট ছড়াতে লাগলেন, সবাই পরমানন্দে—হরি বোল বলে—হরির লুট কুড়াতে লাগলেন। এইরূপ ভাবে নামযজ্ঞ শেষ হল। আমরা তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,— "চাদরখানা ধুয়ে ফেলতে চায় সবে, এতে রজ লেগে আছেন, তা কেউ বোঝেনা। এই রজই আমাদের প্রাপ্তি, ধামের রজে নিষ্ঠা না হলে আর কি হল! আমাদের কর্ত্তারা এই ধামের রজের বাসনে ভোগ দিতেন, প্রসাদ পেতেন আবার ধুয়ে রেখে দিতেন। ধামের রজের যে কি-মহিমা তাহা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিয়েছেন। শ্রীগৌর কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় এখানে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই শ্রীনবদ্বীপ ধামের রজ সব সময় তাঁর গায়ে মাখা থাকত। একটী ছোট্ট ছইয়ের ভিতর থাকতেন, আর ধামবাসীর ঘরে মাধুকরী করতেন। একদিন তাঁর মনে হল,—'ধাম বাসীদের সেবা না ক'রে, আমি তাঁদের দুয়ারে মাধুকরী খাব! —এটা ঠিক নয়। আমি জঙ্গলে গিয়ে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে এনে নদেবাসীদের রন্ধনের সাহায্য করব। রাস্তার ধারে বসে

থাকব কাট নিয়ে, তাঁরা খুশি হয়ে আমায় যা দেবেন তাই নিয়ে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করব। কিছু সেবাতো তাঁদের করতে পারব।' তখন তিনি ধামের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলে খ্যাত, কি দৈন্য তাঁর, কি ধামবাসীর উপর নিষ্ঠা। রাস্তায় নেকড়া পড়ে থাকলে, বা শ্মশানে পরিত্যক্ত কাপড় থাকলে তাই তিনি কুড়িয়ে বহির্ব্বাস কৌপীন ক'রে নিয়ে পরতেন। এতটুকু ঘৃণা তাঁর মনে আসতোনা, তিনি বলতেন,—'ধাম বাসীর বস্ত্র, ওতো চিন্ময় বস্তু! ওতে ঘৃণা করলে চলবে কেন।' শ্রীধাম বা ধামবাসী মাত্রকেই তিনি দিব্য জ্ঞানে দেখতেন। শ্রীধামের রজে তাঁর কি অপার নিষ্ঠা!— এই ধাম ছেড়ে একবার ওপারে যাবার জন্য তাঁর ভক্তেরা খুব অনুরোধ করেন। অনেক অনুরোধের পর তবে তিনি রাজী হলেন! শ্রীগৌর কিশোর দাস বাবাজী মহাশয় কি করলেন! একখানা বহির্ব্বাসে শ্রীনবদ্বীপ ধামের রজ বেঁধে নিলেন। তাই কাঁধে ক'রে পারে গেলেন, স্বরূপগঞ্জ মিয়াপুর প্রভৃতি ঘুরে এলেন;—যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদের মুখেই শোনা। ধামে এসে নিজের ভজনস্থানে গেলেন, সবাই জিজ্ঞাসা করলেন,—'বাবাজী মহাশয় এ কি-ব্যবহার আপনার, বহির্ব্বাসে রজ বেঁধেছেন কেন? আবার তাই কাঁধে নিয়ে তবে গঙ্গা পার হলেন, আবার ঐ ঝোলাটা কাঁধের থেকে না নামিয়েই এই শ্রীনবদ্বীপ ধামে এসে তবে রাখলেন। আমরা কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা,' তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—'শ্রীনবদ্বীপ ধাম ছেড়ে সবাই নিয়ে গেল পারে। যদি ধাম ছেড়ে সেখানে মৃত্যু হয় তবে তো আর ধামের রজ পাবনা। তাই আমি শ্রীনবদ্বীপ ধামের রজ বহির্ব্বাসে বেঁধে নিয়ে গেছলাম। —যদি দেহত্যাগ হত তাহোলে ধামেই প্রাপ্তি হত, কেননা ধামের রজ কাছেই ছিলেন, এইজন্য আমি এ-কাজ করেছি, বুঝতে পেরেছ তো!' তাঁর এই অপূর্ব্ব শ্রীনবদ্বীপ ধাম-নিষ্ঠা ও রজ-নিষ্ঠা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। এখনও

তাঁর দেহের সমাধি এই নবদ্বীপ ধামের রাণীর চড়ায় রয়েছেন।" এইরূপ কত অপূর্ব্ব কথা বার্ত্তা বলে স্নান ক'রে আহ্নিক করতে বসলেন।

আজ শ্রীল গৌরহরি দাস মহান্ত বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি। নাট মন্দিরে বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এসে প্রসাদ পেলেন, আমরাও সব পঙ্গতঘরে প্রসাদ পেলাম। শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব তিথির মতন অতবড় উৎসব হোলোনা! তবুও অসংখ্য লোক প্রসাদ পেলেন। আমার দিনগুলো আনন্দে বেশ কাটছে! রাত্রে আরতি রূপ অভিসার কীর্ত্তন শ্রীযুক্তা সখীমাই করলেন তারপর রাত্রে প্রসাদ পেয়ে সব বিশ্রাম করতে গেলেন।

তার পরদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে সকালে বসে আছি; শ্রীসখীমা একজন বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে ক'রে তাঁর কাছেই এলেন। সঙ্গে শ্রীফণী কাকা ও শ্রীনন্দ কাকা আছেন। সখীমা বললেন,—"আজ দিনে ও রাত্রে মায়ের ওখানে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তোমার মধুপূজারী রসুই করতে চলে গেছে।" এই কথা শুনে,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় মায়ের চরণে দণ্ডবৎ করলেন! তাঁর অপূর্ব্ব বাৎসল্য প্রেম! তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন,—মাথায় হাত দিয়ে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় যে একজন বিরক্ত সাধু বৈষ্ণব, তবুও এতটুকু সঙ্কোচ তাঁর নাই, বাৎসল্য-প্রেমেই তিনি বললেন,—"তোমার পারিষদ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।" কোন দ্বিধা না ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয়—আচ্ছা—বললেন। তারপর সখীমা তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিজের ঘরে এলেন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক রেখে দণ্ডবৎ করলেন! আমি এ-সব দেখে অবাক হয়ে গেছি;—এতবড় সাধু উনি, ভক্তি ক'রে দণ্ডবৎ কচ্ছেন! আর ঐ মেয়েমানুষটি চুপ করে দাঁড়িয়ে দণ্ডবৎ নিচ্ছেন আবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছেন! এই সব ব্যাপার দেখে আমি বেশ হতভম্ব হয়ে গেছি। তারপর শ্রীবিহারী কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমায় সব বুঝিয়ে দিলেন।

ইনি বড় বাৎসল্যবতী মা আমাদের। মানকুণ্ডু খাঁয়েদের বাড়ীর মেয়ে। সাধু বৈষ্ণব মাত্রকেই তাঁর ছেলে বলে সম্বোধন করেন। এই ধামেই বেশী সময় থাকেন। এই মঠের পাশেই ওঁদের বাড়ী. আমাদের উপর তাঁর অপূর্ব্ব বাৎসল্য-স্নেহ। তাঁর স্নেহের তুলনা আমরা দিতে পারবোনা, মাতো—মায়ই! বৈষ্ণবদের অসুখ হলে তিনি দেখেন; কার কি কাপড়-বহির্ব্বাস, কার কম্বল, কার লোটা কারও মিছরি, কারও ঔষধ যা লাগবে সেইসব দিয়ে তিনি সবাইকে সেবা যত্ন করেন কিন্তু দাদা ও দিদির উপর তাঁর সবচেয়ে বেশী বাৎসল্য-স্নেহ; এই সমস্ত গুণে তাঁরাও মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সাধু বৈষ্ণবে এত শ্রদ্ধা-প্রীতি খুব কম দেখা যায়। আবার ইনি মঠেও কত রূপে ঠাকুরের সেবা করেন, বৈষ্ণবদের সেবা করেন! আজ তাঁর বাড়ীতে মঠের সবারই নিমন্ত্রণ, দেখবে কি যত্ন ক'রে আমাদের তিনি খাওয়াবেন,—যেন সাক্ষাৎ মা!

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক হয়ে গেল আমরা তাঁর সঙ্গে সবাই তাঁদের বাড়ীতে গেলাম। ফণীকাকা তাঁদের বাড়ীতেই আছেন। দাদা প্রসাদ পাবেন ওখানে তাই তাঁর কত উদ্যম। ঠাকুরের কত সুন্দর সুন্দর ভোগ হয়েছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই প্রসাদ পেতে বসলাম। সুন্দর ভোগের কত কত প্রসাদ সবাই পরমানন্দে পেতে লাগলেন। প্রসাদ পাওয়া হলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটী চেয়ারে বসলেন। কত জনা এসে দণ্ডবৎ প্রণতি করতে লাগল। মানকুণ্ডুর খাঁয়েরা বিশেষ ধনী লোক, তাঁরা অনেকেই এসেছেন। তাঁরা শ্রদ্ধাভরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণে বহু অর্থ, কাপড়-বহির্ব্বাস ও রেশম বস্ত্র রেখে তাঁর মর্য্যাদা করলেন। মঠের সমস্ত লোক এসে প্রসাদ পেয়ে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তারপর নিজের ভজন কুটিরে চলে এলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে চলে এলাম। আবার রাত্রে সেখানে মহোৎসবে মঠের সবাই এসে প্রসাদ পেলাম। এইরূপ পরমানন্দে সবারই দিন কাটছে।

সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে আমরা অনেকেই বসে আছি; আজ দুপুরে প্রসাদ পেয়ে বেলা তিনটার সময় গঙ্গা পার হয়ে কৃষ্ণনগর যাবেন, সেখানে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ক'রে সে রাত্রি সেখানে থাকবেন,—এই কথা বলছিলেন। আমাকে বললেন,—"চল আমাদের সঙ্গে, ওখানে কৃষ্ণনগরে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের পদ চিহ্ন সিমেণ্টে পড়েছিল। এখন আর সে চিহ্ন নাই! তবুও স্থানটা দেখে আসবে। চল দেখতে! আমি খুব আনন্দে আটখানা হয়েছি, তাঁর সঙ্গে যেতে পারব বলে। তাড়াতাড়ি স্নান আহ্নিক প্রসাদ পাওয়া সব হয়ে গেল, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে গঙ্গাঘাটে এলাম। নৌকা ঠিক ছিল। অনেক স্ত্রী পুরুষ সব এসে জুটেছেন ঘাটে। কৃষ্ণনগরের শ্রীসনৎ সেনগুপ্ত আছেন শ্রীঠাকুর কানাইয়ের বংশধর, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য, তাঁর বাড়ীতে আমরা প্রায় ৩০ জন খোল করতাল নিয়ে রওনা হলাম, আরো বহুলোক এলেন। তিনি তাদের বললেন,—"তোমরা দিগ্‌নগর কল্পবৃক্ষের ওখানে চল, অষ্ট প্রহর হবে, সবাই সেখানে গিয়ে ঠিক কর সব। আমি কাল সেখানে যাবো।" এই শুনে সবাই স্বরূপগঞ্জে ট্রেনে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদল বলে কৃষ্ণনগর গেলেন আর অনেকে দিগ্‌নগরও গেলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের লোকও সেথা স্ত্রীপুত্র নিয়ে গেলেন কল্পতরুর উৎসব দেখবেন বলে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা ৪।৫ জন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের পদচিহ্ন যে ঘরে পড়েছিল সেই খানে এসে পৌঁছিলাম। তিনি সেই বাড়ীর সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলেন, আমরাও দণ্ডবৎ করলাম। সেখানে এখন আর পদচিহ্ন নাই অন্য লোকে বাড়ীটি নিয়ে নিয়েছে। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসে কীর্ত্তনে বসলেন। প্রায় ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করলেন। কৃষ্ণনগরের বহু শিক্ষিত লোক কীর্ত্তন শুনতে এসেছিলেন। তারপর প্রসাদ পেয়ে সবাই বিশ্রাম করলেন। পরদিন সকালে নগর কীর্ত্তন

করলেন ! কীর্ত্তন শেষে আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে, সদল বলে দিগ্‌নগর রওনা হলেন। দিগ্‌নগরে সন্ধ্যার সময় এসে ট্রেনটা থামল। অন্ধকার হয়ে এসেছে, প্রায় এক মাইল পথ, জঙ্গল ও মাঠ পার হয়ে তবে দিগ্‌নগরে কল্পবৃক্ষ তলে যেতে হবে। সবাই আগে আগে রওনা হয়ে গেলেন। মাত্র শ্রীল বাবাজী মহাশয়, নিতাই দাদা, রমণদা', উপেনদা', বিহারী কাকা ও আমি এই ৫।৬ জন রইলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় গল্প ক'রে কত হাস্য পরিহাস করতে করতে চলেছেন, এমন সময় নিতাই দাদা আমাকে ডেকে বললেন—"জীবন ! দেখ্‌বি শ্রীল বাবাজী মহাশয় কেমন ছেলে মানুষ ! মহাপুরুষদের বালকবৎ, উন্মাদবৎ, এমন কি পিশাচবৎ স্বভাবও হয়,—শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় উন্মাদবৎ হয়ে পুরীতে ন্যাংটা হয়ে বেড়াতেন! জয় নিত্যানন্দ রাম—বলে, তাঁর হাতে যে শিকল বাঁধা ছিল ছিঁড়ে ফেললেন !—পাগল হয়ে লাইট পোষ্ট ভেঙ্গে ফেলতেন আর পুলিসদের মারতে যেতেন. তাই দেখে পুলিসরা তাঁকে ধরে হাতে শিকলি বেঁধে দিয়েছিল।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"তুই হাত বাঁধা অবস্থায় কি ক'রে শিকল ছিঁড়তেন ?" ঐ যে বললাম.—"জয় নিত্যানন্দ রাম—বলে ছিঁড়ে ফেললেন!" —"বলেন কি!" নিতাইদা' বললেন,—"মহাপুরুষদের বোঝা খুব কঠিন। আজ তোকে দেখাবো আমাদের বাবাজী মহাশয় কেমন বালকের মত, তাঁকে ভয় দেখাবো! তুই বলবিনা তো? আমি বললাম "না।" অমনি বললেন,—"ঠিক তো? ঐ দেখ্‌ ঐ যে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছিস, ওতে ভূত আছে, এই কথা বাবাজী মহাশয়কে বলবো কিন্তু ভূত ওতে নাই, অনেকগুলো হনুমান ঐ গাছে থাকে, কাছে গিয়ে ঢিল ছুঁড়বো, আর তারা এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে পড়বে, গাছ খুব নড়বে, তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বলব,—ঐ তো ভূতে গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। তিনি তোকে খুব ভালবাসেন, এ-সব কথা আবার বলিস না। এই দেখ্‌ না তাঁকে বিশ্বাস করিয়ে ভয় দেখিয়ে দেবো, আমি

তোর কাছে আস্তে আস্তে ভূতের কথা বলবো,—বাবাজী মহাশয় যেন শুনতে পান এমন ক'রে বলব। বুঝছিস তো?" আমি মাথা নাড়লাম। ঐ বৃক্ষটা থেকে আমরা কিছু দূরে আছি,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় আগে চলেছেন আমরা পেছনে চলেছি। বেশ একটু অন্ধকার হয়েছে; অমনি নিতাই দাদা দূর থেকে দুটো ঢিল ছুড়ে ঐ গাছে মারলেন,—আমি ছাড়া আর কেউ দেখলোনা, আর ঠিক সেই সময়েই আমাকে বলতে লাগলেন ফিস্‌ফিস্‌ করে,—"ঐ গাছে ভূত আছে। আমি একদিন সন্ধ্যার সময় যেতে দেখেছি, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বলিস নে উনি ভয় পাবেন।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেন শুনতে পান এমনি করেই আমায় বলছেন, আমরাও ঐ গাছের কাছে প্রায় এসেছি; ঢিল ছোড়াতে হনুমানগুলো এ-ডালে সে-ডালে লাফিয়ে পড়ছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে গেলেন, আর যেতে চান না, বালকের মত ভীতু হয়ে পড়েছেন, আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন—পিছু হেঁটে আয়। নিতাইদা'—হরিবোল ধ্বনি—দিচ্ছেন আর হনুমানগুলো এ-ডাল থেকে সে-ডালে যাচ্ছে, ডাল খুব নড়ছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভয়ে নিতাইদাকে বলছেন,—"তুমি আমায় আগের থেকে কেন বলনি? আমি কখনও এ-পথে আসতুম না। তলা দিয়ে গেলে ভূত ডাল ভেঙ্গে যদি মাথার উপর পড়ে, তখন কি হবে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় সত্যই বিশ্বাস ক'রে ফেলেছেন এবং বেশ ভীতু হয়ে পেছন ফিরে, আর ও-পথে গাছের তলা দিয়ে যাবেন না এই ঠিক করেছেন। নিতাইদা' ও রমণদা'রা মৃদু মৃদু হাসছেন, আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিশুসুলভ ব্যবহার ও ভয় দেখে, সব কথা আনুপূর্ব্বিক বলে দিলাম, তখন তিনি ফিরলেন! একটু রুষ্টও হয়েছেন নিতাইদা'র উপর, আবার হাসতে হাসতে বলছেন,—"তুমি এমন চালাক! নদের ছেলে কি-না তুমি, তাই তোমার শয়তানি,"

এইরূপ হাস্য করতে করতে গাছের তলায় পথে চলতে লাগলেন! হনুমান এ-ডালের থেকে ও-ডালে লাফাচ্ছে দেখে হাসতে হাসতে কিছু দূর এসে কল্পতরুর তলায় পৌছিলেন। এই সকল গল্প অনেকের কাছে নিতাইদা' বললেন আর হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবছি,—"এত বড় মহাপুরুষ শ্রীল বাবাজী মহাশয় কিন্তু এমন শিশুসুলভ ব্যবহার! ৪।৫ বৎসরের শিশুকে মা যেমন ভূতের ভয় দেখায় আর ছেলে ভীতু হয়ে পড়ে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও কি ঐ রকম ৪।৫ বৎসরের শিশু বা বালক নাকি?"

কল্পতরুর কাছে একটি ভক্তের বাড়ী, সেখানে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের থাকবার জায়গা হয়েছে। আর কল্পতরুর কাছে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে আমাদের একটি থাকার ও রসুই করবার জায়গা হয়েছে। কল্পতরুর তলায় নাম হবে! আম্রপল্লব, ঘট ও কলাগাছ দিয়ে সব সাজান হয়েছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঠাকুর নিয়ে কল্পতরুর নীচে রাখা হয়েছে। গ্রামবাসীরা গোবর দিয়ে লেপে পরিষ্কার ক'রে ঐ স্থান সুন্দর ক'রে রেখেছে। একটা সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। সন্ধ্যা আরতি পূজা ও অর্চ্চনা শেষ হয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। খুব অধিবাস কীর্ত্তন হল। তারপর কল্পতরু ঘিরে ঘিরে নাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অপূর্ব্ব মনোহর নৃত্য ও কীর্ত্তন হতে লাগল। প্রায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হল; তারপর ঠাকুরের ভোগ হল। আমরা সবাই প্রসাদ পেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আর সেই ভক্তের বাড়ী গেলেন না, ওখানেই খড়ের উপর কম্বল বিছান হল, সেখানেই বিশ্রাম করলেন। বলাইদা' চারুদা' ও আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পায়ের দিকে খড় বিছিয়ে তার উপর একটা শতরঞ্চি পেতে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন পূজারী ছিলেন কৃষ্ণকমল,

দাদা ও শশীদাদা, তাঁরা মালা নিয়ে বসলেন, নাম করতে করতে তাঁরা রাত কাটিয়ে দিলেন। ভোর ভোর হলো, শ্রীল বাবাজী মহাশয় উঠে শৌচাদি গেলেন, আমরাও সবাই হাত মুখ ধুয়ে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রভাতি সুরে কি মধুর নাম ধরেছেন! সবার প্রাণ মন কেড়ে নিল। বহু লোক নাম শুনতে এসেছেন। অনেক মুসলমানও এসেছেন! তাঁরা এই কল্পবৃক্ষকে খুব শ্রদ্ধা করেন এবং পীরতলা বলেন।

অপূর্ব্ব নামের ধ্বনি চারিদিকে ভেসে যাচ্ছে। বহু লোক এসে জমেছে। গ্রামবাসী অনেক মুসলমানও এসেছেন কত ফল নিয়ে, ঐ কল্পবৃক্ষ তলে সব রেখে তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। আর গ্রাম-বাসী সব কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ সজিনার ডাঁটা ও কুম্‌ড়োশাক প্রভৃতি স্বেচ্ছায় নিয়ে এসেছেন. আর ঐ সব কল্পতরুর তলাতে রেখে সবাই নামে যোগ দিচ্ছেন। এইরূপ ভাবে খুব নাম কীর্ত্তন জমে গেল। একজন গয়লা মাখন, ঘৃত ও দধি এনে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে সবাইকে প্রসাদ পেতে অনুরোধ করল। তারপর ঐ গয়লা ও তার স্ত্রী শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করলেন ও আমার গলায় পৈতা দেখে বললেন,—"ও বামুন ঠাকুর! ও ঠাকুর বাবাজী! তোমরা আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবে চল।" অনেক অনুরোধ করাতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাদের বাড়ীতে আহ্নিক করতে ও বিশ্রাম করতে গেছিলেন। কেবল আমি, রমণদা' ও চারুদা' তাদের বাড়ীতে রইলাম; তাদের অনুরোধ এড়াতে পারিনি। কল্পবৃক্ষের কাছেই তাদের বাড়ী, আসা যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। গয়লা খুব শ্রদ্ধা ক'রে আমাদের দই, সন্দেশ ও ঘোল এনে দিল। রমণদা' নাম-ব্রহ্মের সেবা করতেন,—তাঁকে তুলসীজল দিয়ে পূজা করতেন খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে! চারুদা' ঐ গুলো ওখানেই ভোগ দিতে বললেন। রমণদা'র আহ্নিক করতে দেরী হচ্ছে দেখে চারুদা' একটু গম্ভীর-স্বরে বললেন—"নেও আর কত ভজন রমণ করবে?

এদিকে পেটে খোল করতাল বেজে উঠছে",—অর্থাৎ খুব খিদে পেয়েছে বলতেই রমণদা' নাম-ব্রহ্মের কাছে ভোগ লাগালেন। চারুদা' ভোগ লাগানর সঙ্গে সঙ্গেই তিন চার খানা পাতা ক'রে আমাকে বসিয়ে নিজেও বসে পড়লেন,—আর যেন দেরী সইছেনা! রমণদা' প্রসাদ দিয়ে নিজেও বসলেন।

বেশ অনেকগুলো সন্দেশ, সুন্দর ঘন ঘোল, চাপ-চাপ দই। চারুদা' প্রথমে ডান হাত দিয়ে খেতে লাগলেন; তারপর দু' হাত দিয়ে খাচ্ছেন আর আমায় বলছেন,—দু' হাত দিয়ে সাবাড় কর্ নইলে এখনই পারিষদ সব এসে পড়লে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হবে। যত পারিস এই বেলা শীঘ্র সাবাড় ক'রে ফেল।" প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ প্রসাদ খাওয়া হয়ে গেছে। ভরে গেছে সবার পেট দই সন্দেশ খেয়ে; চারুদা' হাসতে হাসতে দই একটু মুখে মেখেছেন, আমার মুখেও মাখালেন। তারা সন্দেশ এত দিয়েছে যে আর পেটে ধরে না; মুখেও উঠছে না। আমায় বললেন,—"জীবন, আর তো গলায় ঢোকেনা, একটা বাঁশের চোঙ্গা আন্ তো, সন্দেশ গলার ভিতর দিয়ে গেদে গেদে দিই!" এই সব বলছেন আর আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ছি, এই খবর কল্পতরুর ওখানে গিয়ে পৌঁছালো আর অমনি বলাইদা' আরও অনেকে ছুটে এলেন, আমাদের মুখ দই-মাখা দেখে সবাই হাসছেন; চারুদা' বলছেন,—"আর পারি না! কে কোথায় আছগো, আমাদের একবার দেখে যাও কি বিপদে পড়েছি!" খুব হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল! সবাই কাড়াকাড়ি ক'রে দই সন্দেশ প্রসাদ পেলেন। গয়লা জোড় হাত ক'রে দাঁড়িয়ে বলছে,—"আমার আজ কি ভাগ্যি যে আপনাদের পাতে এই দই সন্দেশ দিতে পারলাম। কত ভাগ্যি ছিল তাই ঘরে আপনাদের পাইছি।"

এমনি করে বেলা ১২টা বেজে গেল, আমরা সবাই কল্পবৃক্ষ তলে গেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তখনও তরুতলে বসে আহ্নিক করছেন,—অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবে বিভাবিত, খুব হুঙ্কার

দিচ্ছেন। সবাই চুপ করে বসে আছেন। চারুদা' বলছেন,—"জীবন, দেখছিস্ কী-হুঙ্কার দিচ্ছেন!" আমি বললাম,—"দেখছি তো, এত কান্না আর হুঙ্কারতো কারুরই দেখিনা।" চারুদা' বললেন,—"বুঝতে পাচ্ছিস না, ওঁর শ্রীগুরুদেবের কথা মনে পড়েছে, শুধু মনে পড়া নয়, উনি সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছেন তাঁকে! তাই এই হুঙ্কার। ওঁর শ্রীগুরুদেব নাম ক'রে এই বৃক্ষ নাচিয়ে ছিলেন! মধু বর্ষণ হয়েছিল এর পাতা থেকে! কত লোক দেখেছে, এখনও দেখা-লোক অনেকে বেঁচে আছেন। তাঁর কীর্ত্তনের এমনই প্রভাব যে এ গ্রামের মুসলমানরাও তাঁর নাম করে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে। ঐ দেখ্‌না, তারাও উৎসবের জন্য কত ফলমূল এনেছে। এ বৃক্ষ-নাচান বেশী দিনের কথা নয়। প্রতি বৎসর শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ তিথি ও ঐ দিনে এখানে এসে উৎসব করেন। তোকে খুব ভাল বাসেন কি-না তাই তোকে নিয়ে এসেছেন।"

এমন সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক শেষ হল,—তখন প্রায় আড়াইটা বেজেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসলেন, বলাইদা'ও চারুদা' পাশে বসলেন, আমরাও সবাই বসলাম। চারুদা'র পেট খুব ভরা, মুখে প্রসাদ উঠছেই না, শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলছেন,—"ও চারু ব্যাপারখানা কি?" চারুদা' একটু মুখ গম্ভীর ক'রে বললেন—"বোধ হয় আমার এখন শূল-ব্যথা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এইতো প্রসাদ একটু নিয়েছি, প্রসাদের মর্য্যাদাও রেখেছি; এখন আপনি যদি হুকুম দেন তবে গিয়ে কম্বলে একটু লোটাপুটি খাইগে।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"যদি অসুখ বোধ কর তো যাওনা, শুয়ে পড়।" আদেশ পাওয়া মাত্রই চারুদা' উঠলেন; হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে বেশ একটিপ নস্যি টেনে কিছুদূরে গিয়ে শুয়ে পড়ে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়া দর্শন করছেন আর হাসছেন। আমরা সব কথা জানি কি-না তাই আমরাও হাসছি। হাসতে

হাসতে আমি গুমরে উঠেছি। অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় সবার হাসা দেখে নিজেও হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি ব্যাপার? বলতো। এত হাসি কিসের?" আমি সব বললাম,—দই খাওয়া. সন্দেশ খাওয়া, শেষে খেতে না পেরে মুখে দই মাখান। সব কথা শুনে তিনি খুব হাসতে লাগলেন। চারুদা' একটু যেন লজ্জিত হয়ে পিছন ফিরে শুলেন।

একটু পরেই চারুদার নাক ডাকতে লাগলো। আমাদের সবারই প্রসাদ পেতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজলো,—প্রসাদ পাওয়া হচ্ছে আর আনন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও ধ্বনি দিচ্ছেন, তাঁর ভক্তেরাও ধ্বনি দিচ্ছেন! তাই দেরী হল। তারপর সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন। চারুদা'র আসনের কাছেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ও আমার আসন; চারুদা' যেন বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন কিন্তু ঘুমোনো নয়, দেখাচ্ছেন ঐ রকম। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ধ্যানে ও তাঁর কথাতেই জীবন কাটান, উভয়ের মধ্যে সখ্য-ভাবও অনেক সময়েই দেখা যায়। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য তবুও কখন কখনও সখ্য-প্রেমে এইরূপ ব্যবহার করে ফেলেন; আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও তাঁর সহিত এইরূপ সখ্য-প্রেমে কথা বলেন। তথাপি শ্রীল বাবাজী মহাশয় যখন কীর্ত্তন করেন তখন চারুদাই তাঁর প্রধান দোয়ার। চারুদা', যুগলদা', অদ্বৈত কাকা ও বলাইদা' না এলে তাঁর কীর্ত্তনে সুখ হয় না। তাই এঁদের কীর্ত্তনের সময় থাকা চাইই।

চারুদা'র চোখ বুজে আছে, নাকও বেশ ডাকছে, কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর চালাকী বুঝেছেন 'তাই একটী খড়ের কুটো নিয়ে চারুদা'র নাকের ভিতর একটু দিলেন, অমনি নাক শুড় শুড় করে উঠলো, উঠে বসেই দেখলেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয়; অমনি বলে উঠলেন, "আর দই সন্দেশ ঠুসবো না, শূল-ব্যথা হল। তবে একটু শুয়েই ঠিক হয়ে গেছে" আর সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের তাড়াতাড়ি বিশ্রাম-সুখের জন্য মেঘলালদা' বিছানা ঠিক ক'রে রেখেছেন, তিনি তাতে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম ক'রে শৌচাদি সেরে মালা জপ করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। সন্ধ্যা আরতি সমারম্ভ ও শেষ হল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করবেন বলে বহু লোক এসে বসেছেন। কৃষ্ণনগর থেকেও দলে দলে লোক এসেছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করতে লাগলেন। কীর্ত্তনে প্রেমের পাথার বয়ে যাচ্ছে! কত লোক কাঁদছে কীর্ত্তন শুনে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় আকুল প্রাণে কীর্ত্তনে ডাকছেন,—"আবার তুমি এস প্রভু! আবার তেমনি ক'রে নামে বৃক্ষ নাচাও। দেখা দিয়ে আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল কর।" এই রকম কত আর্ত্তিভরা প্রার্থনা শেষ হল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে—পাগলের প্রাণারাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—নাম-কীর্ত্তন অনেকক্ষণ করলেন। তারপর সবাই বিশ্রাম ক'রে প্রসাদ পেলেন,—প্রায় রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম করতে করতে রাত্রি প্রভাত হল। তারপর সবাই হাতমুখ ধুয়ে নগর কীর্ত্তনে বাহির হলেন। ঐ গ্রামটি ঘুরে এলেন। জঙ্গলময় গ্রাম। একটু ঘুরেই চলে এসে —"গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে"—এই কীর্ত্তন ক'রে, কীর্ত্তন শেষে—হরিবোল—ধ্বনি দিলেন। দধি মঙ্গল হল। কত হরির লুট পড়তে লাগল! সবাই দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কল্পতরুর মূলে গড়াগড়ি দিয়ে দণ্ডবৎ ক'রে একটু দূরে গিয়ে বসলেন। তারপর তাঁর স্নান আহ্নিক সারা হল। আজ মহোৎসব! দলে দলে লোক আসছে মহোৎসবের প্রসাদ পেতে। মহোৎসব শেষ ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কালনার নিতাই-গৌর দর্শন করবার জন্য সদল বলে রওনা হলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরাও পরমানন্দে পথে পথে হেঁটে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে গঙ্গার তীরে এসে পৌছিলাম। খেয়া পার হয়ে সবাই মা গঙ্গার ওপারে

গেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় গঙ্গা-জল স্পর্শ ক'রে দণ্ডবৎ করলেন, তারপর উপরে উঠে ঘোড়ার গাড়ী ঠিক ক'রে আমরা সবাই রাত্রি আটটার সময় কালনায় এসে পৌঁছিলাম।

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন ক'রে আমরা সবাই একটি তেঁতুল বৃক্ষমূলে এসে বসলাম। বৃক্ষটি চারধারে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান। এই বৃক্ষের তলায় শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীগৌরসুন্দর এসে বিশ্রাম করেছিলেন। কালনার সেবাইত গোস্বামী শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে খুব প্রীতি করেন ও ভালবাসেন। রাত্রে সবার মহাপ্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হ'ল তারপর যে যেখানে পারল বিশ্রাম করতে লাগল। প্রভাত হ'ল গোঁসাইজী শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বললেন,—"এখানে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে, তবে শ্রীনবদ্বীপ ধামে বিকেলে যাবেন।" তিনি বললেন, "শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ পাব এতো পরম ভাগ্যের কথা।" সকালে এখানে বসে প্রভাতি কীর্ত্তন করলেন, আনন্দের পাথার বয়ে যেতে লাগল। কীর্ত্তন শেষ করে যে যেখানে পারে আহ্নিক সেরে নিল।

ভোগ আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, আমরা সবাই দর্শনে গেলাম। ঠাকুরের ঝাকি দর্শন ওখানে হয়। আমরা দর্শন করলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দর্শন মাত্র ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর· ঠাকুর মন্দির থেকে গোঁসাইজী একটা পুরানো বৈঠা এনে দেখালেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নৌকায় এখানে আসেন সেই নৌকার বৈঠা। আমাদের সবাইকে দর্শন করতে দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বৈঠা স্পর্শ মাত্রই দুই চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন। আর অমনি· তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ভাব সম্বরণ করে দণ্ডবৎ করে এসে স্নান আহ্নিক সেরে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধরামৃত শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও তাঁর পারিষদ বৃন্দ পেয়েই, তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ী করে ষ্টেশনে রওনা হলেন। কারণ আজই সন্ধ্যায় সময় তাঁদের শ্রীনবদ্বীপ ধামে

পৌঁছিতে হবে। আজ সন্ধ্যায় সেখানে চাঁচর হবে, কাল দোল-পূর্ণিমা তাই সব ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলেন।

আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে বসলাম। শ্রীধামে আবার সবাই মিলে যাচ্ছি, বিশেষ করে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে; তাই আমাদের আর আনন্দ ধরেনা। আমরা প্রায় তাঁর সঙ্গে চল্লিশ জন আছি। যে ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে আসে, আর সে যেতে চায়না, এমনই একটা আকর্ষণ এসে পড়ে! চুম্বুকের ধর্ম্ম যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে আলিঙ্গন করে ফেলে আর ছাড়ান যায়না। ঠিক এমনই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আকর্ষণ—ভালবাসা। কিছুতেই যেন তাঁকে ভোলা যায়না। মনও যেতে চায়না তাঁকে ছেড়ে। তবুও আমরা নিজ স্বতন্ত্রতা দোষে তাঁকে ফেলে চলে যাই। তবুও তিনি আমাদের ছাড়েন না, তাই কথা আছে:

তোমায় প্রভু বলব নিঠুর কোন প্রাণে।
কত রূপে তব স্নেহের দান, কত ভাবে কর সিঞ্চনে।
বসে বসে গাঁথি কামনার মালা,
প্রাণ হয়ে যায় শুধু ঝালাপালা,
তুমি এসে কাছে কত কথা কও, কও না করুণ ছন্দনে।
আমি চলে যাই তোমারে ছাড়ি,
(তুমি) চুপি চুপি এসে বাঁধিলে ডুরি,
তোমার বাঁধন শক্ত অতি বাসনা করি দলনে।
মায়া মমতায় ঘেরা কামনা মোর,
তার মাঝে এসে ও মরম চোর,
কোন ছলে এসে পাতিয়া কোর,
আমারে বাঁচালে মরণে।
ব্যথার ব্যথী কে তুমি দরদী,
হয়ে যাক মোর সবাই বাদী,
দাস জীবন অতি অভাজন, তাহারে রাখিও চরণে।

তোমায় প্রভু বলব নিঠুর কোন প্রাণে ॥

মনে হয় এই কথাগুলোই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের করুণার অভিব্যক্তি। শুধু একথা কেন নাম প্রেম ধনও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। কত কত পাষণ্ডী জীবনও তাঁর করুণায় ধন্য হয়ে গিয়ে ভক্তি পথে নূতন জীবন যাপন করছে, এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এখনও লোকে দেখতে পাচ্ছে। যাক এসব কথা।

আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ ধামে ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শনের জন্য কত লোক ষ্টেশনে এসেছেন। ষ্টেশনে যেই সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করল, অমনি সবাই হরিবোল ধ্বনিতে চারিদিক মুখর করে তুললো। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গলায় প্রসাদি মালা ভক্তেরা এসে পরাল। মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্লাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। ফার্স্ট ক্লাশে অনেক ইউরোপিয়ান সাহেব, এই হরিবোল ধ্বনি শুনে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে দর্শন করছেন এবং হরিবোল ধ্বনি শুনে মাথার টুপি খুলে হাতে রাখলেন। তাঁরা বুঝে ফেলেছেন যে এরা সব ঈশ্বরের নাম করছে, আর গলায় মালা পরা ঐ সাধু ঈশ্বরের ভক্ত, তাই তারা শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখে 'গুড ইভিনিং' বলে শান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দর্শন করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও হাত জোড় করে তাদের মর্য্যাদা করলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রতিটি লোকেরই, যাঁর যেমন প্রাপ্য ঠিক তেমনিই মর্য্যাদা দিয়ে যেতেন। এমনি করে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে তিনি মর্য্যাদা দিয়ে চলতেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধুকে সর্ব্বদাই অতুলনীয় মর্য্যাদা দিতেন। এইরূপ মর্য্যাদা দেওয়া পুরুষ আমি আর জীবনে কোথাও দেখিনি বল্লেও অত্যুক্তি হবেনা; যে তাঁর সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছে সেই বুঝতে পারবে, তাঁর ভক্তিময় মর্য্যাদাময় জীবন কথা।

ধীরে ধীরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসে একটি গাড়ীতে তাঁর ঠাকুরকে নিয়ে উঠতে বল'লেন; পূজারী ঠাকুর নিয়ে উঠলেন। নিজেও সেই গাড়ীতে উঠে বসলেন। আমিও তাঁর পাশে গিয়ে বসে পড়লাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বললেন বেশ চালাকতো, আমার সঙ্গে যাবে বলে টক্ করে এসে আমার পাশে বসল, দেখছো তোমরা—কেমন দুষ্টু এই বলে তিনিও হাসলেন, আমিও হেসে উঠলাম। একজন একটু গম্ভীর হল। সাত আটখানা গাড়ী ঠিক হয়েছে। খোল করতাল পোটলা পুটলি নিয়ে সবাই উঠে পড়ল। গাড়ী ছেড়ে দিল, খুব দ্রুত গাড়ী চলতে লাগল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা সবাই সমাজ বাড়ীর গেটে এসে পৌঁছিলাম। মঠ বাসী সব ছুটে এল। সবাই আনন্দে চিৎকার করছে "শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন, বাবাজী মহাশয় এসেছেন।"

সখীমাও চঞ্চল পদে গেটের একপাশে এসে দাঁড়ালেন।

ধীরে ধীরে ঠাকুরকে নামান হল, খোল করতাল নামান হল তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় গাড়ী হতে নামলেন, মুখখানা আনন্দে ভরে গেছে; শ্রীধামে শ্রীগুরুদেবের কাছে এসেছেন তাই খুব আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। গাড়ী থেকে নামা মাত্রই কত পুরুষ নারী চারিদিকে হরিহরিবোল ধ্বনি, উলু উলুধ্বনি দিচ্ছে। অসংখ্য লোক শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখতে এসেছেন। গেটের উপরে যেই উঠেছেন, অমনি তাঁকে দণ্ডবৎ করবার জন্য কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে। নিতাই দা' রমণদা' বাধা দিয়ে বললেন, বাবাজী মহাশয় আগে সুস্থ হয়ে বসুন, তারপর সবাই দণ্ডবৎ করবেন, এই কথা শুনে সবাই স্থির হলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন,—সখীমাকে দেখতে পেয়েই তাঁর চরণে গিয়ে দণ্ডবৎ করলেন, সখীমার আনন্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, নিজ ভাইকে পেয়েছেন কাছে,—তাই এত আনন্দ! তিনি একটি কথা বললেন,—শরীর কেমন আছে, এই আসছ এই আসছ করে

পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। এই বলে সখীমা ভাণ্ডার বাড়ী চলে গেলেন।

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় সেথায় দণ্ডবৎ করেই বৈঠকখানার গাদীতে গিয়ে দণ্ডবৎ করলেন,—শ্রীল গৌর কিশোর মহান্ত মহারাজ ও শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাধিতে দণ্ডবৎ করে, নিজে কুটীরে দণ্ডবৎ করে তারপর নিজ আসনে বসলেন।

অসংখ্য ভক্ত এসে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি করতে লাগল। আজ বহ্নি উৎসব, চাঁচর। ফাগু খেলা হবে এক দৈত্যের মূর্ত্তি খড় দিয়ে খুব বড় করে তৈরী হয়েছে। আমি বিহারী দাস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কি ব্যাপার। তিনি বললেন,—"আজ শ্রীবৃন্দাবনে মেড়াসুরকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ ফাগু খেলেন, দোল খেলেন তাই এর মূর্ত্তি করেছে, আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে তারপর ফাগু খেলা হবে। দাদা নিজে কীর্ত্তন করবেন, ফাগু খেলবেন, দিদিও ফাগু খেলবেন। রাম দাদা ঘিরে ঘিরে কীর্ত্তন করবেন, দেখবে কি আনন্দ উৎসব, একটু পরেই আরম্ভ হবে। এদিকে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আরতি দর্শন করে বেশ করে চাদর এঁটে পরেছেন, মাথায় একখানা গামছা ঘুরিয়ে বেঁধেছেন, সন্ধ্যা আরতি সব শেষ হয়ে গেছে। কিঙ্কর কাকা হরেকৃষ্ণ দাদা খোল নিয়ে ঐখানে এলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও সদল বলে করতাল নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। আনন্দের পাথার বয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ নাম কীর্ত্তন করে পদ ধরলেন, "আজ হলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে। একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।" এই কীর্ত্তন যেই ধরলেন আর অমনি সখীমা ও আরো কত ভক্তবৃন্দ ফাগু খেলতে লাগলেন। সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দিকে ও তাঁহার সঙ্গী দিগকেই ফাগু মারতে লাগল। স্থানটি লালে লাল হয়ে গেল। মেড়াসুরকে আগুন লাগান হল, মুহূর্ত্তের মধ্যে মেড়াসুর পুড়ে গেল। নদের ছেলেরা সেই আগুনে খুব লাঠি মারতে

লাগল আর নাচতে লাগল। তারপর অনেকক্ষণ কীর্ত্তন ক'রলেন সবাই শান্ত হোলো এবং যে যার গৃহে চলে গেল। সখীমা নাট মন্দিরে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন ক'রলেন, তারপর সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। পরদিন দোল পূর্ণিমা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি। তাই অতি প্রত্যুষে সবাই কাজ কর্ম্ম সেরে মঠে আসতে লাগল। সখীমা সকালে আমাদের সবাইকে ডাকলেন এবং প্রত্যেককে আট আনা করে পয়সা দিলেন, ফাগু কিনে নেবার জন্যে। সবার আনন্দ আর ধরে না। রাস্তায় আজ বের হওয়া কঠিন, সবার হাতেই পিচ্‌কারী যে যাকে পায় তাকেই রঙ দিচ্ছে। আমাদের মঠে দু'টার সময় থেকে রঙ খেলা আরম্ভ হবে। কানাইদা' নিতাইদা' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলের টব এনে রাখল—শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সামনের আঙ্গিনাতে। তাতে রঙ গোলা হলো। ওদিকে মন্দিরের বারান্দায় যুগল কিশোর সখীদের নিয়ে বারান্দায় এসে একটি সিংহাসনে ব'সলেন তার দুই ধার দিয়ে সখীরা ও সখারা দাঁড়ালেন, আর অমনি সবাই পিচ্‌কারি হাতে গুলাল খেলতে লাগলেন। ৩টা থেকেই পিচ্‌কারী খেলা আরম্ভ হ'ল। চারিদিকে লালে লাল হয়ে গেল। নাট মন্দিরে কীর্ত্তনের আসর হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন করবেন। তাঁর মুখে কীর্ত্তন শুনবার জন্য অগণিত ভক্ত এসে নাট মন্দিরে বসেছেন!

একটু পরেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদল বলে কীর্ত্তনের আসরে এসে ব'সলেন। চারিদিক থেকে হরিবোল ধ্বনি উত্থিত হ'তে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাতে করতাল লয়ে দণ্ডবৎ করে কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে মাতামাতি হচ্ছে। চারিদিক থেকে আবির বর্ষিত হচ্ছে আবার কেউ কেউ পিচ্‌কারীও কীর্ত্তনের আসরে ছুড়ছে। আমরা পিচ্‌কারী হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছি যাকে দেখছি তাকেই পিচ্‌কারী ছুড়ছি।

শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তার ছেলেমেয়েরাও পিচ্‌কারী ছুড়ছে। সখীমাও নিজে একটী সুন্দর রূপার পিচ্‌কারী নিয়ে খেলছেন। সবাই সখীমাকে পিচ্‌কারী মারছে। সখীমা আজ ভাবে বিহ্বল, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শেষে সখীমা নিজেই ফাগুখেলা কীর্ত্তন ক'রলেন, সখা, সখীরা, শ্রীকৃষ্ণ সবাই পিচ্‌কারী খেলছেন ও ফাগু ছুড়ছেন এই সব কীর্ত্তন করতে লাগলেন। আজ দোল পূর্ণিমা। চারিদিকেই দোল-উৎসবে মুখরিত হয়ে গেছে! কত কত কীর্ত্তনের দল আসছে, আবির কুঙ্কুম মারছে কত পিচ্‌কারীতে গোলারঙ নিয়ে ছুড়ছে তা বলে বোঝান যায় না।

এইরূপ ভাবে সবাই দোল লীলা খেলে মা গঙ্গায় গিয়ে খুব সাঁতার খেলে স্নান ক'রে তবে ফিরে এলেন। সখীমা ঠাকুরের অভিষেক ক'রে, সেই অভিষেক চরণামৃত সবাইকে দিলেন। আমি অল্প সময় আবির খেলে ও পিচ্‌কারী নিয়ে খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন শেষে এসে বসেছেন আমি তাঁর কাছে এসে বসে পড়লাম। কত কথা কইতে লাগলেন। দোল পূর্ণিমার কথা আমায় বলছেন। আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি, তাই সমস্ত দেব দেবী ছদ্মবেশে মনুষ্য আকারে এই শ্রীধামে এসেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিথি কিনা, তাই আজ শ্রীধামে আনন্দের পাথার বয়ে যাচ্ছে। গভীর রাত্রে পোড়ামা তলায় গেলে অনেকে পাগল পাগলীর বেশে ঘুরে বেড়ান দেখতে পাবে। তাঁদের এখানে বড় দেখা যায়না। তাঁরা সব দেব দেবী, তাঁদের কেউ চিনতে পারেনা। দিব্য দৃষ্টি হলে চেনা যায়। আমি বললাম, তাহলে আমি গভীর রাত্রে সেখানে দেখতে যাবো। অমনি বললেন, না, ভয় পাবি।

এইরূপ কত কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় প্রসাদ পাবার ডাক এল। সখীমা সবাইকে ডাকছেন প্রসাদ পাবার জন্য। অমনি

সবাই উঠলেন প্রসাদ পাবার জন্য। আমরা সবাই সখীমার কাছে এলাম. পঙ্গত আরম্ভ হল, খিচুড়ী, লুচি, তরকারী, ভাজা সব সখীমা নিজেই পরিবেশন করলেন। আবার যাঁরা ব্রত করেছেন তাঁরা ফল মূল পেলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে যাচ্ছি অমনি মেঘলালদা' ডাকলেন চুপি চুপি বললেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয় তোমায় ডাকছেন, আমি অমনি আনন্দে আটখানা হয়ে তাঁর কাছে চলে এলাম। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে আমায় কাছে বসিয়ে প্রসাদ দিলেন। সেদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে ফণীকাকা ও অদ্বৈতকাকা প্রসাদ পেতে বসেছেন। তাঁরা সবাই আনন্দে আমায় তাঁদের পাতার প্রসাদ দিলেন, আমি আনন্দে পেতে লাগলাম। প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'ল। যে যার আসনে চলে গেল, আমি ঘুমে ঢুলে পড়ছি অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় ধরে তাঁর খাটের পাশে শুইয়ে দিলেন আমি অমনি বিভোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কখন এসে ঘুমিয়েছেন, কখন উঠে গেছেন, কখন সকাল হয়েছে কিছুই জানিনা। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় দেখছি আমায় খুব ডাকছেন. একবার চোখ মেলে. আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার চুলের মুট ধরে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন। বললেন, "এত ঘুম কেন !" আমি অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলাম।

আমি বাইরে গিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আবার ঝিমুচ্ছি, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার চোখে জলের ঝাপটা দিলেন আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, হেসে উঠলাম। তাড়াতাড়ি শৌচাদি সেরে স্নান করে আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলাম। বালক সুলভ সরলতায় জিজ্ঞাসা করলাম,—এতবড় মঠ কি করে হ'ল।

অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলতে লাগলেন, এ একটা

দুর্দ্দান্ত জমিদারের বাগান বাড়ী। এমন কোন মানুষের অপকর্ম্ম ছিলনা যে তিনি তা করেননি। ঐ যে দেখছো বৈঠকখানা ঘর ওখানে মদের পিপে থাকতো। আর ঐ যে দেখছো গর্ত্ত,—অনেকটা বোজান হোয়েছে,—কত মড়ার মাথা ওখানে পাওয়া গেছে। কত লোককে তিনি খুন ক'রে ওতে ফেলে দিয়েছিলেন। এই সব পাপের দরুণ সেই লোকটা শেষে অনেক দুঃখ পেয়ে মরে গেছলেন। সেই থেকে ঐ বাগান বাড়ীতে বড় কেউ আসতে চায়না। শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় আশ্রম করবার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর এই জায়গাটাই পছন্দ হল। "যত পাপ এখানে হয়েছে ঠিক তেমনি আবার ধর্ম্মের সব চেয়ে সুন্দর স্থান হবে" তিনি এই কথা বললেন; অমনি এই বাগান বাড়ী কেনা হল। আগে সেবাশ্রমে আশ্রম ছিল এখনও আছে। আবার এই বাগান বাড়ী কিনেই একমাস ব্যাপী নাম-যজ্ঞ হল, গঙ্গাজল দিয়ে সব ধুয়ে ফেলা হল, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হল। ঐ যে ঠাকুর দেখছ, বলে কয়ে এসেছেন! ঐ যুগল কিশোর এক জমিদারের ফুলের বাগানে ২।৩ হাত মাটির তলে ছিলেন। শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়কে স্বপ্নে ঠাকুর বললেন,—মাটী খুঁড়ে আমায় এসে নিয়ে যা। তাই শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করতে করতে তাদের বাড়ীতে গিয়ে, মালিককে বললেন, "আপনাদের ঐ ফুলের বাগানে মাটির তলে ঠাকুর আছেন।" আমায় বলেছেন, "মাটি খুঁড়ে আমায় বের করে নিয়ে আয়।" বাবু বললেন, "কই! আমাদের এখানে তো কোন ঠাকুরও নেই, মন্দিরও নেই। আপনার ইচ্ছা হয়তো মাটী খুঁড়ে দেখুন।" এই বলে বাবু কটা লোক দিলেন, তারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ঐ শ্রীমুর্ত্তি পেলেন! শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় তাঁকে বুকে ক'রে নাচতে লাগলেন,—আনন্দে অভিভূত হয়ে কীর্ত্তন করতে করতে এখানে এই মন্দিরে এনে ঐ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন; এই যুগলকিশোর সেই মূর্ত্তি, তারপর আবার শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় দিদিকে ও আমাকে দেহ রাখবার কিছু দিন আগে বলে

গেছেন—"বারো বৎসর পরে দুইজন ব্রাহ্মণ বালক এখানে আসবেন, তাঁদের খুব যত্ন করে রেখো, সেবা ক'রো।" আমরা দিন গুনছি, আর অল্প কটা দিন পরেই বারো বৎসর হবে। তিনি বললেন, "তাঁর কথাতো মিথ্যা হবে না, নিশ্চয়ই তাঁরা আসছেন।"

এই বাক্যের সত্যতা আমি নিজে চোখেই দেখেছি। তখন ১২ বৎসর পূর্ণ হয়ে এসেছে মাত্র,—একদিন সখীমা সকালে উঠেই বলছেন, "আজ ১২ বৎসর পূর্ণ হোলো, নিতাই গৌর আসছেন; আমায় স্বপ্নে বলেছেন,—গঙ্গার ঘাটে তুমি চল! ওপারে আমরা দুভাই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা কীর্ত্তন করতে করতে আমাদের নিয়ে এস।" একথা শুনে সখীমার সঙ্গে কীর্ত্তন করতে করতে আমরা গেলাম গঙ্গাতীরে। একজন বৈষ্ণবের ঠাকুর ঐ নিতাই গৌর! তাকেও স্বপ্নে বলেছেন, "আমাকে তুই নিয়ে গিয়ে ললিতা সখীর আশ্রমে চল, আমি এখন সেখানে থাকব!" ঐ বৃদ্ধ শ্রীবাবাজী মহাশয় তার নিতাই গৌর নিয়ে গঙ্গার তীরে এসে অপেক্ষা করছেন। এপার থেকে নৌকা পাঠান হোলো। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় অঝোর নয়নে নিতাই গৌরকে কোলে ক'রে নৌকায় ক'রে এপারে এসে দেখছেন,—সখীমা সদল বলে কীর্ত্তন কোর্ত্তে কোর্ত্তে তীরে এসে অপেক্ষা ক'রছেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, "ভাগ্যবতী ভাগ্যবান সব আপনারা। নিতাই গৌর আর আমার কাছে থাকতে চাইলেন না। তাঁরা আপনাদের সেবাই গ্রহণ করবেন।" কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, স্বপ্নে বলেছেন "আমাদের নিয়ে তাদের কাছে রেখে আয়।" তিনি বললেন, "তাঁদের যাতে সুখ হয়, যেখানেই তাঁরা থাকতে চান তাই আমাদের সুখ। আমি আদেশ মত নিতাই গৌরকে এখানে নিয়ে এসেছি, আপনারা গ্রহণ করুন" এই বলেই চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন। এই ব্যাপার দেখে আঁখি জল আর কেহই সামলাতে পারলো না; কীর্ত্তন করে তাঁদের এইখানে নিয়ে আসা হল। ঐ মন্দিরে

দু'ভাই বসলেন, অপূর্ব্ব সুঠাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হোলো। সেই মূর্ত্তিই পূজিত হোচ্ছেন এখন।

শ্রীসখীমা ও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে এইকথা আগে শুনেছি আবার তাঁদের বাক্যের সত্যতা নিজে চোখেই দেখেছি। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকিয়ে আছি। আবার যুগল কিশোর কিরূপভাবে সমাজ বাড়ীতে আসেন, সেই সব বৃত্তান্ত শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার আবার একটা কথা মনে পড়ল অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমাকে ঐ যে হরিসভার গৌর দেখালেন, কি সুন্দর নাটুয়া মূরতি! কি সুন্দর নাচা গৌর! এমন গৌরের শ্রীমূর্ত্তি কোথায়ও দেখিনি। আমার বড্ড ভালো লাগে ঐ নাচা গৌর! গৌর ওখানে কি করে এলেন সে-কথা একদিন বলবেন বলেছিলেন।" এই কথা শুনা মাত্র শ্রীপাদ আনন্দে উদ্বেল হয়ে বলতে লাগলেন, "শুনবে? তবে শোন!" ঐ যে হরিসভার গৌরের সেবাইত স্মৃতিকণ্ঠ গোস্বামীকে দেখেছ? ঐ স্মৃতিকণ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়ের, পিতা ও পিতামহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে সুন্দর একটি টোল ছিল। বহু বিদ্যার্থী সেখানে পড়ত। শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে স্মৃতির প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মথুরানাথ যদিও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হলেন তবুও তিনি বৈষ্ণবদের সঙ্গে খুব মিশতেন ও তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা ক'রে পরমানন্দে দিন কাটাতেন। একদিন রাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন আম্পুলে পাড়ায় যাবেন, তাঁর সঙ্গে বিদ্যারত্ন মহাশয়ও গেলেন। সবাই বড় বড় পণ্ডিত। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতে চলেছেন তাঁরা। যেই পোড়ামা তলায় এলেন অমনি তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাড়ী চলে গেলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক রাত্রি হয়েছে ভেবে বাড়ী যাবেন ঠিক করেছেন অমনি দেখতে পেলেন অদূরে একটা কীর্ত্তনের দল আসছে। তিনি মনে

করলেন, নিজ পুত্র মথুরানাথই বুঝি কীর্ত্তনের দল নিয়ে আসছে। কীর্ত্তনের দল ক্রমেই কাছে আসছে! অমনি দেখতে পেলেন, এক সুন্দর যুবক পুরুষ কীর্ত্তনের মধ্যে দুই হাত তুলে নৃত্য করতে করতে আসছে। তাঁর অঙ্গে জ্যোতি বের হচ্ছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে ঐ সুন্দর যুবকটির কথা ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে পড়লেন। তাঁর পদও আর চলে না, মুখেও আর কথা সরেনা! তাঁর সম্মুখ দিয়েই ঐ কীর্ত্তনের দল চলে গেল। তিনি ঐ যুবক গোঁসাইয়ের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন! তারপর তিনি দেখলেন যে, ঐ কীর্ত্তনের দল বুড়া শিব তলার রাস্তা ধরে চলে গেল।

শ্রীবিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর পুত্র মথুরানাথের টোল বাড়ীর দিকে চলতে লাগলেন। টোল বাড়ীর নিকটে পৌঁছে দেখেন যে বিপ্রদাস শাঁখারী তার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই কীর্ত্তনের দলটী কোথাকার এবং কোথায় গেলেন তা বলতে পার?" বিপ্রদাস বলল, "কীর্ত্তনের শব্দ শুনে ঘর হ'তে বের হয়ে এসে দেখি কেউ কোথাও নেই।" তিনি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে তখনই আগমেশ্বরী তলায় নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হোলেন। বাড়ী এসে দেখেন সব নিস্তব্ধ, আর কাউকে ডাকাডাকি না করে চৌরী ঘরে এসে ভাবতে লাগলেন,—"কে এই গোঁসাই, এমন অপূর্ব্ব পুরুষ, কি সুন্দর রূপ ওঁর! রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে আবার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চারিদিক যেন উজ্জ্বল হয়ে গেছে। কি সুন্দর তাঁর পদ্মপলাশ-লোচন যুগল, তিলফুল-নিন্দন-নাসা, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, ক্ষীণকটী! আবার দেখলেন, আজানুলম্বিত এক হস্ত নীচুতে আর এক হস্ত ঊর্ধ্বে তুলে নাচছেন! অতি সুঠাম তাঁর অঙ্গুলী বিন্যাস; এক পায়ের উপর এক পা ছেঁদে অঙ্গুষ্ঠে ভর ক'রে নৃত্য করে চলেছেন! স্নিগ্ধ চাঁদিমা-জ্যোৎস্নার মত তাঁর অঙ্গ জ্যোতি! পরিধানে তাঁর পীত রেশম-বস্ত্র, তাতে আবার সুন্দর লম্বমান কোঁচা।

স্বর্ণচম্পক-বরণও তাঁর ঐ রূপের কাছে হার মেনেছে! তিনি তাঁর কথাই বসে বসে ভাবছেন,—এঁকেতো কখনও এই শ্রীনবদ্বীপ ধামে দেখিনি; তারপর এত গভীর রাত্রে তিনি নাচতে নাচতে কোথায় গেলেন,—এই সব ভাবছেন।

ভাবতে ভাবতে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনেক সময় কেটে গেছে এমন সময় কে যেন মধুর স্বরে ডাকল; "ব্রজ ও ব্রজ"। বিদ্যারত্ন মহাশয় চারিদিকে চাইছেন কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে ভাবছেন, —ব্রজ বলে আমায় কে ডাকল! এই ভাবতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন কীর্ত্তনের দলের সেই যুবক গোঁসাই উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। অনিমিখ দৃষ্টিতে তিনি তাঁকে দেখতে লাগলেন! কিছুপরে ঐ যুবক গোঁসাই অতি মধুর স্বরে বললেন, "ব্রজ, দেখ্ আমাকে, ভাল করে দেখ্, আমিই গৌর," এই বলে নটন ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় নীরবে অপলক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে শ্রীগৌর কিশোর বললেন, "আমাকে যেরূপ নটন ভঙ্গীতে দেখলে, ঠিক এমনি করে আমার মূর্ত্তি প্রকাশ করবে। আমি তোমাদের টোল বাড়ীতেই থাকি। আর একটা কথা বলছি আমার মূর্ত্তি তৈরী করবে রামসীতা তলার বিহারী কুম্ভকারকে দিয়ে; আর কাউকে দিয়ে মূর্ত্তি গড়াবে না" এই কথা বলেই তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় আর স্থির থাকতে না পেরে চোখের জলে ভেসে উঠানে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন! কিছুক্ষণ পরে উঠে আলুথালু বেশে বলছেন,—"আর কি ঐ-রূপ দেখতে পাব! আর কি তোমার ঐ নাটুয়া মুরতি আমার নয়নের সামনে আসবেন! বিদ্যামদে আমি মত্ত ছিলাম। আমার অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে তুমি এসে দেখা দিলে। কি করুণা তোমার! ক্ষমা কর প্রভু আমায়, আমি মহা অপরাধী।" বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপ ভাবে চোখের জলে ভেসে বহু আক্ষেপ করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি আবেগের

মধ্যে ঐ কথা ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এল। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যারত্ন মহাশয় রামসীতা তলায় বিহারী কুম্ভকারের বাড়ী এলেন। এসেই তাকে দেখে বললেন, "বিহারী—তোমাকে একটি মূর্ত্তি তৈয়ারী ক'রে দিতে হবে। মূর্ত্তি হবে ঠিক রাধারাণীর মত, কিন্তু পুরুষ দেহ ধারী।" এইরূপ বলেই তিনি নটন ভঙ্গিতে দক্ষিণ হাত উপরে আর বাম হাত নিম্নদিকে রেখে দাঁড়ালেন। "ঠিক আমি যেমন করে দাঁড়ালুম তুমি ঠিক এমনি মূর্ত্তিই তৈয়ারী করবে।"

তাঁর কথা শুনে বিহারী কুম্ভকার বলল, "পণ্ডিত মহাশয়, আমি কুমোর—হাঁড়ি, সরা, গেলাস এই সমস্ত গড়ি, আপনাদের পাড়ায় কত মিস্ত্রী আছে তাদের দিয়ে মূর্ত্তি গড়ান।" বিদ্যারত্ন মহাশয় হেসে বললেন, "তোমাকেই মূর্ত্তি গড়তে হবে, আর কাউকে দিয়ে গড়াবনা। আমার গৌর কিশোর বলে দিয়েছেন তোমাকে দিয়েই গড়াতে।" এই ঘটনার পর থেকেই বিদ্যারত্ন মহাশয় যেন কেমন তর হয়ে গেলেন। কবে সেই গৌর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এই কেবল ভাবেন। নিজ পুত্র মথুরানাথকেও এসব কথা বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন নি, কিন্তু তাঁর ভাবের পরিবর্ত্তন সবাই বুঝতে পেরেছে। পিতার ভাবের পরিবর্ত্তন তাঁর পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় বেশ বুঝতে পাচ্ছেন এবং তাতে তিনি আনন্দই পাচ্ছেন।

একদিন বিহারী কুম্ভকার নিজ বাড়ীর বাহিরে বসে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের চিন্তা করছে, এমন সময় কে যেন ডাকল, "বিহারী, এই দেখ আমি এসেছি।" কি সুন্দর রূপ তাঁর যেন পূর্ণিমা চাঁদের মত মুখখানা দেখতে। প্রেম কণ্ঠে ঐ যুবক গোঁসাই বললেন, "বিহারী, আমায় ভাল করে দেখে রাখ, আর আমার দেহের সব স্থানের মাপ নিয়ে নেও। বিহারী কথা শুনে সুতোর মত দড়ি দিয়ে তাঁর শরীর মেপে ঠিক করে

নিল! মাপ নেওয়া শেষ হলে যুবক গোঁসাই বললেন, "আমাকে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমি যেমন করে দাঁড়াব ঠিক তেমনি করে মূর্ত্তি গড়বে বুঝতে পেরেছ তো! আর একটা কথা বলি তোমার ঘরে মুড়ি আছে, যদি থাকেতো নিয়ে এস।" এই কথা শুনে বিহারী বাড়ীতে গেল তারপর মুড়ি এনে দেখলো যে সেখানে কেউ নেই। বিহারী তাঁকে না দেখে পাগলের মত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটল এবং তাঁকে দেখতে পেয়ে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলল। "সেই সুন্দর যুবক গোঁসাই কোথায় গেলেন" বলেই কেঁদে ফেলল। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কথা শুনে বিহারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন, "ভাগ্যবান তুমি গৌরকে দেখেছ! তিনি তোমার কাছে মুড়ি খেতে চেয়েছেন. কি করুণা তাঁর। বিহারী বলল,— "এই দেখুন মাপের সুতোর দড়ি আমার হাতে রয়েছে। সে নিজে আমায় দিয়ে তাঁর দেহের মাপ পর্য্যন্ত দিয়েছে।" তারপর থেকেই বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বদাই আনমনে বিহ্বল অবস্থায় থাকেন। পুত্র পিতার এইরূপ ভাবান্তর দেখে এবং অন্তরালে বিহারী ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথাবার্ত্তা শুনে একদিন মথুর এসে তাঁর পিতাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করল। বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাব গদগদ কণ্ঠে আনুপূর্ব্বিক সব কথা বললেন। পুত্র এই সব কথা শুনে পরমানন্দিত হলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই করুণার অভিব্যক্তি শুনে কেঁদে ফেললেন এবং পিতার উপর তাঁর অহেতুকী করুণা দেখে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন।

তারপর পিতাপুত্রে বহুক্ষণ ধরে শ্রীগৌর কিশোরের লীলার কথা বলতে লাগলেন। তারপর বিহারী কুম্ভকারকে ডেকে শ্রীমূর্ত্তি গড়তে বলে দিলেন আর অল্পদিনের মধ্যেই মূর্ত্তিও তৈয়ারী হয়ে গেল। পিতা ও পুত্র দুইজনা পরামর্শ করে টোল বাড়ীতেই আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার দিন ঠিক

করলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ পুত্র মথুরানাথের দ্বারাই এই গৌর কিশোরের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করালেন। কত উৎসব-আনন্দ হলো; মহোৎসব হলো! বহুলোক এসে প্রসাদ পেলেন। এই উৎসবের ব্যয়ভার ষষ্ঠিচরণ ভাদুড়ীই স্বেচ্ছায় বহন করেছিলেন। মহোৎসবের শেষে পদরত্ন মহাশয় টোল বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে দেখছেন, কেউ অভুক্ত আছেন কিনা। হঠাৎ দেখতে পেলেন আঙ্গিনায় একটী কদম গাছে হেলান দিয়ে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাতা বিহারী কুম্ভকার নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বিহারী, প্রসাদ পেয়েছ কি? তোমার শ্রীমূর্ত্তি গড়ার টাকা কাল দোবো, আজ বড় লোকের ভীড়।" বিহারী কোন কথাই বলে না। নীরব নিস্পন্দের মতন দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখে বিদ্যারত্ন মহাশয় যেই তার হাত ধরলেন অমনি সে কাষ্ঠ খণ্ডের মত মাটিতে পড়ে গেল! তার যে প্রাণ চলে গেছে তা কেউ বুঝতেও পারে নাই! টোলের ছাত্রগণ, বিদ্যারত্ন মহাশয় ও ভাদুড়ী মহাশয় দেখলেন,—তার দেহে আর প্রাণ নাই! জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে! তারপর তাঁরা মহাসমারোহে কীর্ত্তন করতে করতে তার দেহ পুষ্প-মাল্যাচ্ছাদিত ক'রে গঙ্গায় নিয়ে এসে তার পবিত্র দেহ গঙ্গাতেই ভাসিয়ে দিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ও পদরত্ন মহাশয় বিহারীর অভাবে বড়ই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। এখন সেই টোল বাড়ী গৌরের বাড়ী হয়ে গেছে। তাঁরা পিতা পুত্রে মহাপ্রভুর সেবা করতে লাগলেন। আগমেশ্বরী তলায় নিজ বসত বাটী ত্যাগ করে মন্দিরের পশ্চাতে তাঁরা বাড়ী করে সপরিবারে ঐ খানেই বাস করতে লাগলেন।

একদিন এক ক্ষ্যাপা সাধু এক যুগল বিগ্রহ নিয়ে এসেছেন! গৌর কিশোরের সম্মুখে সেই বিগ্রহ বসালেন। ক্ষ্যাপা বলল,—পরমানন্দে এঁর সেবা করিও। পদরত্ন মহাশয় পরমানন্দে এঁদের সেবা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে বিদ্যারত্ন মহাশয় দেহরক্ষা

করলেন। তারপর পদরত্ন মথুরানাথকেই শ্রীমহাপ্রভুর সেবা পূজা তিন চার বৎসর করতে হল। তার শেষে তাঁর তৃতীয় পুত্র স্মৃতিকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁর পিতার আদেশে সেবার ভার গ্রহণ করলেন। চারিদিকে এই হরিসভার গৌরের প্রতিষ্ঠার কথা ও তাঁর মহিমার কথা জন সমাজে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি শ্রীপাদের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতিতবৎসল লীলা ও ভক্তবৎসল লীলা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেললাম! বসে বসে খুব কাঁদছি দেখে তিনি স্নেহ বসে ডাকলেন, "ময়না! ওঠো আর কত কাঁদবে, কাঁদবার দিন পড়ে আছে;—বুঝবে একদিন।"

আমি তাঁর এ হেয়ালির কথা বুঝতে পারিনি তখন, এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এইরূপ ভাবে পরমানন্দে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীপাদের মধুময় সঙ্গে আমার দিনগুলো কাটছে। আজ আবার সন্ধ্যার পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গণ সহ নেমন্তন্ন হয়েছে,—মঠের অনতিদূরেই শ্রীহরিদাসের বাড়ীতে। বনগাঁয়ে শ্রীহরিদাসের আদি বাড়ী। এখন স্ত্রীপুত্র কন্যা সহ তিনি ধামে বাস করেন। অপূর্ব্ব তাঁর শ্রীগুরু নিষ্ঠা।

শ্রীগুরুই যেন তাঁর জীবনের সর্ব্বস্ব। শ্রীগুরু সেবা করতে এতটুকু কার্পণ্য তাঁর নাই,—কি ক'রে তাঁকে সেবা করবেন, কি ক'রে তিনি সুখী হবেন এই তাঁর ধ্যান, এই তাঁর জ্ঞান। তিনি ভাল ভাল বস্তু জোগাড় করেছেন তাঁর সেবার জন্য। তিনি একখানা খুব দামী সুন্দর খাট কিনে এনে রেখেছেন এই আশায় যে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কৃপা ক'রে তাতে বিশ্রাম করবেন; তাতেই হরিদাসের অপার আনন্দ; অসীম পরিতৃপ্তি!

সন্ধ্যায় আরতি কীর্ত্তন শেষ হোলো। তারপর রূপ অভিসার কীর্ত্তন শেষ হয়ে গেল, অতঃপর আমরা মঠের সবাই শ্রীহরিদা'র বাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে প্রসাদ পেতে গেলাম। পাতা গ্লাস পেতে ঠিক ক'রে রেখেছেন, যার যেখানে ইচ্ছে বসে

গেলেন। একটি ঘরে কেবল শ্রীল বাবাজী মহাশয়, হরিদা', তাঁর স্ত্রী, মেঘলালদা' ও আমি রইলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসলেন হরিদা' ও আমি দু'খানা পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করতে লাগলুম,—তিনি হেসে কত গল্প করছেন! প্রসাদ পাওয়া শেষ হোলো; এখন শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভেলভেটের আসন পাতা একটি সুন্দর চেয়ারে ধীরে বসলেন। হরিদাদা সুন্দর সুগন্ধ পান প্রসাদ দিলেন, তিনি পেতে লাগলেন। আর আমরাও ঐ খানেই প্রসাদ পেতে বসে গেলাম। রাত্রি তখন ১২॥টা, আমরা তাড়াতাড়ি প্রসাদ পেয়ে উঠলাম। হরিদাদা জোড় হাত ক'রে বলছেন,—"রাত অনেক হয়ে গেল, কৃপা ক'রে আজ এই খাটে একটু বিশ্রাম করুন। আপনার সেবার জন্যই এই নূতন খাট কয়দিন হল এনে রেখেছি। শ্রীপাদ সুন্দর মশারীর দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,—"আচ্ছা এখানেই বিশ্রাম করব। —ভক্ত বাঞ্ছাগো ভক্ত বাঞ্ছা"—বলে হেসে উঠলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেই শুলেন অমনি ঘুমিয়ে পড়লেন,—আমরা প্রসাদ পেয়ে উঠে দেখি শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঘুমিয়ে পড়েছেন! আমরাও কোন দ্বিধা না ক'রে নীচুতে একটা সতরঞ্জি পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম,—হরিদাদা সমস্ত রাত্রি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করছেন! সেদিন খুব ভোরে উঠেছি, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও উঠেছেন। মেঘলালদা'ও উঠে পড়েছেন। আমি কোন দিনই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ঘুম থেকে উঠতে পারিনি, আজ উঠে পড়েছি! শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বললেন,—"যাক, উঠে পড়েছ, নইলে চুলের মুট ধরে টেনে উঠাতুম।" আমি হেসে ফেললাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে, চাদর বগলে ক'রে বললেন,—"চল মঠে যাই, প্রভাতি নাম আরম্ভ হয়েছে, চল নাম করবে।" তাঁর সঙ্গে মঠে এলাম। মুরারীদা', গোপীদা' ও তারকদা' নাম ধরে পরিক্রমা কেবল আরম্ভ করেছেন অমনি

শ্রীল বাবাজী মহাশয়, এসে নামে দণ্ডবৎ করে নাম ধ'রলেন। প্রভাতি সুরে নাম ধরে মন্দির পরিক্রমা করছেন! আর তাঁর সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠধ্বনি শুনে চারিদিক হতে লোক এসে জুটলো, হরেকেষ্টদা' ও মদনদা' খোল বাজাচ্ছেন। একে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে নাম, তারপর তাঁর সেই অপূর্ব্ব প্রেমকণ্ঠস্বর! নামে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হতে লাগল! এ-কি সুন্দর টেনে আঁখর দিয়ে নাম ধরছেন,—ভজরে দিন বয়ে যায়রে, "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। সাধ্য সাধন নির্ণয় করা নাম। পাগলের প্রাণারাম। আমাদের গলায় পরাবে বলে কত সাধের গাঁথা নাম, প্রাণ ভরে বল ভাইরে, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরেকৃষ্ণ হরে রাম।" বহুক্ষণ নাম কীর্ত্তন ক'রে তিনি নাট মন্দিরে এসে আরো বহু সময় বসে প্রভাতি কীর্ত্তন করলেন। কীর্ত্তন প্রায় এগারটার সময় শেষ হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে নিজ ভজন কুটীরে এলেন।

আজই তিনি সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হবেন এই কথা শুনতে পেলাম। একজন বলছেন,—"আজ তোমার প্রেমের শেষ দিন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আদর পেয়ে মাথায় উঠেছ তুমি, আজ বেরিয়ে যাবে সব। তাঁর সঙ্গে তাঁর পারিষদ ছাড়া আর কেউ যাবেনা, এই দেখ নামের লিষ্টি হয়েছে। তোমাকে এইখানেই রেখে যাবেন। মঠের ডাটা চচ্চড়ী খাও এখন; তোমার সন্দেশ খাওয়া, রাজভোগ খাওয়া, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আদর পাওয়া এখন এইখানেই শেষ। তুমি কি পেয়ে বসেছ শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে! এইবার তুমি কেমন মজা দেখে নেবে!" আমি তার এই কথা শুনে বেদনায় অভিভূত হয়ে তার দিকে তাকালুম। অমনি তিনি বললেন,—"কি দেখছো! এইবার তাঁর বিছানায় শোয়া, তাঁর সঙ্গে প্রসাদ খাওয়া, আদরও সব বের হবে! তাঁর শিষ্য ছাড়া কেউ সঙ্গে যাবে না, যারা গান কীর্ত্তন করতে পারে তারা যাবে; তোমাকে কেন নিয়ে যাবেন! কেবল

প্যান প্যান ক'রে কাঁদলেই হোলো নাকি, এতদিন আছ, কত লোক শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে মন্ত্র নিল, আর তুমি ভারী বাম্‌নাই দেখাচ্ছো।" তার এই সব কঠোর বাক্য শুনে আমি মরমে যেন মরে গেলাম। আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ পাব না, আমায় ছেড়ে, ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন এই দুঃখ আমার রাখবার জায়গা নেই, একবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে উঁকি মারতেই দেখি, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কলকাতায় যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন, আমার দিকে একবার মাত্র তাকালেন, আর কোনো কথা বলবারই তিনি অবসর পেলেন না। বহুলোক তাঁকে দর্শন করতে এসেছে। আমি নিরাশ হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরের পেছনে বসে বসে কাঁদছি, কারণ কেউ দেখতে পাবেনা সেখানে ; ঘরের পেছনে ছোট ছোট গাছ, বড় কেউ যায়না সেথা। সবাই এদিক থেকে চলে গেছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঠাকুর গাড়ীতে উঠেছেন, পারিষদ সবাই গাড়ীতে পোটলা পুটলী নিয়ে উঠেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর বিগ্রহ ও সখীমাকে দণ্ডবৎ ক'রে যেই গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন অমনি ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর পারিষদদের বলছেন,—"ব্রহ্মচারী কোথায় ?" অমনি একজন বলছেন,—"তার নাম লিষ্টে লেখা হয়নি তারপর সে তো মন্ত্র নেয়নি, আমাদের গুরুভাই নয়, শিষ্যও হয়নি।" অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু রুষ্ট হয়ে বলছেন,—"তুমি ভারি শিষ্য হয়েছো, কি গুরুভক্তি তোমার !" এই কথা বলেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। আমার নাম ধরে ডাকলেন, সাড়া না পেয়ে ঘরের পেছনে নিজেই গিয়ে আমায় দেখে আমার হাত ধরে উঠালেন, আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কান্না কিসের ?" আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম,—"ওরা আমায় নেবেনা আমায় বাদ দিয়েছে, আমি আপনার শিষ্য হয়নি বলে।" —"ও! এই কথা ! আমি ওকে মজা দেখিয়ে দোবো,

চল আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আমার গাড়ীতেই উঠবে এবং আমার পাশে বসে থাকবে। বেটার ভণ্ডামি আমি ভেঙ্গে দেবো।” আমি তাঁর কথা শুনে আশ্বস্ত হোলাম, আনন্দে হৃদয় ভরে গেল। আমি আস্তে আস্তে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর কাছে গেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আগে গাড়ীতে উঠলেন, আমায় পাশে উঠতে বললেন। যে লোকটি আমায় ঐ কথা বলেছিল সে পরের গাড়ীখানায় উঠেছে। বেশ গম্ভীর মুখে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছিল,—আমি ভয়ানক দুষ্টু, তাই চকিতের মত তার দিকে তাকিয়ে হেসে তাহাকে বুড় আঙ্গুল দেখিয়ে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। —হরি বোল—বলে গাড়ী ছেড়ে দিল আমরা কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনে এসে পৌঁছিলাম।

খানিক পরে রেলগাড়ী ষ্টেশনে আসল, আমরা একটা কামরা ফাঁকা দেখে সবাই মিলে তাতে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নেহ ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, আদর ক'রে কাছে বসিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন—এই আনন্দ আমার আর ধরেনা, আমি একেবারে মসগুল হয়ে গেছি। খুব হাসতে হাসতে সেই লোকটিকে বলছি,—“কিহে, আমার লিষ্ট হয়নি, আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য নই, আমাকে নিয়ে আসবেনা বলেছিলে, কেমন লাগছে এখন?” এই সব কথা বলে ঠাট্টা কচ্ছি! এই কথা শ্রীল বাবাজী মহাশয় শুনে, হেসে আমার গালে চড় দিয়ে বললেন,— “থাম্। ফাঁক পেলে তোমায় মজা দেখিয়ে দেবে, একে চেননা? তুমিও যেমন সাধু হয়েছ এও তোমার চাইতে আরো বেশী সাধু। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বলতে লাগলেন,— “দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্য এসব ত্যাগ না হলে কেউ মানুষ হোতে পারে না, সাধুও হোতে পারে না, ভক্তি-পথে দীনতাই হোচ্ছে প্রধান পাথেয়। দীন না হোলে ভক্তি দেবী সেখানে আসেন না; মানুষের

হৃদয়ে অহঙ্কার, দম্ভ ও দর্প ইত্যাদি সব আবির্ভূত হলে তার সব কিছুই পণ্ডশ্রম হয়। উত্তম জাতি যার সে সেই জাতির অভিমান ভুলে যাবে, সর্ব্বদাই দীনাতিদীন হয়ে থাকবে। আর নীচ জাতি যে, সে সর্ব্বদাই মনে রাখবে আমি নীচজাতি। ঠাকুর কৃপা ক'রে ও শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমায় নাম-মন্ত্র ও বেশ আশ্রয় দিয়েছেন। ভেকের মানে কি জান?—পুরুষ অভিমান ভুলে যাওয়া আর কাঙ্গাল হইয়া সমস্ত সাধু শ্রীবৈষ্ণবদের চরণে লুটিয়ে থাকতে পারা;—এই জন্য পৈতা ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণেরা দীনাতিদীন হয়ে নির্ব্বিচারে সবার পদধূলি গ্রহণ করতে পারে; এই জন্যই এই কাঙ্গাল বেশ আমাদের, কিন্তু আজকাল চুলোর দুয়ারে গেছে এ-সব! জাতি, বিদ্যা, রূপ, মহত্ত্ব ও যৌবন এই পাঁচটি অভিমান ত্যাগ হোলে তবে সেই আধারে ভক্তিদেবী আসেন। ঐতো একটা কথা আছে—'বৈষ্ণব হইতে ছিল মনে বড় সাধ। তৃণাদপি সুনীচেন-তে পড়ে গেল বাদ।' আজ কাল কথায় কথায় সবাই বলে আমরা ত্যাগী, আমরা বিরক্ত বৈষ্ণব, আর ওরা গৃহী লোক, গৃহ-মেধী সব। এই সব বড় বড় কথা অনেকের মুখে শুনি।" আবার তিনি বললেন,—"কি ত্যাগ করেছ বাবা!—খাওয়া ভাল চাই, ভাল ভাল কাপড় চাই, সুখ স্বচ্ছন্দটা সর্ব্বদাই চাই, নইলে সবার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সংসারে থাকতে কেউ বাবা মা'র সেবা করে নি। গুরুজনদের সেবা করে নি। যাঁরা কোলে পিঠে করে মানুষ করল কোনদিনই তাঁদের সেবা করল না। পিতৃঋণ মাতৃঋণ কেউ শোধ করেনি! সুবিধাবাদী সব! তাই তাঁদের কলা দেখিয়ে মঠে এসে সাধু সেজে শ্রীগুরু সেবা করবে কায়মনে! কিন্তু তা হোলো কই? নিজের সেবাটা ঠিক হওয়া চাই, আর কারও সেবা হোক আর নাই হোক। ত্যাগের মধ্যে দেখছি, পিতা মাতাতো ত্যাগ করেছিই। আবার শ্রীগুরু গোবিন্দও ত্যাগ ক'রে একটা কিম্ভূত-কিমাকার সেজে বসলাম!

অহঙ্কারের মূর্ত্ত স্বরূপ হয়ে বসলাম। আবার অনেকের ধর্ম্ম-মা পাতান দেখি। একটা গল্প মনে পড়ে :—একজন মা বাপ ছেড়ে নবদ্বীপ ধামে ভেক নিয়ে বাবাজী হয়েছেন। বাবা তার মারা গেছেন, মা বেঁচে আছেন এবং ঐ নবদ্বীপ ধামেই থাকেন, কিন্তু মা'র কাছে তিনি যান না বা সেবাও করেন না, বলেন—'ও তো মায়া। মায়া ত্যাগ করে এসেছি আবার মায়ার কাছে যাবো কেন?' —এইসব কথাও শুনতে পাই। একদিন দেখলাম বাজার থেকে ঐ লোকটি একটি ধামা মাথায় ক'রে আসছেন; তার ভিতর চাল, তরিতরকারী ইত্যাদি বাজার করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'কিহে ভক্ত মহাশয়, মাথায় ধামা কেন?' অমনি মধুর হেসে উত্তর দিলেন,—'এই ধামে আমার একটি ধর্ম্ম-মা হয়েছেন, তাঁর সেবার জন্য এই সব তরিতরকারী কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আমি বললাম,—'বেশ বেশ, আপনার অধর্ম্ম-মা,—যিনি গর্ভধারিণী —তাঁকে কতদিন ত্যাগ করেছেন? ধর্ম্ম-মা পেয়ে বুঝি অধর্ম্ম-মা ত্যাগ হয়েছে'।" আমরা সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলাম।

আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলতে লাগলেন,—"সংসার শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অনুকূল না হোলে তবে ছেড়ে আসতে হয়। অনুকূলতা এ পথে আছে সত্য; কিন্তু সংসার ছেড়ে এসে, শেষে এরূপ দাম্ভিকেই সব পরিণত হয়! অনেকেরই এই ভাগ্য! বৈরাগ্য এই কলি যুগে হয় না। যারা একটু বেশী বৈরাগ্য দেখাতে যাবে অমনি তাদের উৎকট ব্যাধি এসে জোটে, শেষে ঔষধ ও পথ্য ও একটি থল-নোড়া নিয়ে দিন কাটাতে হয়। মনে ভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামীর মত এক বৃক্ষতলে বাস করব, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মত মাঠা খেয়ে ভজন করব। দুচার দিন এই রকম একটু বৈরাগ্য করেই সব কুপোকাৎ।" আবার বলছেন,—"এ যে কলিযুগ, মানুষের অন্নগত প্রাণ, নিদ্রালু স্বভাব, মন্দ ভাগ্য, রোগব্যাধি ক্লিষ্ট দেহ, তাদের কখনও বৈরাগ্য হয় না, সেই জন্য কেউ

বাড়াবাড়ি কোরোনা, সময় মত দুটো প্রসাদ পাও, আর নাম কীর্ত্তন কর। আমি সাধু হয়েছি, তেল মাখিনা, মাছ খাইনা,—এইই কি সাধুতার লক্ষণ ?" তিনি আমার দিকে হেসে হেসে বলছেন,—"তোমাদের দেশে তেল না মাখলে আর মাছ না খেলে সবাই তাকে সাধু বলে। কেমন এই কথা নয় ?" আমি বললাম,—"হাঁ ঠিক কথাই শুনেছেন। তবে আমি কিন্তু কোন দিনই সাধু হব না কেবল আপনার কাছে থাকব,—এইমাত্র চাইব।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় আনন্দে হেসে আমার গালে একটা আদর করে চড় মারলেন। তিনি এইরূপ কত সুন্দর কথা আমাদের বুঝিয়ে বলছেন। এই গাড়ীতে চারুদা'ও আছেন, বলাইদা'ও আছেন আবার পাঁচুদাদা ও তাঁর স্ত্রীও আছেন। এই পাঁচুদা'র বাড়ীতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় যাবেন। আজ অল্পকদিন হোলো শ্রীল বাবাজী মহাশয় পাঁচুদা'র বাড়ীতে থেকেই কীর্ত্তন প্রচার করেন। সদল বলে তিনি ওখানেই থাকেন।

পাঁচুদা'কে দেখে আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীপাদ আমায় বলছেন,—"বলতো গেরস্ত লোক, না যারা সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে এসেছেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, বড় কে।" আমি অমনি বলে ফেললাম,—"যারা সংসার ছেড়ে আসে, সাধু হয় তারাইতো বড়।" অমনি তিনি হেসে বললেন,—"আচ্ছা দেখতো, যারা মায়ার ভয়ে স্ত্রী পুত্র ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গিয়ে সাধু হয়,—তারা কেবল স্ত্রী, মা বাবা পুত্র কন্যার ভয়েই সংসার ছেড়ে চলে আসে আর তাদের খোঁজ করতেও চায় না। আর গেরস্ত লোক সেই সব মায়া,—স্ত্রী-পুত্র-মা সঙ্গে ক'রে বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে এসে সাধুদের চরণ ধূলি নেন, তাদের সেবা কত যত্নে করেন! মায়া ত্যাগ ক'রে তাঁরা আসেন না। মায়া ট্যাকে করেই তাঁরা আসেন। সাধুরা তো মায়ার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন আর ওরা মায়া ট্যাকে করে সাধুদের সঙ্গ করতে আসেন, তাহলে বল কে শ্রেষ্ঠ ?" আমি কথাগুলো বেশ

বুঝে ফেললাম, অমনি বলছি,—"তাহলে ওঁরাই তো শ্রেষ্ঠ। ওঁরা তো ভয় পান না মায়া দেখে, মায়া কাছে রেখেই সাধু বৈষ্ণব সেবা করেন, সাধুসঙ্গ লাভ করেন, তাহলে তো এঁরাই সবচেয়ে বড় সাধু। যারা ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে তারা কি করে বড় হবে?" "এই দেখ্না আমরা সব এবার কলকাতা গিয়ে গেরস্তর বাড়ীতেই থাকব, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে প্রভুর কেমন সুন্দর সেবা করেন, আবার স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সাধু বৈষ্ণবের প্রাণপণ সেবাও গৃহস্থের ভজনের অনুকূল হয়। নিজেরা ভাল খানও না। কি ক'রে ঠাকুরের ভাল ভাল ভোগ দিয়ে আমাদের খাওয়াবেন, কি ক'রে আমাদের যত্ন করবেন, কি ক'রে আমাদের শরীর সুস্থ থাকবে তাই তাঁরা ভাবেন। আমরা তাঁদের কেউ নই তবুও তাঁরা আমাদের কত আপন মনে করে সেবা করেন। তাঁদের বাড়ী আমাদের ছেড়ে দেন,—অবারিত দ্বার আমাদের, মোটেই কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নেই, যেন আমরাই তাঁদের সবচেয়ে নিজ জন। দেখ্ তো ওঁদের কি উন্নত হৃদয়! ভগবান ও তাঁর ভক্তকে কত আপন জন মনে করেন! আবার সব চেয়ে বেশী মনে করেন ভক্তকে, বৈষ্ণবের বেশ দেখলেই তাঁরা দণ্ডবৎ করেন, কত সেবা করেন! গৃহে নিয়ে গিয়ে কত রকমে তাঁদের সেবা করেন, ধন বিত্ত দিয়ে তাঁদের সুখী করেন। তবে বল্ দেখি কেন ওঁরা আমাদের চাইতে বড় হবেন না। ভক্তি যার আছে সেই বড় হবে, সে ত্যাগীই হোক বা গৃহী হোক। ঘর ছেড়ে ত্যাগী হয়েও যাঁদের অন্তরে বাসনা ও কামনা থাকে, তাদের এ-অবস্থাকে 'ফল্গু' বৈরাগ্য বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"ফল্গু বৈরাগ্য কি?" অমনি হেসে বললেন, "ফল্গু নদীতে গিয়ে দেখবি উপরে বালু শুকনো খট্ খট্ কোচ্ছে। জলের গন্ধই নেই। হাত দিয়ে একটু বালী খুঁড়লেই জল বেরিয়ে পড়বে,—অন্তঃসলিলা! উপরে বালী, ভিতরে জলের ধারা, এই ফল্গুনদী! বুঝেছ [illegible]?" তেমনি অনেকে বৈরাগী হয় কিন্তু অন্তরে বাসনা ভোগের। বাইরে ত্যাগ দেখায় কিন্তু অন্তরে ফল্গু ধারার মত

ভোগের বাসনা থাকে, তারা কপটী, ইহাই হোচ্ছে ফল্গু বৈরাগ্য। তারপর শ্রীমহাপ্রভু বলেছেন,—জ্ঞান বৈরাগ্য নহে ভক্তির অঙ্গ। তাই যদি কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ও নিশ্চিত দাস হতে পারেন তবে তাঁর সবই হয়ে যায়, 'বৈরাগ্য' আর বেশী কথা কি! কিন্তু ভজন মার্গে অকৈতব বৈরাগ্য চাই-ই! এই দেখ মহাজন বাণী,—'মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান! যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান।' তবে ভক্তি হলে সবই হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগ হলে, সব বিষয়ে বীতরাগ এসে যায়। আমাদের অনুরাগই নেই তাই বীতরাগও হয় না।"

"শুন্‌বি! আমার গুরুদেবের কথা, তাঁর গায়ে হাজার টাকার শাল পরিয়েছে ভক্তেরা;—খানিকক্ষণ ভক্তের সুখের জন্য তিনি গায়ে দিলেন। শাল হাতে ক'রে তিনি বার বার দেখলেন,—বড় সুন্দর! ভক্ত বেশ খুশী হলো। তারপরের কাণ্ডটা শুনবে?—একটা দিয়াশলাই কাটি জ্বালিয়ে শালটা পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। তিনি বললেন— 'এ গায়ে দিলে অহঙ্কার আসে, এতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় না।' কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক যেটি হোতো তিনি তন্মুহূর্ত্তেই তা ত্যাগ করতেন। দেখ্ দেখি, এমন বৈরাগ্য মানুষের হয় কি? হাজার টাকার শাল পুড়িয়ে দিলেন! আবার শুন্‌বি, পুরীতে ঝাঁজ-পেটা মঠে আছি তাঁর কাছে। খুব কষ্টে তখন ঠাকুর সেবা হয়, ভিক্ষে ক'রে কিছু চাল মাত্র হয়, আর দুচারটে পয়সা,—নাম ক'রে ভিক্ষা ক'রে মঠ চলে! ওতেই ঠাকুরের সেবা হয়, আবার সাধু বৈষ্ণবের সেবাও হয়। এক-এক দিন সজিনা পাতার শাক ও দুটো অন্ন মাত্র ঠাকুরের ভোগ হয়! সেই প্রসাদই তিনি পান, আমরাও পাই। মাসের মধ্যে ২৫ দিনই এই রকম; কখনও কখনও নিমন্ত্রণ হোলে বা কেউ দিলে তবে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ডাল লাফড়া প্রভৃতি পেতাম। তাও কচিৎ দুই একদিন মাত্র। এমন কষ্টে সবাই তখন মঠে জীবন যাপন করতাম! একদিন শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের এক ভক্ত ৫০ হাজার টাকার নোট-ভরা একটা থলি এনে তাঁর সামনে রেখে

বললেন, —'এই থলিতে ৫০ হাজার টাকা আছে, ইহা আমি আপনাকে দিলাম।' শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় বললেন,—'এই টাকা ওখানে ঠাকুরকে দাও গিয়ে।' তিনি বললেন,—'আমি ঠাকুর ঠুকুর কিছু বুঝিনি, বুঝতেও চাইনে; আপনাকেই শুধু বুঝেছি, আপনাকেই দিলাম।' যেই এই কথা বলা অমনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন,—'ঠাকুরের আশ্রম হোতে ওকে তোমরা এই মুহূর্ত্তে বের করে দাও, এই টাকা ওর সঙ্গে দিয়ে দাও, টাকা যেখানে রেখেছিল সেখানে গোবর জলের ছিটে দাও।' তিনি সক্ষোভে বললেন,—'যারা ঠাকুর দেবতা মানে না তারা আবার আমাকে ভারি ভক্তি দেখাচ্ছে! ওদের ঐ তামসিক অর্থ নেওয়া তো দূরের কথা, এইরূপ কথা শুনলেই আমার মন-প্রাণ শুকিয়ে যায়! —বলে কিনা ঠাকুর ঠুকুর দিয়ে কি হবে, আমি ঠাকুর বুঝি না, তোমাকেই সব বুঝি, এত বড় ভক্তি বিরোধী কথা! এদের দর্শন করলেও আমার মন মলিন হয়ে যায়। ঠাকুরও মানে না, ভগবানও মানে না, আর আমার উপর ভারি ভক্তি দেখাচ্ছে! এখনই একে এখান থেকে বের করে গোবর জল ছিটিয়ে দাও।' অমনি সবাই মিলে তাকে ওখান থেকে বের করে দিয়ে ঐ স্থানে গোবর জল ছিটিয়ে দিলেন। শ্রীভগবানকে যারা ভক্তি করে না, তাদের দানও তাঁরা গ্রহণ করেন না। ৫০ হাজার টাকা অম্লান বদনে ত্যাগ করলেন, ফিরেও তাকালেন না একবার! দেখ্‌দেখি, কি বৈরাগ্য! কি ত্যাগ ওঁর! একেই বলে ত্যাগ, যার কিছুই নাই সে আবার কি ত্যাগ করবে। পশ্চিমে একটা কথা আছে, 'ঘরমে হুয়া খটপর, চল বাবাজী কা মঠ পর।' মানে বুঝলি,—আমি বললাম, না। —ঘরে স্ত্রী, বাবা, মা এদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ঝগড়া হোলো আর অমনি বাবাজী-দের মঠে এল। এ-সব বৈরাগ্য নয়; তবে এতেও কল্যাণ হয়,—অনেক সাধু বৈষ্ণবের দর্শন হয়, একটু একটু নাম করবার অভ্যাস হয়। নাম না কর[illegible] কেউ মঠে থাকতে দেবে না। আবার ঠাকুর সেবার একটু একটু কাজও করতে হবে নইলে মঠে বসে খেতে দেবে কেন?

এই নাম করতে করতে ও ঠাকুর সেবার কাজ করতে করতে চিত্ত শুদ্ধি হবে। আবার তারা ভগবৎ কথাও শুনতে পায় বলে, আস্তে আস্তে ভক্তিপথও বুঝতে পারে। নাম করা, তিলক ধারণ করা ও মহাপ্রসাদ পাওয়া—এগুলো পরম ভাগ্যে হয়!" এইরূপ উপদেশমূলক কত সুন্দর কথা বলতে বলতে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছিল। আস্তে আস্তে সবাই আমরা নেমে ট্রামের কাছে এলাম। সবাই ট্রামে উঠল। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়, মেঘলাল দা' ও আমি একখানা ফিটন ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলাম। আর একখানা গাড়ীতে ঠাকুর নিয়ে কৃষ্ণকমলদা' উঠলেন, আর হরেকৃষ্ণদা', রমণদা' ও ভগবানদা' উঠলেন। আমরা ধীরে ধীরে পাঁচুদা'র বাড়ীতে এসে পৌঁছিলাম। পাঁচুদা' গাড়ি থেকে নেমেই আগে চলে এসেছেন আমাদের সেবাদির বন্দোবস্ত করতে, পাঁচুদা'র বাড়ীর সংলগ্ন বাইরে একটি বৈঠকখানা ঘর আছে। অনেকে সেখানে লোটা কম্বল রাখলেন আবার পাঁচুদা'র নীচের ঘরেও কয়েক জন রইলেন। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় উপরের একটি ঘরে গেলেন আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সুন্দর ঘরটি! চারিদিকে ঠাকুর দেবতাদির ও শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের চিত্রপট টাঙান রয়েছে। বারান্দায় সুন্দর তুলসীর টব। একটি চেয়ারে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বসলেন। পাঁচুদা' ও তাঁর স্ত্রী দুটি পাথরের গ্লাসে মরিচ জল ও গঙ্গা জল নিয়ে এলেন। শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় মরিচ জল পেয়েই অর্দ্ধেকটা খেয়ে নিলেন তারপর আমার হাতে গ্লাসটা দিলেন, আর অর্দ্ধেক যা ছিল আমি তা সব চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললাম; অমনি রমণদা'রা সব চটে গেলেন,—"অধরামৃত নিজেই খেয়ে ফেললে আমাদের দিলে না!" পাচুদা' বললো, নীচে অনেক মরিচ জল আছে সবাই গিয়ে পাবেন। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা ৪।৫ জনা গঙ্গা স্নান কোর্ত্তে গেলাম। গঙ্গার তীরে বসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে মেঘলালদা' তেল মাখা[illegible] লাগল আমিও দেখাদেখি তাঁর গায়ে তেল মাখাতে লাগলুম। শ্রীল বাবাজী

মহাশয় হাসতে লাগলেন: বললেন,—"কলকাতা এই প্রথম এলে নাকি আমার সঙ্গে?" আমি বললাম,—"না, কয়েক বৎসর আগে শীলেদের বাড়ীতে যখন ছিলেন তখন পাতুড়িয়ার হৃষিকেশদা'র সঙ্গে এসেছিলাম, আপনার দেখা না পেয়ে সিঁথিতে যাই আপনার কাছে। তখন আপনি শীলেদের বাড়ীর নবরাত্রি উৎসব সমাপন ক'রে সিঁথিতে ছিলেন। সেখানে আপনাকে দেখতে যাই। তখন আমার মেজদা'ও ছিলেন আপনার কাছে, তিনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আর কলকাতায় আসিনি, এইবার আপনার সঙ্গে এলাম।"

এই সব কথা বলতে বলতে তাঁকে তেল মাখান শেষ হল; শ্রীল বাবাজী মহাশয় গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করলেন তারপর মস্তকে গঙ্গা জল দিয়ে মা গঙ্গায় নামলেন। বুক জলে দাঁড়িয়ে গামছা ভরে গঙ্গাজল মস্তকে দিতে লাগলেন। গঙ্গায় নামা মাত্রই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন! কেঁপে কেঁপে উঠছেন! প্রায় ১৫ মিনিট তিনি আনমনা হয়ে স্নান ক'রে উপরে উঠে গা মুছে ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পরলেন। ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে তিনি চরণামৃত নিয়ে—পেলেন, তারপর তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে মালা জপ করতে করতে চলতে লাগলেন। কিছুদূর এসে তিনি একটি ঠাকুর বাড়ীর নাট মন্দিরে উপস্থিত হলেন, সেখানে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে চরণামৃত পেয়ে ধীরে ধীরে পাচুদা'র বাড়ীতে এলেন। তারপর তিনি আহ্নিক করতে বসলেন। শ্রীপাদের আহ্নিকের দেরী দেখে অনেকে প্রসাদ পেয়ে নিলেন। কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের তখনও আহ্নিক হয়নি, আহ্নিক করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, আর হুঙ্কার দিচ্ছেন! ৩টা বাজল, তখন তিনি আহ্নিক শেষ করে প্রসাদ পেলেন। তারপর একটু বিশ্রাম ক'রে আবার বিকেলে শ্রীপাদ গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলেন। আমরা দুই তিন জন তার সঙ্গে গেলাম। আস্তে আস্তে বহু ভক্তের সমাগম হোতে লাগল। তিনুদা', শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের বড় প্রিয়, এসেই দণ্ডবৎ ক'রে বললেন,—"আমাদের

বাড়ীতে নাম-যজ্ঞের দিন কবে দেবেন।" এই কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"আচ্ছা, কালই অধিবাস ক'রে পরদিন নাম যজ্ঞ হবে!" এই সব বলতে বলতেই চারুদা', বলাইদা', নন্দদা' ও মাখমদা' ও আরো কত ভক্ত অফিসের ছুটির পর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এলেন। এই রকম অনেক ভক্তের সমাগম হোলো। সেখানে যে নন্দদা', মাখমদা', চারুদা' ও বলাইদা' ছিলেন তা বেশ মনে আছে। তারপর তিনি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে পাঁচুদা'র বাড়ী এলেন, ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হোলো। আরতি দর্শন করতে করতে নিজেই কীর্ত্তন ধরলেন, এমন সময় যুগলদা' এসে পেঁৗছিলেন কলুটোলা থেকে;—কলুটোলায় তাঁর সোনারুপার দোকান, গৃহী-বৈষ্ণব, সুন্দর তিলক কপালে! সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ ক'রে তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এসে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রাত্রিতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছেই তিনি কাটিয়ে দেন। এমনি করেই তাঁরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে আসা যাওয়া করেন; এমনি ভাবে তাঁরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গলাভ করেন, আবার সংসারও করেন! প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ক'রে সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। প্রত্যুষেই তিনুদা' এসে হাজির হলেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে যাবার জন্য। ওখানেই তিনুদা' মধ্যাহ্নে সবার সেবার বন্দোবস্ত ক'রে এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তখন মধুপূজারী থাকেন: তিনি খুব শুদ্ধাচারী এবং ভোগ-রন্ধনেও খুবই নিপুণ। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিকেলে সদলবলে যাবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু তিনুদা'র অনুরোধ এড়াতে পারলেন না, সকালেই খোল করতাল নিশান খুন্তি ও ঠাকুর নিয়ে তিনুদা'র বাড়ীতে হাজির হলেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় এখানে এসে যেন পরমানন্দিত হলেন, শ্রীগৌর সুন্দরের সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি-চিত্রপট দেখে;—বেশ বড়! সুঠাম সুগঠিত মূর্ত্তি আবার যুগল কিশোর, গোপাল ও শ্রীশালগ্রামশীলাও আছেন! দর্শন মাত্রই

ভূমিষ্ট হয়ে দণ্ডবৎ করলেন; ঠাকুরের সামনে এসে আবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ক'রে গড়াগড়ি দিলেন। তারপর একটি ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন; তিনুদা' তার ভাই, মা, বোন সবাই এসে দণ্ডবৎ প্রণতি করতে লাগলেন। আমার মনে হোচ্ছে, এরা যেন কত নিজ জন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের।

নাট মন্দির সুন্দর সাজান হয়েছে! তুলসীর একটা বড় টব; তার পাশ দিয়ে, শ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সুন্দর সুন্দর চিত্রপট আরও কত দেবদেবীর সুন্দর চিত্রপট স্থাপিত হয়েছে! শশী দাদা ও কৃষ্ণকমল দাদা ঠাকুর সাজাচ্ছেন, নিশান খুন্তি সব সাজান হয়ে গেল। শ্রীঅদ্বৈত কাকাও এসেছেন দেখলাম। শ্রীধাম হতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই ষ্টেসনে এসে পাঁচুদা'র বাড়ী না গিয়ে তিনি তিনুদা'র ওখানেই উঠেছেন। যে যেখানে পারেন আসন ক'রে নিলেন। উপরের ঘরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও আমি রইলাম। অষ্ট প্রহর নাম যজ্ঞ হবে বলে তিনুদা'র কাকা শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও এসেছেন। তাঁর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে খুব সখ্য-ভাব। তিনি বড় বাবাজী মহাশয়ের কোলে কাকে উঠেছেন! এই বাড়ীতেই অনেক সময় শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় থাকতেন। শ্রীদীনবন্ধু বেদান্ত রত্ন—তিনুদা'র বাবা। শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় তাঁকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে আত্মসাৎ ক'রে নেন। অনেকদিন হোলো দেহরক্ষা করেছেন। তাঁরই সব ঠাকুর তিনুদা' সেবা করেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে আমায় বললেন,—তুমি ঐ-যে শ্রীমহাপ্রভুর বড় চিত্রপট দেখ্‌ছ, এই চিত্রপট শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকত, তিনি এদের এঁর সেবা করতে দিয়ে গেছেন। এইখানে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় কত আসতেন! কত কীর্ত্তন নর্ত্তন এখানে হয়েছে, এ-স্থান তাঁর পদাঙ্কিত ভূমি! আর এদের কি প্রীতি আমাদের উপর দেখছো তো? এরা মহাপ্রসাদ ছাড়া কেউ কিছু খায় না। সর্ব্বদা পাঠ কীর্ত্তন ঠাকুর

সেবা উৎসব এই সব নিয়েই থাকে। আমি কলকাতায় থাকলে এদের কাছে সপ্তাহে একবার আসতেই হবে। এইরূপ কত কথা বার্ত্তা কয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে চারুদা', বলাই দা', তিনুদা', দীনেশ কাকা, শ্রীঅদ্বৈত কাকা, নন্দদা', মাখনদা' ও আমি মিলে গঙ্গা স্নান ক'রে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক করতে বসলেন, আমি একখানা পাখা নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করতে লাগলাম। চারুদা', বলাইদা' ও তিনুদা' তারা সবাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। চারুদা' হাসতে হাসতে বলছেন,—"এই ছোঁড়াটা আপনার সঙ্গ নিয়েছে বুঝি! আপনাকে দেখছি খুব ভালবাসে। এরও সব হয়ে গেছে দেখছি! আমাদের আর বাড়ী ভাল লাগেনা। চাকরী আত্মীয় স্বজন ভাল লাগেনা;—যেন আঠা হয়ে আপনার গায়ে লেগে থাকতে ইচ্ছে করে। এত আকর্ষণ আপনার!" এইরূপ ভাবে চারুদা' তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করছেন, অপূর্ব্ব তাঁহার গুরু নিষ্ঠা কিন্তু কথাবার্ত্তা সব এই রকম সখ্য-প্রেমের। আবার যখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কীর্ত্তন করেন তখন একবারে অন্য স্বরূপ হয়ে যান। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রধান দোয়ারই যুগল দা', চারু দা', শ্রীঅদ্বৈত কাকা ও বলাই দা'। সবাই আজ এখানে এসেছেন। আরও কত ভক্ত এসেছেন। তিনুদা'র প্রীতিতে আরও অনেক লোক জন এসেছেন তাদের বাড়ীতে;—তার শ্রীগুরুদেব শ্রীল বাবাজী মহাশয়, তিনি নিজে অধিবাস কীর্ত্তন ক'রে নামযজ্ঞ করবেন! তাই বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। আমি যেন অল্প সময়ের মধ্যেই তিনুদা'র আপন জন হয়ে পড়লাম।

আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের পানে তাকিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস কচ্ছি। চারু দা', বলাই দা', তিনুদা' একটু দূরে বসে বসে দেখছেন আর হাসছেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয় তিলক করছেন, তিলক ধারণ শেষ হোলো অমনি আমায় বোললেন,—"তুমি তিলক

কর,"—বলেই তিলক আয়না সাপি আমার হাতে দিলেন ; আমি তিলক সুন্দর ক'রে করলাম। আমার মাথায় তখন সুন্দর বড় বড় চুল, আমি চুলের খুব যত্ন করি। ভাল করে আঁচড়িয়ে রাখি। তিলক ক'রে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়নায় দেখছি। এমন সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটী কৌটায় সযত্নে রক্ষিত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীজীর মন্দিরের-সিন্দূর প্রসাদ বাহির করিয়া নিজের কপালে ফোঁটা দিলেন, আর অমনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আয়, তোকে শ্রীজীর সিন্দুর পরিয়ে দেই, বেশ দেখাবে!"—বলে আঙ্গুলে ক'রে আমার কপালে পরিয়ে দিলেন ;—চারুদা' শ্রীপাদের এই সব স্নেহের ব্যাপার দেখছিলেন!—অমনি চারুদা' আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তিনুদা'র দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"তুমি যেমন তাঁর প্রিয় আর এই ছেলেটিও দেখছি তোমারই মত ওঁর প্রিয় ;" তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক হয়ে গেল। সবাই তাঁর সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসলাম ;—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসলেন চারুদা আর অদ্বৈত কাকা ও আমি। আরো কত লোক পর পর বসল। প্রসাদ পেতে পেতে কত ধ্বনি দিতে লাগল সব,— চারুদা' ধ্বনি দিচ্ছেন, যুগলদা' ধ্বনি দিচ্ছেন। সে যে কি আনন্দ তা বলে বোঝাতে পারবো না। এখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও হেসে একটা ধ্বনি দিলেন।

সেই অপূর্ব্ব ধ্বনিটি এখনও আমার প্রাণে গেঁথে আছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কত শিষ্য ও শিষ্যাও এসেছেন ;—সব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁরাও সব দাঁড়িয়ে শ্রীগুরুদেবের ভোজন-লীলা আনন্দে দর্শন কোচ্ছেন। সঙ্গে আমরা প্রায় ৬০ জনা প্রসাদ পেতে বসেছি। সবার দৃষ্টিই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখ পানে ; কি দৃশ্য! শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে পেতে স্থির হয়ে চোখ বুজে ধ্বনি দিতে লাগলেন,—"যারা একবার গৌর নটবর নয়ন কোণেতে হেরে। তারা সতীপনা রাখিয়ে আপনা আসিতে পারে

কি ফিরে! শুনেছি পুরাণে রাধিকার সনে তাঁহার প্রেমের কথা তিল আধ যারে না দেখিলে মরে সে কেন আসিবে হেথা! প্রেমে ঋণী হইয়া এল পলাইয়া যমুনা হইয়া পার। গোপকুল ছাড়ি এল নদেপুরী দ্বিজকুলে অবতার। ইহা যদি জানে ব্রজ-গোপীজনে এসেছে দ্বিজের পুরী। নাগরালী পনা তবে যাবে জানা ভেঙ্গে দেবে ভারি ভুরি। গোকুল নগরে কলঙ্ক-সাগরে ভাসায়েছে কাল বধূ। দেশে কে না জানে চোরা কানু বলে, বিদেশে হয়েছে সাধু। রাধা নাম যার, সর্ব্বগুণ সার, প্রেমময়ী প্রেম দাসী। লোচন এ-ছার হোতে চায়, তার দাসানুদাসের দাসী।”—এই ধ্বনি দিতে দিতে একেবারে ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন! থর থর করে শরীর কাঁপতে লাগল! চারিদিক থেকে—হরিবোল ধ্বনি, উলু উলু ধ্বনি—হোতে লাগল! সে-যে কি আনন্দ! যে দেখেছে সেই বুঝতে পারবে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ কি মধুময়! প্রায় দশ মিনিট সবার প্রসাদ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর ভাব সম্বরণ ক'রে প্রসাদ পেতে লাগলেন। প্রসাদ পেতে পেতে প্রায় ৩টা বেজে গেল। সবাই উঠে হাত মুখ ধুতে লাগলেন। চারুদা' আমায় স্নেহবশে হাতে জল ঢেলে দিলেন,—তিনি আমায় বড় প্রীতির চোখে দেখে ফেলেছেন! তার কারণ আর কিছুই নয়,—শুধু শ্রীবাবাজী মহাশয় খুব স্নেহ করেন, ভাল বাসেন, এই বুঝেই তাঁর এত প্রীতি আমার উপর। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে খুব সখ্য-ভাব তাঁর, তাই চারুদা' তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন,—আমাদের অঙ্গীকার করলেন প্রায় বুড়ো কালে, এখন কি আর প্রাণ ভরে আপনার সেবা কোর্ত্তে পারি! তাই এই সব ছোটো ছেলে তিনু ও জীবন জুটেছে, খুব সেবা করবে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই কথা শুনে হেসে উঠলেন।

তারপর তিনুদা' একটা চেয়ারে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বসতে দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় চেয়ারে বসলেন। সুন্দর সুন্দর

বেলফুলের মালা আমরা অনেকেই তাঁর গলায় পরিয়ে দিলাম। গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে গেল। তিনুদা' প্রসাদি পান সামনে ধরলেন, তিনি দু'চারটী পান খেয়ে আমাকে, চারুদা'কে, তিনুদা'কে ও বলাইদা'কে দিলেন,—পান চিবিয়ে চিবিয়ে খানিকক্ষণ খাচ্ছেন আর চারুদা' হাতখানা বাড়িয়ে মুখের কাছে ধরলেন, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁকে চিবানো প্রসাদি-পান দিলেন এই দেখা-দেখি বলাইদা' ও আমি তাঁর মুখের কাছে হাত পাতলুম, আমাদেরও তিনি প্রসাদি অধরামৃত, চিবানো পান দিলেন যেমন চারুদা'কে দিয়েছিলেন ; অবাক হয়ে এই সব লীলা দেখছেন সবাই। অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় তিনুদা'কে বলছেন ;—"তিনু, দেখো গিয়ে সব, এখনও অনেকে প্রসাদ পায়নি। ঐ দেখ অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, প্রসাদ পায়নি এখনও। ওদের সবাইকে প্রসাদ দাও, আমি এখান থেকে সরে পড়ছি, নইলে কেউ প্রসাদ পাবে না। চারু, চলতো আমরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি, বিশ্রাম করি।" আমায় তিনি কত স্নেহ ভরে ডাকলেন,—ময়না! এস। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটি খাটে বিশ্রাম করতে শুয়ে পড়লেন। চারুদা' বলাইদা' ও আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পায়ের দিকে একটী কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেই শুলেন অমনি ঘুমিয়ে পড়লেন ;—এটা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের স্বভাবগত, যেই বিছানায় কাত হবেন অমনি ঘুমিয়ে পড়বেন ; আর ঠিক একঘণ্টা যেই হবে তিনি অমনি উঠে পড়বেন। রাত্রে যত দেরিতেই শোননা কেন,—দুটোও বেজে যায় এক এক দিন, আবার ৩টাও বেজে যায় এক এক দিন প্রসাদ পেতে, কিন্তু ঠিক চারটার সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবেই। আমি কত সময় তাঁর এইরূপ নিদ্রা-সংযম দেখেছি! তাঁর মত এত নিদ্রা-সংযমী আমি আর জীবনে কাউকেই দেখিনি। অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভোগের প্রসাদ,—রাজভোগ, রসগোল্লা ঘৃতান্ন, কত-কত সন্দেশ, কত-কত মিষ্টান্ন দ্রব্য' নিত্যই তাঁর সামনে

ধরা থাকত। একজন রাজারও এমন ভোগ্য বস্তু জোটান কঠিন! কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়, ঐ একটু রসা দিয়ে ও একটু সিদ্ধ দিয়েই প্রসাদ পেতেন। প্রসাদের মর্য্যাদা রাখবার জন্য অঙ্গুলি দিয়ে সমস্ত প্রসাদ স্পর্শ কোরে এক এক কণিকা নিয়ে মুখে দিতেন। অসংখ্য ভোগ্য বস্তু তাঁর সামনে রাখা হয়, কিন্তু এতটুকু লালসা তাঁর কোনদিনও দেখিনি। আমরা ভাল জিনিষ ও উত্তম উত্তম প্রসাদ পেলে আমাদের জিহ্বা নেচে ওঠে, শত জিহ্বা প্রাপ্তির কামনা ক'রে থাকি,—কি ক'রে সবগুলো খাবো! জিহ্বা জয় না হলে কেউ বড় হতে পারে না, মনও বশ করতে পারবে না, রিপুও বশীভূত হবে না। আমি কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ জিহ্বা-জয় দেখেছি, জিহ্বার এতটুকুও লালসা তাঁর জীবনে একটা দিনও দেখতে পাইনি। এইরূপ জিহ্বা-সংযমী ও লালসা-জয়ী আর কাউকেই আমি দেখিনি বা কেহ আমার চোখে পড়েনি; কেউ নেই তা আমি বলবো কেন! তবে আমি আর কাউকে দেখিনি,—এই সত্য বলবো না কেন? যা সারা জীবন ভোর চোখে দেখেছি সে কথা লিখতে বা বলতে কার্পণ্য করব কেন?

একটু বিশ্রাম করেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে বসেছেন চেয়ারে। হাতে মালার ঝোলা, নাম করছেন! আমি বা চারুদা' কিছুই টের পাইনি, চারুদা' ঘুমুচ্ছেন নাক ডাকিয়ে; আমি উঠে পড়েছি, আর অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"বলবিনি কিন্তু, ওর কপালে এই দোয়াতের কালির ফোঁটা দেবো।" এই বলেই বাঁহাত দিয়ে কলমের পিঠের দিকে কালি লাগিয়ে টক ক'রে চারুদা'র কপালে কালি দিলেন! চারুদা' কিছুই টের পেল না। শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাসছেন! আবার এক অভিনব ছেলেমানুষী আরম্ভ করলেন,—একটি কাঠি নিয়ে চারুদা'র নাকের ভিতর স্পর্শ করাতেই নাক শুড় শুড় করায়, চারুদা' অমনি ঘুমের ঘোরেই বলছেন ছেলেদের উদ্দেশ্যে,—"একটু ঘুমোতেও

পারবোনা," বলেই চোখ মেলে দেখলেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের হাতে কাঠি! ধরা পড়ে গেছেন, লুকোতে পারেননি! কাঠিটা চট ক'রে তিনি ফেলে দিলেন। চারুদা'ও চকিতের মত উঠে বসলেন এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের এই বালক-সুলভ ব্যবহার দেখে হাসতে বাহিরে গেলেন! শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"ভাবছিলুম টের পাবে না কিন্তু টের পেয়ে গেছে, লুকানো গেলনা," এই বলে হাসতে লাগলেন। এই রকম শ্রীপাদের কত সময় বালকের মত ব্যবহার দেখেছি।

এইরূপ পরমানন্দে আমাদের সে-দিনটা কাটল। সন্ধ্যা হল, রাম বাবু ও ব্রজেন বাবু প্রভৃতি অনেকেই এলেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত তাঁরা। ব্রজেন বাবু, রাম বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলছেন,—আফিসের ফেরতা বুঝি, বাড়ী যাওনি? তাঁরা বললেন,—না, দেরী হয়ে যাবে বাড়ী গেলে, সেইজন্য একেবারে আফিসের ছুটির পর এখানেই চলে এলাম। তিনি তিনুদা'কে ডাকলেন,—"ও তিনু, এই দেখ, কুটুম এসেছে আফিস থেকে, এদের একটু প্রসাদ পাইয়ে দাও। মালসা ভোগ আছে,—দিও।" তিনুদা' "আচ্ছা" বলেই তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। তিনুদা'র সঙ্গে তাদের খুব প্রীতি দেখলাম। কাছেই নাকি বাড়ী। তারা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে প্রসাদ পেয়ে বসে বসে চারুদা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন, চারুদা'র সঙ্গে সবারই খুব প্রীতি দেখছি; যে আসে সেই চারুদা'কে খোঁজে। আমি ভাবলাম,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় যখন ওঁকে এত ভালবাসেন, তাঁর এত সখ্য-প্রীতি ওঁর সঙ্গে, তখন তাঁকে যে সবাই ভালবাসবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এইরূপ কত কত ভক্ত এসে মিলিত হলেন। শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামীও এলেন। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দাদা বলে সম্বোধন করেন। খুব হাসি-খুসি লোক। তার সবার সঙ্গেই ভাব। অনেক

সময়ই তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকেন। সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেন। এস, সি, আড্ডির সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। তাঁদের বাড়ী এসেই তিনি শুনছেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় এখানে, অমনি ছুটে এখানে এসেছেন। শ্রীপাদের সঙ্গেই বেশী থাকেন কীর্ত্তনানন্দের জন্যই তাঁর সঙ্গে বেড়ান। তিনুদা' গোঁসাইজীকে একটু প্রসাদ পাইয়ে বসালেন। একটু পরেই সন্ধ্যা আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আরতি দেখতে এলেন। আরতি কীর্ত্তন সবাই করছেন ; পরমানন্দে সবাই আরতি দর্শন করতে লাগলেন।

একটু পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করলেন,—আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আরতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পদ গাইছেন,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম,—আর পেছনে নামের সঙ্গে সুর রেখে সবাই দোহার করছেন। একে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঐ অপূর্ব্ব প্রেম কণ্ঠস্বর, তারপর আবার ভাবে বিভোর হয়ে গাইছেন!—মধ্যে মধ্যে উদ্ধতবাহু, মৃদুগম্ভীর হয়ে নেচেনেচেও গাইছেন! সেথা যেন আনন্দের হাট বসে গেছে

চারিদিকে লোকে লোকারণ্য! রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই কীর্ত্তন শুনছেন। আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখি যে সবাই স্থির হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখ পানে তাকিয়ে, তাঁর মুখের নাম শুনছেন। প্রায় রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হলো ;—চার ঘণ্টা এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করলেন! কখনও কখনও মঞ্চ ঘুরে ঘুরে কীর্ত্তন করলেন। সে যে কি আনন্দ তা ব'লে বোঝান যাবে না। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসে বসলেন,—অতঃপর সবাই মহাপ্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। নাম চলতে লাগল, আর বিশ্বরূপ গোস্বামী খোল বাজাচ্ছেন আর শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজী বেহাগ সুরে নাম ধরেছেন! আনন্দে সবাই মসগুল হয়ে নাম করছেন। হঠাৎ তিনুদা' নাম ধরিলেন ; মঞ্জুল মধুর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলা! সে যে কি

আনন্দ বর্ষিত হতে লাগল তা বলে বুঝাতে পারব না! আমি নাম শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি চারুদা' প্রভাতি সুরে নাম ধরেছেন। একটি পদ গাইছেন,—এই পদগুলো চারুদা'র খুব প্রিয়। প্রায়ই এই পদ কীর্ত্তন করেন,—"শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোঁহারি চরণ শরণ না কঁনু আমি। বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি খাইছু হইয়া কামী। সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল, বড়ই বিপাক হইল। জনমে জনমে এমনি কতেক আত্মঘাতী পাপ কৈল। সেই অপরাধে এ-ভব-সাগরে বান্ধিল এ মায়া-জালে; তোমা না ভজিয়া আপনা না খাইয়া, আপনি ডুবিনু হেলে। আর কতকাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব ভোগ দেহ নাহি যায়। সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া, নিবেদিছি তুঁয়া পায়। ও রাঙ্গা চরণ শরণ কেবল, বিচারিয়া এই দায়। উদ্ধার করিয়া লহ দীনবন্ধু আপন চরণ নায়। তোমারি সেবন, অমৃত ভোজন করাইয়া মোরে রাখ। এ রাধামোহন খতে বিকাইল, দাস গণনাতে লিখ।"

এই প্রার্থনা-কীর্ত্তন চারুদা' করছেন, আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। সমস্ত লোকই কাঁদছেন! শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কাছে এমন ক'রে আত্ম নিবেদন করতে, এমন করে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে কখনও ত কাউকে দেখিনি! সবাই ত ঠাকুরের গুণ গান, শ্রীমহাপ্রভুর গুণ গান, নিতাইচাঁদের গুণ গান! তবে শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা বলে শ্রীগুরুর নিকট এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা একবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখেও শুনেছি, আর এই শুনলাম! কত আঁখর নিজে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন চারুদা'।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাতে মালার ঝোলা নিয়ে আস্তে আস্তে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে নাম জপ কচ্ছেন, আমাকে দেখেই বললেন,—"যাও, চারু নাম করছে শোনো গিয়ে"! আমি চারুদা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তিনি চোখের জলে ভেসে

যাচ্ছেন। তাঁর প্রতি প্রার্থনাই হচ্ছে শ্রীগুরুর নিকট, শ্রীগুরু অভিমুখী! শ্রীগুরুদেবের কাছেই তাঁর যত-সব-কিছু প্রার্থনা। আমি ভাবছি,— এমন শ্রীগুরুনিষ্ঠ লোক তো দেখি নাই। তাঁর সেই মুখোদ্গীর্ণ বাক্য আমার মনে নাই। শুধু ভাব টুকুই মনে আছে,—"কেবল কৃপা কর প্রভু" এই কথাই কীর্ত্তনের মাঝে বলছেন।

আজ তিনি অনেক দিনই অপ্রকট হয়ে গেছেন; হায়! তাঁর শ্রীগুরুভালবাসা, শ্রীগুরুনিষ্ঠা ও শ্রীগুরুকথা-মুখর সে-সব করুণ কীর্ত্তন আর শোনা যাবে না! তাঁর সেই অপূর্ব্ব শ্রীগুরুনিষ্ঠা এখনও আমার হৃদয়ে এসে আঘাত করে। তিনি ভগবৎ গুণও গাইতেন, নাম সঙ্কীর্ত্তনও করতেন। তাঁকে বহু জায়গায় ভক্তেরা কীর্ত্তন করতে নিয়ে যেতেন, কিন্তু নিতাই গৌর গুণ কীর্ত্তন করে, শেষে প্রাণ ভরে কীর্ত্তন মুখে শ্রীগুরু-কথা ও শ্রীগুরুদেবের চরণে তাঁর আত্ম নিবেদন কীর্ত্তনই আমরা শুনতে পেতাম। অহো! আর তাঁহাদের মধুময় সঙ্গ পাবনা, তাঁর প্রিয় বন্ধু বলাইদা' তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিলেন। তিনিও অপ্রকট হয়েছেন। এই সব প্রেমিক ভক্তদের সঙ্গ হারিয়ে আমাদের বেঁচে থাকাটাই অভিশাপ!

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে চাঙ্গড়ী পোতায় কয়েক বার চারুদা'র বাড়ী ও বলাইদা'র বাড়ীতে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদলবলে সেখানে গিয়ে কত কীর্ত্তন, কত অষ্ট প্রহর নাম করেছেন। চারুদা'র কি অপূর্ব্ব সেবা যত্ন! তাঁর ভালবাসা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে, এখনও ভুলিতে পারি না। যদিও বহুদিনের কথা তবুও তাঁহার সেই প্রেম-ব্যবহার আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর অচলা মতির কথা ভোলা যায় না। শ্রীবাবাজী মহাশয়ই তাঁর জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ-সর্ব্বস্বই ছিলেন। এরূপ শ্রীগুরু পাদপদ্মে একান্ত ও অপূর্ব্ব নিষ্ঠাযুক্ত চিত্ত আমাদের শ্রীগুরু ভাইদের মধ্যে বিরল; কদাপি দেখতে পেয়েছি! আমি তাঁকে যে-রূপে দেখেছি সে-রূপই একটু লিখে আত্মশোধন করিবার প্রয়াস করছি মাত্র।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আজ নগর কীর্ত্তনে বাহির হবেন! তোড়-জোড় হতে লাগল। মৃদঙ্গ খোল করতাল বেজে উঠল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীনিতাই চাঁদ ও শ্রীগৌর কিশোর ও তাঁর পারিষদদের আবাহন কীর্ত্তন করে,—প্রকট অপ্রকট লীলার দুইতো বিধান—এই কীর্ত্তন সমাপনান্তে—আবার বল হরিনাম, আবার বল—বলতে বলতে রাস্তায় এসে, ওখানে বটবৃক্ষ তলে মায়ের মন্দিরে দণ্ডবৎ ক'রে নাম করতে লাগলেন,—"আবার বল হরিনাম, আবার বল। মধুর এই হরে কৃষ্ণ নাম আবার বল। প্রেমদাতা নিতাই বলে আবার বল হরিনাম আবার বল।" তারপর নাম ধরলেন,—গৌর হরি হরিবোল, প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল।

আজ বিশ্বরূপদা' ও হরেকেষ্টদা' খোল বাজাচ্ছেন। তিনুদা' সবাইকে মালা চন্দন পরিয়েছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গলায় একটী সুন্দর বেল ফুলের মালা হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলছে! আরোও কত সুন্দর সুন্দর প্রসাদি-মালায় তাঁর গলা শোভিত,—অপূর্ব্ব শোভায় শ্রীপাদ চলেছেন এই নগর কীর্ত্তনে! প্রায় দুইশত লোক শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে দোয়ারকি করছেন। সে যে কি-এক অপূর্ব্ব নাম-ধ্বনি হোচ্ছে তা আমি বলে বুঝাতে পারবোনা! "প্রেম দাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বোল"—এই নাম নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় পথে বের হলেন।

অসংখ্য লোকের সমাগম হোতে লাগল। কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব উন্মাদনা! মধ্যে মধ্যে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নাম করছেন আর অমনি নৃত্য আরম্ভ হচ্ছে। বিশ্বরূপদা' ও তিনুদা' নেচে নেচে পরমানন্দে খোল বাজাচ্ছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও আবেশে নাচছেন! সঙ্গে সঙ্গে সবাই অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গিমায় নাচতে লাগল! তিনুদা' অনেকক্ষণ বাজিয়ে একটু ক্লান্ত হয়েছেন। হরেকেষ্টদা' তার কাছ থেকে খোল নিয়ে বাজাতে লাগলেন। তারপর খানিক পরে মদনদা' বিশ্বরূপদা'র কাছ থেকে খোল

নিয়ে বাজাতে লাগলেন। এই মদনদা'র ও হরেকেষ্টদা'র মৃদঙ্গ বাজনা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের খুব প্রিয়। এইরূপ অনেক জায়গায় কীর্ত্তন করতে করতে এস, সি, আড্যির বাড়ীতে কীর্ত্তন নিয়ে এলেন।

এস, সি, আড্যি মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় অনেকক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সেখানে দাঁড়িয়ে পদ গাইতে লাগলেন। আমরা সবাই তাঁর পিছনে গাইতে লাগলুম, আমি তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে একটু একটু গাইতে শিখেছি। বিশ্বরূপদা', তিনুদা', যুগলদা', অদ্বৈতকাকা ও রমণদা' প্রভৃতি সবাই পদটি গাইতে লাগলেন।

পদটি এই,—"প্রাণ রাধারমণ রমণী মন মোহন, শ্রীবৃন্দাবন বন দেবা। অভিনব রাস রসিক বড় নাগর, নাগরী গণ কৃত সেবা। ব্রজপতি দম্পতি হৃদয় আনন্দন, নন্দন নবঘন শ্যাম।" তিনি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আঁখর দিতে লাগলেন,—"মা যশোদার নীলমণি, দণ্ডে দশবার খায় নবনী, মা যশোদার নীলমণি, বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমার বসে, দণ্ডে দশবার খায় নবনী, নন্দন নব নবঘন শ্যাম। নন্দহৃদি আনন্দদ, শ্যাম নবজলদ, নন্দ হৃদি আনন্দদ। নয়নাভিরাম, ব্রজ তরুণী লোচন, নয়নাভিরাম।" তারপর অপূর্ব্ব মাতন আরম্ভ হোলো। ছোট রমণদা' নামে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি সুন্দর খোল বাজাতেন, হরেকেষ্টদা' তাঁর হাতে খোল দিলেন—তিনি খোল ধরেই অপূর্ব্ব তালে বাজাতে লাগলেন।

"নন্দীশ্বরপুর পুরট পটাম্বর রামানুজ গুণধাম। নন্দীশ্বর পুরবাসী, আমার বরজশশি, নন্দীশ্বর পুরবাসী,"—এই সব মধুর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। আবার গাইলেন,—রামানুজ গুণধাম। আঁখর দিচ্ছেন,—"বলরামের ছোট ভাই, আমার

পরাণ কানাই, বলরামের ছোট ভাই, আদর করে সদাই ডাকে কা কা কানাইয়া, আদর করে সদাই ডাকে, আরে আরে মেরা ভেইয়া, কা কা কানাইয়া।" অমনি ছোট রমণদা' মাতন বাজাতে লাগলেন, দু'তিন হাত উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। আবার চোখ বুজে খোলের বোল আওড়িয়ে বাজাতে লাগলেন। খুব মাতামাতি আরম্ভ হল অনেকক্ষণ।

আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরলেন,—শ্রীদাম, সুদাম, সুবল সখা সুন্দর,— এই পদটা ধরেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় বড়ই উল্লাস ভরে আঁখর দিতে লাগলেন,—"শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী, আমার বরজ শশী শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী। আধ খেয়ে আধ খাওয়ায়, বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বসে, আধ খেয়ে আধ খাওয়ায়। বলে আর খাওয়া হোলো না! এযে বড়ই মিঠে লাগল, আরতো খাওয়া হোলনা, আধ থাক্ ভাই কানাইয়াকে দেবো, খেতে খেতে বেঁধে রাখে, ধড়ার অঞ্চলে বেঁধে রাখে। ছুটে এসে তুলে দেয়, চাঁদ মুখে তুলে দেয়, বলে খা-রে আমার প্রাণ কানাই, বড় মি'ঠে লেগেছে খেতে পারি নাই, চাঁদ মুখে তুলে দেয়, বাম করে গলা জড়িয়ে ধরে চাঁদ মুখে তুলে দেয়, সুবলের মরম সখা, শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, সুবলের মরম সখা,"—বলতে বলতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় খুব থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

তাঁর নয়নাশ্রু দুই গণ্ড বয়ে পড়ছে;—একটা অপূর্ব্ব আঁখর মনে পড়েছে, তাই তাঁর দেহে এত সাত্ত্বিক ভাবের বিকার এসেছে। সমস্ত অঙ্গ শিমুলের কাঁটার মত পুলক-কণ্টকিত হয়েছে। "সুবলের পরম সখা, শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, সুবলের মরম সখা, শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা, রাই বিরহে প্রাণ রাখা,—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভাবিত হয়েপড়েছেন ; আবার অপূর্ব্ব মাতন আরম্ভ হোলো! শ্রীল বাবাজী মহাশয়এক-এক বার ভাবাবেশে হুঙ্কার দিচ্ছেন! শেষে নৃত্য আরম্ভ হোলো। যত লোক ওখানে ছিল সবাই নৃত্য করতে

লাগলেন। বিশ্বরূপদা' খুব নৃত্য করতে করতে আবেশে ভূমিতলে পতিত হয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। অনেকক্ষণ মাতনের পর সবাই স্থির হলেন।

আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় গাইতে লাগলেন,—শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর চন্দ্রক চারু অবতংশ! গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী সুধাকর, মুখরিত মোহনবংশ। আবার সুন্দর আঁখর দিতে লাগলেন,—"বাম করে গিরিধরা, ব্রজবাসী রক্ষা করা, বাম করে গিরি ধরা, মুখরিত মোহন বংশ।"

আবার আঁখর দিতে লাগলেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় চিন্তা করে বা বানিয়ে বানিয়ে আঁখর কখনও দিতেন না; মনে হোতো কি-যেন দেখছেন!—কি-যেন কেন বা বলি, তিনি যে সাক্ষাৎ দেখতেন শ্রীব্রজবিহারীকেই! চোখ বুজে আছেন তথাপি চোখের সামনেই দেখছেন তাঁকে আর অবলীলাক্রমে বলে যাচ্ছেন, একটুও বাধেনা, একটা কথাও বেফাস হয়না, পরপর কেমন ধারাবাহিক ভাবে বলে যাচ্ছেন!—"বেণু বাদন পর। গোপবেশ বেণুকর, বেণু বাদন পর। নব কৈশর নটবর, বেণু বাদন পর, বেণু বাজায়রে, ধীর সমীরে যমুনাতীরে, বেণু বাজায়রে। যমুনা-পুলিন বনে বেণু বাজায়রে। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, বেণু বাজায়রে, চৌদ্দভুবন আকর্ষিত, ঐ বেণুর রবে হয়, চৌদ্দভুবন আকর্ষিত, যমুনা উজান চলে, শ্যামের মোহন মুরলী রোলে, যমুনা উজান চলে, উত্তাল তরঙ্গ ছলে, নেচে নেচে উজান চলে, মকর মীন নাচেরে, যমুনার জলে আজ, মকর মীন নাচেরে, শ্যামের মোহন মুরলী রোলে, মকর মীন নাচেরে; আজ সচল অচল, অচল সচল, কঠিন তরল, তরল কঠিন, শ্যামের মোহন মুরলী রোলে, সচল অচল, অচল সচল, পবনের গতি স্থির হয়, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, নব নব ফুল ফলে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, তা'রা পুষ্পিত ফলিত নব নব ফুল ফলে, পুষ্পিত ফলিত, যোগী যোগ ভোলেরে, মুনিজনার

ধ্যান টলে, যোগী যোগ ভোলেরে, আজ কাননে ব্রজ কামিনী, কুল মান বাম পদে ঠেলে, ধায় কাননে ব্রজ কামিনী, প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ বলে, ধায় কাননে ব্রজ কামিনী।"

এই পদ বলার সঙ্গে সঙ্গে ছোট রমণদা' এক লম্ফ দিয়ে উঠেই মাতন বাজনা আরম্ভ করলেন। সমস্ত লোক এই সমস্ত অপূর্ব্ব আঁখর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন! সবাই যে শুধু স্তম্ভিত হয়েছেন এমন নয় তাঁহারা শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নাচতেও লেগেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু নেচেই দাঁড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। আবার মাতন শান্ত হোলো অমনি আবার সুন্দর একটি পদ ধরলেন,—"শ্রীনন্দ নন্দন গোপীজন বল্লভ, শ্রীরাধা নায়ক নাগর শ্যাম। শো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর।"

অমনি তিনি আঁখর দিতে লাগলেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণ এবার শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এই সমস্ত কথা—কিন্তু কি সুন্দর মিলান আঁখর,—"শচীসুত হইল সেই নন্দের নন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই, নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়রে, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাইরে। তোমরা জাননা কি কলিজীব? আমার নিতাই কেঁদে কেঁদে বলে, তোমরা জাননা কি কলিজীব? এবার গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হোলো, জাননা কি কলিজীব? রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে, গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হোলো, আবেশে নিতাই বলে, শ্রীগৌরাঙ্গ-রহস্য আবেশে নিতাই বলে, শো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুরমুনিগণ মন মোহন ধাম। জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর, জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনোদ।"

এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের তাৎপর্য্য, তাঁর অবতারের মূল কারণ অতি অল্প কথায় আঁখরের সঙ্গে বলতে লাগলেন;—একেবারে সমস্ত সার সিদ্ধান্ত সব। আবার আঁখর দিচ্ছেন,—"রাধাভাব দ্যুতি চোরা, আমার শচীর গোরা, তিন বাঞ্ছা পুরাইতে, রাধাভাব দ্যুতি চোরা, আস্বাদিয়ে পিয়াইতে, শ্রীরাধাভাব,—দ্যুতি চোরা, চির

অনর্পিত, বিতরিতে—রাধাভাব দ্যুতিচোরা, আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে শ্রীরাধাভাব,—দ্যুতি চোরা, মহারাস বিলাসের পরিণতি, রাইকানু একাকৃতি, গৌরবরণ নাটুয়া মুরতি, মহারাস বিলাসের পরিণতি, নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ, নাটুয়া মুরতি নটন গতি, নটনেতে উৎপত্তি, গৌর বরণ নাটুয়া মুরতি, নটনেতে উৎপত্তি।” এইরূপ কত কত আঁখর দিতে লাগলেন।

আবার গাইলেন,—“ব্রজতরুণীগণ লোচন মঙ্গল, নদীয়া বঁধুগণ নয়ন আমোদ।” আবার বড় সুন্দর একটা আঁখর দিলেন,—“এবার সবাই মত্ত মধুরে, মধুর গৌরাঙ্গ হেরে, সবাই মত্ত মধুরে। মধুর গৌরাঙ্গ লীলা, বাহুতুলে নিতাই বলে, সুরধুনীর কূলে কূলে, বাহুতুলে নিতাই বলে, গৌরাঙ্গ রহস্য বাহুতুলে নিতাই বলে। ভজপ্রাণ শচীদুলালে, বাহুতুলে নিতাই বলে, নিতাই কেঁদে গেল বলে, ভজপ্রাণ শচীদুলালে।” যেই বলা অমনি অপূর্ব্ব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। কেউ নাচছে, কেউ হুঙ্কার দিচ্ছে, কেউ গড়াগড়ি দিচ্ছে, যেন প্রেম-বরষার বাদর নেমেছে! তারপর একটু ভাব সম্বরণ হোলে আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরে রাস্তায় চললেন,—প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল। প্রায় বেলা দুইটা পর্য্যন্ত নগর কীর্ত্তন ক’রে তিনুদা’র বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেন। খানিকক্ষণ মাতামাতি কীর্ত্তন হোলো।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়,—“গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে” এই সব পদ গাইতে লাগলেন,—চারিদিকে হরি হরিবোল ধ্বনি, উলু উলু ধ্বনি আরম্ভ হোলো। প্রায় ২ ঘণ্টায় কীর্ত্তন শেষ হোলো; শ্রীল বাবাজী মহাশয় দধি-মঙ্গলের হাঁড়ি নিজে মাথায় ক’রে গাইছেন,—“আয়রে তোরা লুটবি কে আয়, আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়রে,” এইসব লুটের কীর্ত্তন গাইলেন। তিনুদা’র হাতে দধিমঙ্গল হাঁড়ি, আম্র পল্লব

তাতে, নিজ হাতেই আম্র পল্লব নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় চারিদিকে ছিটোতে লাগলেন—ঐ দধিমঙ্গলের জল! চারিদিক থেকে হরি হরি বোল ধ্বনি, উলু উলু ধ্বনি উত্থিত হোতে লাগল, শেষে শ্রীল বাবাজী মহাশয় দধিমঙ্গল হাঁড়ি নিজে মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে নাম যজ্ঞের স্থানে ভেঙ্গে ফেললেন। গামছা তাঁর সঙ্গে ছিল, একটা টাকাও বাঁধা ছিল, গামছা পড়ে গেল—অমনি ছোট রমণদা' তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় বাঁধলেন।

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় বড় এক থালা হরির লুট নিয়ে, চারিদিকে ছড়াতে লাগলেন, আনন্দে সবাই কুড়োতে লাগল। সবাই দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে পাশে এসে বসে বিশ্রাম করলেন। তিনুদা' মরিচ জল এনে দিলেন সবাই পেয়ে, ঘোড়ার গাড়ী ক'রে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে আহ্নিক করতে বসলেন। ঠাকুরের ভোগ হোলো, আরতি সবাই দর্শন কোরলেন। প্রসাদ পাবার পাতা হয়েছে, সবাই প্রসাদ পেতে বসলেন। খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর চারুদা' হাসতে হাসতে বেশ জোরে বলতে লাগলেন,—কীর্ত্তনের খোল করতাল বাজা তো বন্ধ হোলো কিন্তু পেটের ভিতর এখন এমন খোল করতাল বাজছে যে এই বাজনার রেহাই কখন হবে তাই ভাবছি আমি। সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলাম।

চারুদা'র এই কথাটা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কানে গিয়ে পৌঁছল, অমনি তিনি আহ্নিক গুটিয়ে তাড়াতাড়ি উঠলেন, কারণ শ্রীল বাবাজী মহাশয় না এলে কেউ প্রসাদ পাবে না। প্রসাদ কোলে ক'রে সবাই বসে আছে। তাই কাল বিলম্ব না করেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসে প্রসাদ পেতে বসলেন, সবার শরীরে যেন প্রাণ এল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে চারুদা' ও আমার আসন পাতা। প্রসাদ পাবার কীর্ত্তন—ভজ মন—আরম্ভ হোলো। চারুদা' যেন মুস্কিলে পড়ে গেছেন, বেশ টেনে সুর করে ধরেছে সব—ভজ মন;—শেষ না হলে কেউ প্রসাদ পেতে

আরম্ভ করবে না। চারুদা' বলছেন,—শীগ্‌গির শীগ্‌গির সার, কিন্তু কেউ শোনে না. অগত্যা চারুদা' শুকতো দিয়ে প্রসাদ মেখে মুখে ভরে দিলেন এবং আস্তে আস্তে গিলতে লাগলেন, আবার একটা দলা মেখে মুখে দিতে যাবেন অমনি কয়জন চেঁচিয়ে বলছে 'ভজ মন' এখনও শেষ হয়নি। চারুদা' গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন,—"রেখে দে 'ভজ মন', পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে, ভজ মন !—কে কতটুকু ভজে, তা আমি খুব জানি"—বলেই আর একটা দলা মুখে পূরে মুখ বুজে বসে রইলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই সব তাঁর ব্যবহার ও কথা শুনে খুব হাসছেন। 'ভজ মন' শেষ হোলো, সবাই প্রসাদ পেতে আরম্ভ করলো। বেলা তখন চারটা। পরমানন্দে সবাই প্রসাদ পেলেন,—যুগলদা' ধ্বনি দিলেন, তার দেখাদেখি চারুদা'ও ধ্বনি দিলেন। আবার যুগলদা' ধ্বনি দিলেন,—"বিমল হেম জিনি তনু অনুপমরে তাহে শোভে নানা ফুলদাম কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলকরে তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর অতি, ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়। অরুণ বরন ছবি যেন প্রভাতের রবি, গৌর অঙ্গে লহরী খেলায়। চলিতে না পারে গোরাচাঁদ গোঁসাই গো, বলিতে না পাবে আধ-বোল ভাবেতে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল। এ সুখ সম্পদ কালে, গোরা না ভজিনু হেলে। হেন পদে না করিনু আশ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ গুণ গায় শ্রীবৃন্দাবন দাস।"

এই পদ শুনতে শুনতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভাবিত হলেন! আবার ভাব সম্বরণ করে প্রসাদ পেতে পেতেই চারুদা ধ্বনি দিলেন,—"হরি! হরি! বিফলে জনম গোয়াইনু। মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেনে তায়! এ সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে জুড়াইতে না

কৈনু উপায়। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচী সুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই! দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগাই-মাধাই। হা-হা, প্রভু! নন্দসুত, বৃষভানু-সুতাযুত, করুণা করহ এইবার। নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিও রাঙ্গা পায় তোমা বিনে কে আছে আমার।”

প্রায় প্রসাদ পাওয়া শেষ হয়ে এল। সবাই উঠবো উঠবো কোচ্ছে এমন সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটা ছোট ধ্বনি হাসতে হাসতে দিচ্ছেন,—“আর কি এমন দশা হব। নদীয়া বাসীর দুয়ারে দুয়ারে ফেলা ভাত চাঁটি খাব। নদীয়ার বালক যত টুকি ভরি মুড়ি খায়। হাসিতে খেলিতে ভূমিতে লোটয়ে কাঁখতে মন ধায়। সর্ব্বানন্দের মনের বাসনা শুনিবা যদি কেউ। নদীয়া বাসীর দুয়ারে দুয়ারে ডাকিয়া বেড়াব ফেউ।” এই ধ্বনির পর সব হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন! তখন পাঁচটা বেজেছে। তারপর আরও কত লোক প্রসাদ পেতে লাগল। ৭টা পর্য্যন্ত প্রসাদ পাওয়ার ধুম লেগে গেছলো। এমনি করে উৎসব শেষ হল।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু বিশ্রাম ক'রে উঠে বসে মালা জপ কোচ্ছেন। আমি. চারুদা' ও বলাইদা' প্রভৃতি ভক্তেরা অনেকেই তাঁর কাছে বসে আছি। কারও মুখে কোন কথাটি নেই। সবাই অনিমিখ নয়নে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখ পানে তাকিয়ে আছেন! একটা কথা জানবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জেগে আছে, মন গুমরে গুমরে উঠছে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে ফেলি বলে অমনি তাঁকে শুধালাম;—“সবাই বলেন, প্রসাদ পাবার সময় মৌন হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু আপনারা দেখি কেবল চিৎকার ক'রে ধ্বনি দেন, এর কারণ কি?” শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু হেসে বললেন,—“সর্ব্বদাই ভগবানকে স্মরণ, সর্ব্বদাই তাঁর কথা বলা, তাঁর গুণ গাওয়া, এই-ই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জিহ্বা দিয়েছেন শুধু

খেতে নয়, তাঁর গুণ গাইতেও হবে! তাঁর গুণ না গাইলে জিহ্বায় ব্যাংয়ের কলকলানি হয়। সাপ টের পেয়ে এসে ধরে। সর্ব্বদা হরি গুণ, হরি কথা কইলে যম এসে ধরবেনা; তাই ভক্তেরা স্নানে, ভোজনে, পথে চলতে সর্ব্বদাই নাম করেন, কীর্ত্তন করেন,—এখন বুঝতে পেরেছ?" আমি বললাম,—"হ্যাঁ" এতদিন একটা ভুল ধারণা ছিল! আজ আপনার মুখে শুনে সব ভুল ভেঙ্গে গেল।"

এইরূপ কত কথা বার্ত্তা হল, এমন সময় এস, সি, আড্ডি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ ক'রে জোড় হাতে বলছেন,—দাদা এ দীনের কুটীরে পায়ের ধূলো দিতে হবে! দুই চার দিন ওখানে কৃপা ক'রে থাকবেন, তা হোলে আমি একটু সেবার সৌভাগ্য পাব;—এইরূপ কত অনুনয় বিনয় ক'রে দুটো দিন শ্রীপাদকে তাঁর ওখানে থাকবার জন্য রাজী করালেন। সে রাত্রিটা শ্রীল বাবাজী মহাশয় তিনুদা'র বাড়ীতে রইলেন। পরদিন ভোরে সবাই সেখানে এলেন। এসেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদলে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, বিশ্বরূপদা' ও হরেকেষ্টদাদা বাজাতে লাগলেন; এমন সময় বসন্ত দাস বাবাজী বলে একজন বৈষ্ণব শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের নিকট এসে হাজির হলেন। তিনি বাবাজী মহাশয়ের গুরু ভাই—একথা পূর্ব্বে লিখেছি—একসময় পুলিস ইনস্পেক্টর ছিলেন, শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের চরণাশ্রয় ক'রে ভাগবৎ পরমহংস বেশ গ্রহণ করেছেন। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছেই এসে বসলেন। কীর্ত্তনে তাঁর খুব নৃত্যাবেশ দেখলাম।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রভাতি সুরে নাম ধরেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ, প্রভু নিত্যানন্দ আমার, প্রাণ গৌর চন্দ্র।"—এই সব পদ গাইতে লাগলেন, প্রায় চার ঘণ্টা ধরে কীর্ত্তন হোলো; অসংখ্য আঁখর দিয়ে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও তাঁদের যত পারিষদ, সবারই গুণ গেয়ে প্রার্থনা কোচ্ছেন। চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। আমিও কাঁদছি, সমস্ত লোকই কাঁদছে, প্রেমের বাদর লেগেছে যেন চারি-দিকে। হাজার হাজার লোক এসে কীর্ত্তন শুনছেন,—সকলে নীরব, নিঝুম প্রায়; কাহারও মুখে একটা কোন কথাই নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকেই সবার দৃষ্টি। তাঁর কাঁদা-বদন দেখে সবাই কাঁদছে।

আমি একটু শান্ত হয়ে ভাবছি,—একি ব্যাপার! একজনার কান্না দেখে এই এত লোক কাঁদছে! কই, কারও কান্না দেখে সবাই এমনি ক'রে কাঁদে নাতো! আমি এই সব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। সে-যে-কি ব্যাকুলতাময় কীর্ত্তন! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অশ্রু-কম্প-পুলক-হাসি এই সব সাত্ত্বিক ভাব, এমনভাবে শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছে যে তা আমি লিখে বা বলে ব্যক্ত করতে পারবো না। যাঁর জীবনে ভাব-প্রেমে বিভাবিত শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের স্বরূপ দেখবার ও কীর্ত্তন শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে তিনিই বুঝতে পারবেন এ-সব কিরূপ! এ-সব দেখেছি,—স্মরণ করে এ-সব লিখতেও আমি অবশ হয়ে পড়ি! বামন হয়ে চাঁদ ধরবারও সাধ হয়,—তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পূত জীবন কথা লিখছি মাত্র; একটু দিক্‌দর্শন মাত্র দিতেছি, তাঁর পূত জীবনী পড়লে এবং তাঁর কীর্ত্তনগুলো পড়বার সৌভাগ্য পেলে আমার এ-কথা একটুও অতিরঞ্জিত নয় বলে সবাই বুঝতে পারবেন।

যাক, প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হোলো। আবার দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মাতামাতি কীর্ত্তন হোলো। শ্রীবসন্ত দাস বাবাজী মহাশয় বহু রকম নৃত্য-ছন্দে নাচতে লাগলেন। বিশ্বরূপদা'ও অপূর্ব্ব নৃত্য করতে লাগলেন! খানিক পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়,—গৌর হরি, হরি বোল বলে—খুব টেনে নাম ধরলেন; তারপর খানিক মাতন কীর্ত্তন ক'রে নাম শেষ করলেন। শ্রীল বাবাজী

মহাশয় এস, সি, আড্ডির দোতালায় গিয়ে বসলেন। সবাই দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে চলে গেলেন কিন্তু প্রায় একশত লোক থেকে গেলেন। সবাই তাঁরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত; তাঁদের এস, সি, আড্ডি মহাশয় ওখানে মহাপ্রসাদ পেয়ে যেতে বললেন। আড্ডি মহাশয় ৬।৭ খানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক ক'রে গেটে রেখেছেন, গঙ্গা স্নানে যাবার জন্য। ১২টা বেজে গেছে, তাই শ্রীপাদ ও পারিষদবৃন্দ একটু মরিচ জল পেয়ে গাড়ীতে উঠে গঙ্গাস্নানে চলে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গাড়ীতে শ্রীবিশ্বরূপ গোসাই, চারুদা' ও আমি উঠলাম। গঙ্গার তীরে এসে গাড়ী থামল, আমরা সবাই নেমে গঙ্গার তীরে বসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তেল মাখাতে বসলাম; কারও মুখে কোন কথাই নাই। কীর্ত্তনের ভাবের আবেগ তখনও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের রয়েছে। তাঁর হাসি-খুসী মুখ না দেখলে চারুদা'র প্রাণ ভরে না; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ভাবও সম্বরণ হোচ্ছে না। তাই চারুদা' তেল মাখান ছেড়ে, আমায় শ্রীপাদকে তেল মাখাতে বলে সরে পড়লেন! তারপর একটু পরেই দেখিকি চারুদা' পাকা কলা কিনেছেন এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সামনে এসেই বলছেন,—"পেটের ভিতর ভীষণ হরিবোল ধ্বনি উঠছিল, বন্ধ করতে না পেরে, পকেটে একটী তুলসী ছিলেন তাঁহাই ঠেকিয়ে, এই হরিনাম বন্ধ করবার একটী সুকৌশল পন্থা আবিষ্কার করেছি!" এই বলে কলাগুলো খেতে লাগলেন, আর শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাসতে লাগলেন! চারুদা' আমার হাতে ও শ্রীবিশ্বরূপদা'র হাতে কলা দিয়ে বলছেন,—"নে, শীগ্‌গির শেষ ক'রে নিয়ে গঙ্গাস্নান করি। ভয় নাই সব তুলসী দেওয়া হয়েছে—'ছোবড়া শুদ্ধ।'" যেই এই সব কথা চারুদা' বলতে লাগলেন অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে হেসে বলতে লাগলেন,—রামদাসের সঙ্গী কিনা তাই এই রকম! আমরা সবাই খুব হেসে উঠলাম। তেলমাখা শেষ হল, চারুদা' বেশ এক টিপ নস্য নাকে টেনে খুব সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে শ্রীল বাবাজী

মহাশয়ের সেবার জন্য নস্যির কৌটা খুলে তাঁর সামনে ধরলেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাসতে হাসতে একটু নিয়ে চারুদা'র সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করতে করতে গঙ্গাস্নান করলেন। তীরে এসে তিনি বহির্ব্বাস ছেড়ে, নূতন বহির্ব্বাস পরে, চাদরখানা জড়িয়ে ওখানে ব্রাহ্মণের কাছে চরণামৃত পেয়ে গাড়ীতে উঠলেন। তখন ১টা বেজেছে, তাড়াতাড়ি আড্ডি মহাশয়ের বাড়ীতে এসে সবাই আহ্নিক করতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসল,—ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক ২॥ টার সময় সারা হল। তিনি প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত আহ্নিক করেন, আজ আড্ডি মহাশয় সকাল সকাল আহ্নিক করবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই আহ্নিক সমাপনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন; তবুও আহ্নিক সারতে ২॥টা হল। যুগলদা'ও অনেকক্ষণ আহ্নিক করেন। ঠাকুরকে স্মরণ মনন ক'রে তাঁর খুব দেরী হয় উঠতে। তিনি গৃহী লোক, তবুও সর্ব্বদাই প্রায় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে ছুটে আসেন। আহ্নিক, পূজা ও নাম-কীর্ত্তন—তাঁর প্রধান অবলম্বন। তাঁর কাছে স্ত্রী-পুত্র শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চাইতে যে খুব বেশী প্রিয় তা বলে মনে হয় না;—তিনি অবসর পেলেই তাঁর কাছে চলে আসেন।

তাঁর আহ্নিক করতে দেরী হোচ্ছে বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসেই ডাকিলেন,—যুগল! শীগ্‌গির ক'রে আহ্নিক সেরে নেও। এই কথা শুনেই যুগলদা' তাড়াতাড়ি আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেতে এলেন। যুগলদা' আসছেন দেখে, চারুদা' হেসে বলছেন,—"আসুন বৈষ্ণব গোঁসাই। সকল লোকেই জানে "এস, বি, রা খুব বড় ভক্ত। ওঁদের দেখেই আমরা নিতাই গৌর ভজি। ওঁদের আহ্নিক, ঠাকুর-সেবা আচার-বিচার আমাদের নকল করা উচিত।"—দুইজনায় খুব সখ্য ভাব তাই চারুদা' এমন বললেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলতে বলতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সবাই প্রসাদ পেয়ে উঠে বিশ্রাম করলেন। পাঁচুদা'

এ কয়দিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছেই আছেন। আজ সন্ধ্যায় শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে বাড়ী যাবেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, সবাই শৌচাদি সেরে সন্ধ্যা আরতি দর্শন করলেন। তারপর প্রায় সাড়ে ৮টার সময় ঘোড়ার গাড়ী ক'রে সবাই পাঁচুদা'র বাড়ী রওনা হোলেন।

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামল। সবাই ঝুলি ঝোলা, ঠাকুর নিয়ে যে যার স্থানে গেল। আজ সবাই একটু সময় পেলেন,—কেননা আজ শ্রীপাদের কীর্ত্তন কোথাও নেই, রাত্রি ৯টা বেজে গেছে তবুও সবাই নাম-জপ-কীর্ত্তন করলেন রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ;—শ্রীল বাবাজী মহাশয় মালা নিয়ে জপ করছেন আর বারান্দায় পাচারি ক'রে বেড়াচ্ছেন। মধু পূজারী সন্ধ্যার সময়েই আড্ডি মহাশয়ের বাড়ী থেকে আমাদের আগেই চলে এসেছেন ঠাকুরের ভোগ রান্না করবেন বলে। রাত ১২টা বেজে গেছে, ভোগ হয়ে গেছে। তিনি সবাইকে প্রসাদ পেতে ডাকলেন। সবাই পরমানন্দে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমি উপরের ঘরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের খাটের নীচে, পাশের দিকে কম্বল পাতলাম বিশ্রাম করবো বলে। কিন্তু রমণদা', হরেকৃষ্টদা' ও ভগবানদা' এরা সবাই আমাকে ডেকে বললেন,—"নীচে এসে বিছানা কর। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ওখানে মাত্র সেবক একজন থাকবে। তুমি চলে এস এখানে।" তখন আমি একখানা পাখা নিয়ে শ্রীপাদকে বাতাস কচ্ছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় খাটে বসে আছেন। পাঁচুদা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ যুগলে হাত বুলাতে লাগলেন! আমি তাদের ঐ কথা শুনে বললাম,—"আমি যাবোনা এখান থেকে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে সারারাত্রি বাতাস করব। আপনারা শুয়ে পড়ুন না!" এই কথা শুনে তাঁরা একটু উত্তেজিত হয়ে উপরে এসে আমায় বাতাস করা দেখে বলছেন,—"শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বিশ্রাম করতেও দেবেনা, চল নীচে চল।" আমি জেদ ক'রে বললাম,—

যাবোনা। অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—বেশতো, থাকুক না এখানে। একেবারে সবাই যেন জল হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে তাঁরা নীচেয় চলে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও খাটে শোবা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি ভাবলাম,—প্রায় দুটো বেজেছে আর ঘুমিয়ে কি করব! পাঁচুদা'কে বললাম,—"আজ তুমি ও আমি সারা রাত্রি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করব।" তিনি বললেন,—"বেশ তো! সারা জীবন তো খেয়ে পরে ঘুমিয়ে কাটছে, আজ না-হয় একটু গুরুসেবা করি!" পাঁচুদা'র এই কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হোলাম। কারণ আর কিছুই নয় ইহা ব্যতিরেকে যে তিনি শ্রীগুরু পাদপদ্মে অটুট মতি রেখেছেন ও শ্রীগুরু সেবাই তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে বুঝেছেন,—না ঘুমিয়েও তিনি শ্রীগুরুকে বাতাস করবেন! এই কথা শুনে মন আনন্দে ভরে গেছে।

সাড়ে ৪টা বাজল, শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঘুম থেকে উঠে বসেই আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"তোমরা ঘুমোতে যাওনি?" আমরা বললাম,—"না, আপনাকে বাতাস করছিলাম।" পাঁচুদা' একটু পরেই ঘুমের ঘোরে মেঝেতেই গামছাখানা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঘুম থেকে উঠতেই পাঁচুদা' জেগে পড়লেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,— "সমস্ত রাত্রি বাতাস করেছ বুঝি!" পাঁচুদা' একটু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে মধুর হেসে বললেন,—"আমার ভাগ্যে হোলো কই? ঘুমিয়ে পড়লাম।" খাট থেকে নেমে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচে গেলেন। পাঁচুদা' লোটা গামছা হাতে করেছেন দেখেই আমাকে বললেন,—"যাও একটু ঘুমিয়ে নেও।" আমার কাছেই কম্বল পাতা ছিল শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পাঁচুদা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের জল গামছা সব নিয়ে সঙ্গে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে এলেন। একটি ভাঁড়ে তিনি মাটি সুন্দরভাবে গুঁড়িয়ে রেখেছেন, তাতে অগুরু মাখান! শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাত-মাটি করবেন বলে তিনি ঐ অগুরু মিশ্রিত

মাটির গুঁড়া তাঁর হাতে দিলেন। কি সুন্দর গন্ধ! আমি একটু শুয়েই উঠে পড়েছি এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে খুজতে গিয়ে দেখছি,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচ সেরে হাত-মাটি কোচ্ছেন আর ভুর ভুর ক'রে সুন্দর গন্ধ আসছে।

আমি সব বুঝে ফেললাম। পাঁচুদা'র এমন সেবা-প্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি,—শ্রীগুরু সেবার জন্য মাটিতে অগুরু এসেন্স মাখিয়েছেন! তাঁর শৌচাদির শেষে এমন সুবাসিত হাত-মাটি এমনি ক'রে দিতে কাউকেই তো কোন দিন দেখিনি—শুনিওনি। মনে মনে ভাবছি—একেই বলে গুরুসেবা। তাঁর বাড়ী-ঘর-দুয়োর-ব্যবসা-বাণিজ্য সব শ্রীগুরু সেবার জন্য। ইনি খুব বড় একজন ব্যবসাদার, বহু টাকা উপায় করেন কিন্তু অর্থ-বিত্ত-বাড়ী-ঘর এ-সব তাঁর শ্রীগুরু সেবার জন্য! আমি এই সব মনে মনে ভাবছি অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বলছেন,—কি হে ময়না! কি ব্যাপারখানা, যাও ঘুমোওগে!"

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথা মত আবার একটু শুয়ে পড়লাম কিন্তু ঘুম আর হোলো না। নীচেতে ভগবানদা' ভোরেই প্রভাতি কীর্ত্তন আরম্ভ করেছেন। সবাই সেই নামে যোগ দিয়েছেন, কেবল আমি যাইনি, শুয়ে আছি একটু একটু তন্দ্রা আসছে, সূর্য্যও উঠে গেছে; আমি শুয়ে শুয়েই শুনছি,—অমনি একজন এসে খুব বকতে লাগল,—"ভারি ব্রহ্মচারী হয়েছেন, সাধু হয়েছেন, বামু নাই দেখাইয়া শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে যেন পেয়ে বসেছেন! কেবল চুলের বাহার করা! বামুন সকালে উঠে সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করবেন তা-না কেবল শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে জোঁকের মত হয়ে থাকা, আর ভাল ভাল প্রসাদ পাওয়া, কোন আচার-বিচার নেই! লোমকাপড় পড়ে পায়খানায় যাবেনা। আমাদের লোমকাপড় ছোবেই না।"—এই সব বলে আমায় বেশ একটু ভর্ৎসনাও করলেন। আমি নীরবে উঠে বসলাম, আরও একটু শাসন ক'রে বললেন,—"আজ রবিবার, তোমায় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে মন্ত্র নিতে হবে;

দীক্ষা নিতে হবে: নইলে আমাদের দলে থাকতে পারবে না, দীক্ষাহীন লোকের মুখও দেখতে নেই!" আমি এই কথা শুনে তাকে বললাম,—"আমি দীক্ষা নেব না। গুরুদেব নিজে এসে আমায় মন্ত্র দেবেন। আপনাদের মত আমি বৈরাগী হয়ে মাথা মুড়িয়ে ঘুরে বেড়াব না! আমি আমার চুলও ফেলবো না, মন্ত্রও নেবোনা, যা পারেন করুন আপনারা।"

আমার এই কথা শুনে তিনি খুব চটলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে নীচে চলে গেলেন,—এইবার বুঝি আমায় জব্দ করবার ফন্দি আঁটবেন! আমি উঠে বসলাম। আমার মনেও বেশ একটা গ্লানি এসেছে, ক্রোধও হয়েছে। এমন সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয় এলেন, আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি হয়েছে তোমার?" আমি বললাম,—"কিছুই না"—"তবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন?" আমি বললাম, "রাত্রে ঘুম হয়নি তাই।"—"ও তাই তবে চল আজ সকাল সকাল গঙ্গাস্নান করে আসি।" ৯টা বেজেছে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে ক'রে গঙ্গা স্নান করতে গেলাম। পথে দেখলাম, তিনি স্নান করে মালা জপ করতে করতে আসছেন,—তিনি অর্থাৎ যিনি আমায় অত শাসন বাক্য বলেছিলেন।—আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য তখনও হইনি, তত্রাচ তিনি কত প্রীতি করেন, গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে স্নান করতে যাচ্ছি!—এই সব অভিমান বশে মৃদু হেসে, যাতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় টের না পান এমনি ভাবে, তাকে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েই ব্যঙ্গ ভরে হাসলুম! সে গম্ভীর হয়ে গেল কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার এই দুষ্টামি ব্যবহার কিছুই টের পেলেন না; সে গম্ভীর হয়ে পাঁচুদার বাড়ী চলে গেল। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নান ক'রে এসে আহ্নিক করতে বসলেন।

সে দিন কলকাতা থেকে ১০।১২ জন দীক্ষা নিতে এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক শেষ হল। ঠাকুর এলেন, খোল করতাল এল, নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হল। শ্রীল বাবাজী

মহাশয় তাদের মন্ত্র দিতে লাগলেন,—এক এক জন করে মন্ত্র দিচ্ছেন। আমি একটু দূর থেকে তাদের সঙ্গে নাম করছি ও মন্ত্র দেওয়া দেখছি। আমি মন্ত্র নেবার ইচ্ছাও করিনা, আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও আমায় বলেন না, ডাকেনও না মন্ত্র নিতে,—সেইজন্য আমার বিশেষ আগ্রহও নেই! আমি মনকে এই সান্ত্বনায় শান্ত রেখেছি,—এত বড় মহাপুরুষ আমায় ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়ান,—এই যে আমার পরম সৌভাগ্য!

তারপর আমি বসে বসে অনেক সময় ভাবি,—"কই! আমিতো কারও চষা ধানে মই দেইনি, তারাও সব সংসার ছেড়ে এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে আছে। সবাইকে তিনি যেমন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন তেমনি আমাকেও দিয়েছেন,— তবে একটু বেশী ভালবাসেন, কারণ হয়ত, আমি ছেলেমানুষ! তারপর এরা সবাই গান কীর্ত্তন করতে পারে, আমিতো কিছুই পারিনে। তবুও তিনি কত ভালবাসেন, কত স্নেহ করেন,—এ সব শুধু তাঁর অপার, দুর্ব্বার করুণার স্বভাবে করেন!" আমি অনেক সময়ে এই রকমও বসে বসে ভাবি,—"আমি বৈষ্ণবোচিত ভাষা বলতে জানিনা, প্রসাদকে অনেক সময় ভাত বলে ফেলি, অনেক সময় প্রসাদ পাওয়ার সময় বলে ফেলি একটু ঝোল আমাকে দাও; তাই সবাই আমায় খুব শাসন করেন, খুব উপদেশও দেন।"

—সবাই আহ্নিক করতে বসেন, আমিও তাঁদের কাছে আহ্নিক করতে বসে আগে বেশ করে চুল আচড়াই;—এটা তাঁহাদের খুব ভাল লাগেনা। তারপর আমি ভেক নেইনি। এমনিই কৌপীন পরি; কাছা খুলে কাপড় পরি;—এটা আমার স্বভাব জাত হয়ে গেছে; তার কারণ বাড়ী থেকে বের হবার সময় মায়ের একখানা সাদা কাপড় ছিঁড়ে দু'খানা ক'রে পরি, তাই কাছা খুলে থাকি! ছোট টুকরা কাপড়ে কাছা দেওয়া যায়না, তাই সেই রকম অভ্যাসই হয়ে গেছে। আবার দীক্ষা নেইনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে,—এই একটা

তাদের আক্রোশ আমার উপর সর্ব্বদাই আছে, মাঝে মাঝে তার আভাসও আমি পাই। আবার একদিন তাদের আমি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়েছি ;—এই সমস্তই কারণ বলে মনে হোচ্ছে।

যাক, এইরূপ ভাবে পাঁচুদা'র বাড়ীতে দিনগুলো কাটছে! মধ্যে মধ্যে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর সঙ্গে কীর্ত্তনে আমায় ডেকে নিয়ে যান, আমি পরমানন্দে তাঁর সঙ্গে যাই, আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসি ; তাঁর কাছে বসে কীর্ত্তন শুনি, কীর্ত্তন একটু একটু করি ; আবার তাঁর পাশে বসেই প্রসাদ পাই। একদিন সকালে উঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"ময়না, আমি এখন কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে আমার বারোটা একটা হবে, তোমরা সব থাক।" আমি কেঁদে ফেলে বললাম,—"এখন ৬টা বেজেছে, ৬ ঘণ্টা আপনাকে দেখতে পাবনা! শ্রীল বাবাজী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,— "উপরে চৈতন্য ভাগবৎ আছে, পড়বে ; আর এদের সঙ্গে ট্রামে গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে এসো, আমি শীঘ্রই চলে আসব।"

আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথায় আশ্বস্ত হোলাম এবং চুপ ক'রে রইলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় মেঘলালদা'কে নিয়ে ট্রামে কলকাতায় চলে গেলেন। ৮টা বাজল, সবাই গঙ্গাস্নান করতে চললেন, আমাকেও তাঁরা ডেকে নিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে বাঁধাঘাটে গেলাম। সবার সঙ্গে আনন্দে গঙ্গাস্নান ক'রে ট্রামে উঠলাম, কত গল্প হোচ্ছে তাঁদের,—"অমুক বাড়ীতে সুন্দর ভোগ হয়েছিল ; বেশ প্রসাদ সে দিন পেলাম। ওদের প্রীতি খুব। আবার কাল কি সুন্দর মোচার রসা ভোগ হোলো, বরফির মত সব বানিয়েছে।"—এই সব কথা শুনতে শুনতে আনন্দে ট্রামে আসছি তাঁদের সঙ্গে, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম,—রাস্তার পাশে একটা দোকানে পাঁঠা মেরে ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে, হঠাৎ সবারই দৃষ্টি ওদিকে পড়ল ; আমারও নজর যেই পড়ল অমনি আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ রহস্য ছলে বে-ফাঁস কথা বলে

ফেললাম,—"আপনারা ভোগ ভোগ কচ্ছেন, আচ্ছা এই পাঁঠার মাংস ভোগ হয়না এখানে? আমাদের দেশে মায়ের পূজোয় পাঁঠার মাংস ভোগ দেওয়া হয়। আপনাদের এখানে মায়ের পূজায় লাগেনা?"

যেই এই কথাগুলো বলেছি আর যাই কোথায়! কিলটা চাপড়টা ঘুষিটা আমার উপর বর্ষণ হতে লাগল। ট্রাম পাঁচুদা'র বাড়ীর কাছে এসে থামল। আমার চুলের মুট ধরে, ট্রাম থেকে নামিয়ে তাঁরা বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে বললেন,—"আর আমাদের কাছে থাকতে পারবে না। আমাদের দলে যদি যাও তবে ভাল হবেনা। তোমাকে বিদায়, যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এলে আমরা সবাই তোমার এই অশ্রাব্য কথা জানাব। যাও চলে যাও, দূর হয়ে যাও আমাদের দল থেকে।" আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম,—মনের বেদনা আর কিল চড়ের বেদনা, তারপর আরও বেশী বেদনা এই যে আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ বা তাঁর কাছে থাকতে পাবোনা! ভাবলুম, এখানেই আমার ভাগ্য বিপর্য্যয় হয়ে গেল, আমায় আর কে আশ্রয় দেবে! ওখানে একটা চৌমাথা রাস্তা ছিল, আমি তারই পাশে বসে হাঁটুর ভিতর মাথা দিয়ে গুমরে গুমরে মনের বেদনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। কত লোক সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারও দিকে আমার দৃষ্টি নেই। কতজনা বলে,—বলি, ওহে ছোঁড়া, কাঁদছ কেন? আমি তাকিয়েও দেখিনা, উত্তরও দেই না। হঠাৎ এইরূপ ভাবে আমার এই দুর্দ্দিন এসে পড়েছে! আমি মনে মনে ভাবছি,—"আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, আরতো ও-দলে নেবেনা, এখন যাইবা কোথায়! পয়সাও নেই, কলকাতায় বিশেষ কাউকে চিনিনা, একমাত্র শ্রীল বাবাজী মহাশয়কেই চিনি। তিনি ভালবাসেন, এখন দেখছি তাঁর স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেলাম।" এমন সময় কে যেন এসে আমার সামনে বসে

মাথায় হাত দিয়ে বলছেন,—"ওঠো! এখানে বসে বসে কাঁদছ কেন? চল প্রসাদ পাবে।" আমি হঠাৎ তাকিয়ে দেখি,—ভীষণ রৌদ্রে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একখানা গামছা মাথায় দিয়ে আমার সামনে এসেছেন! এ-দেখে আমি দুঃখে ও আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আদরে মুখ ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—"আমি সব শুনেছি,—বেটার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তোমায় মেরেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে! ও মালিক সেজেছে বুঝি! চল আমার সঙ্গে, দেখি কার ঘাড়ে কটি মাথা আছে।" আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের স্নেহভরা আশ্বাস ও সান্ত্বনা বাণী শুনে আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও স্নেহে আপ্লুত হয়ে নিজের গামছা দিয়ে আবার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলছেন,—"তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা! এখন আমি গিয়ে ওদের জন্মের মত বিদায় দোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা ওদের! আমার কাছে তুমি আছ, আমার উপরও তারা প্রভুত্ব চালাতে চায়।"

শ্রীল বাবাজী মহাশয় বেশ একটু ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমাকে সঙ্গে ক'রে পাঁচুদা'র বাড়ীতে এসে ডাকলেন,—"রমণ! তোমরা সব শুনে যাও। তোমরা কার হুকুমে একে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমাদের কোত্থেকে হোলো? ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি? এখন আমি যদি তোমাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিই, কেমন হবে তখন?" অমনি রমণদা' বললেন,—"এ দীক্ষা নেয়নি, পাঁঠার মাংসকে প্রসাদ বলে, রসাকে ঝোল বলে, প্রসাদকে ভাত বলে।" এই কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আরো রেগে উঠে বললেন,—"নিজেকে কি বিচার করেছ? আমার কাছে আসবার আগে কেমন সাধু ছিলে তুমি? তখনতো মাছের ঝোল খেয়ে একতারা নিয়ে গেরুয়া কাপড় পরে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াতে! সে সব ভুলে গেছ

বুঝি? মনে ক'রে দেখ, আমার কাছে আসবার আগে কি ছিলে তুমি? এ ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমাদের বৈষ্ণবোচিত ভাষা জানেনা, যার জন্য তোমরা তাকে এত মেরেছ, আবার তাড়িয়েও দিয়েছ! শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম বুঝি পেটান—আর কিল ঘুষিটা মারা নাকি? তোমরা বৈষ্ণব সেজে এই রকম একটা কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে পড়েছো!"

"এ-ধর্ম্মের শিক্ষা,—তৃণের মত নীচু হওয়া; তরুর মত সহিষ্ণু হওয়া; অমানীকেও মান দান করে, সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করা,—এ-সব স্বভাব তোমাদের চুলোর দুয়ারে গেছে! ছেলেটি আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু, মা ও বোন ছেড়ে, সংসার ছেড়ে এসেছে আমার কাছে। ৭০।৮০ জন লোক এদের বাড়ীতে! সমস্ত মমতা সে ত্যাগ ক'রে আমার কাছে এসেছে। তাকে একটু ভালবাসি, আদর করি, তাতেই তোমাদের এমন জ্বালা? তোমরা কি ছিলে একটু ভাব-না দেখি!" আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের এই সব কথা শুনে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে পড়েছি,—আমার দিক্ হয়ে ওঁদের এত কঠোর শাসন করছেন; কিন্তু সত্যই আমারি খুব অন্যায় হয়েছে; ওঁরা আমার চাইতে বয়সে বড়, তারপর অনেক দিন ওঁনারা সাধু হয়েছেন; সত্যই আমার অপরাধ হয়েছে ওঁদের কাছে। অতএব ওঁদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াই আমার কর্ত্তব্য;—যেই এই কথা মনে হোলো অমনি দেখছি,—ওঁরা সব মাথা নীচু ক'রে চোখের জল ফেলছেন! আমি আর থাকতে না পেরে রমণদা'র শ্রীচরণ জড়িয়ে ধরে বললাম,—"যা হবার হয়ে গেছে এখন আমায় ক্ষমা করুন।" এই কথা. বলা মাত্রই রমণদা' আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আস্তে আস্তে সরে গেলেন।

তারপর ৪০ বৎসর ধরে শ্রীরমণদা'র সঙ্গ পেয়েছি, আর এক দিনের জন্যও তিনি আমায় অপ্রীতি করেন নি। শ্রীপাদ

আমাদের সদা সর্ব্বদাই স্নেহ প্রীতি ও উপদেশ দিতেন! একদিন তিনি উপদেশ দিতে লাগলেন,—"বৈষ্ণবসঙ্গ বড় দুর্লভ। তাঁরা যদি কখনও শাসন করেন বা দুর্ব্বাক্য বলেন তবুও তার ভিতর এক অপার করুণা নিহিত রয়েছে জেনো। আমাদের সৎসঙ্গ নেই, বৈষ্ণব সঙ্গ নেই। সংসারে কেবল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গই আমাদের লোভনীয়, তাই তাকে আঁকড়ে ধরি। কেবল স্বার্থের জন্যই ভালবাসা, স্বার্থের আঘাত আসলে সবাই বিমুখ হয়ে যায়, তথাপি শ্রীগুরু বৈষ্ণব সঙ্গ আমরা করিনা বা তাঁদের এতটুকু সেবা করবারও লালসা আমাদের হয়না; কেবল তাঁদের দোষ অনুসন্ধান ক'রে নিন্দাই ক'রে থাকি; তাই দেখনা ঐ চরিতামৃতে কি মহান বাণী লিখিত হয়েছে,— 'সবারে করিবেন উদ্ধার গৌরাঙ্গ সুন্দর। ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব দুরাচার। নিন্দায় নাহিক কার্য্য শুধু পাপ লাভ। এ কারণে নিন্দা ছাড়ে মহামহা ভাগ। অনিন্দুক হইয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে! সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিবেন হেলে'।" এখন এই সমস্ত কথা মনে হোলে নিজের বুদ্ধির গোড়ায় জল আসে বটে কিন্তু আমরা স্বভাব ছাড়িতে পারিলাম কই!

এ-সব কথা বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক করতে বসলেন, আমি আবার পূর্ব্বের মতন তাঁর কাছে বসলাম;—পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলুম। পাঁচুদা'র স্ত্রী স্নেহ বসে জিজ্ঞাসা করলেন.— তোমায় মেরেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি? আমি বললাম,—ও-সব কিছুই না। এই বলে আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করতে লাগলুম, তিনি আমার কথা শুনে খুব হাসলেন আর কিছুই বললেন না। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আহ্নিক-সারা হোলো। সবার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে, শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পেতে বসলেন, আমিও তাঁর কাছে বসলাম। পাঁচুদা' একখানা পাতা এনে দিলেন, মধুদা' প্রসাদ দিলেন, আমি আনন্দে পেতে লাগলুম। পাঁচুদা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করতে লাগলেন। 'প্রসাদ পাওয়া শেষ

হলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় খাটে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। পাঁচুদা'ও প্রসাদ পেতে চলে গেলেন। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেবা না হোলে কখনও প্রসাদ পান না, সে যত বেলাই হোক-না কেন!

এইরূপ পরমানন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের স্নেহ-বাৎসল্যে আমার জীবন কেটে যাচ্ছে। আর বাড়ীর কারও কথা মনে পড়ে না। এমন পবিত্র, অমল, নিরঙ্কুশ ও স্বর্গীয় ভালবাসা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের, যে মায়িক জগতের সমস্ত ভালবাসা আমায় তিনি ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং প্রভুর নাম কীর্ত্তনে, প্রভুর লীলাস্থলী দর্শন করিয়ে আমাদের কৃতার্থ করে রেখেছেন। এ-ভালবাসা আমি এই মর্ত্তজগতে কখনও কারও কাছে পাইনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিতা মাতার অপার স্নেহ, বন্ধু বান্ধবদের পবিত্র ভালবাসা, সব যেন মূর্ত্তিমান হয়ে প্রকটিত হয়েছেন একাধারে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মধ্যে; তিনি ভালবাসার মূর্ত্তস্বরূপ! হায়, তাঁকে আমি চোখে দেখিয়াও অনাদর করেছি! তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে গেছি! তবুও তিনি আমাদের জন্য কত করুণ বেদনা ও স্নেহ-ভরা অন্তর নিয়ে প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন! আমাদের দুর্দ্দৈব অসীম ও অনন্ত! আবার তাঁর করুণাও তাঁর থেকে অতীব মহান বলিলেও ভুল হবে না। ইহার সব জ্বলন্ত প্রমাণ এইত এখনও আমরাই রয়েছি।

এইরূপ পরমানন্দে দিনগুলো কাটছে। হুগলিতে আড্ডি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন হবে। অনেক বড় লোক ভক্তেরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এসেছেন; আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীগুরু ভৈরব চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ও এসেছেন; শ্রীরামনবমীতে সেখানে অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তন হবে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় যখন রাম বাগানে থাকতেন তখন নাম-সংকীর্ত্তন নিয়ে তাঁর দিনগুলো সেথায় কাটত। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর ও জয় নিতাই প্রভৃতির সঙ্গ ছেড়ে যখন তিনি নামানন্দে ঘুরে বেড়ান,

তখনই এই শ্রীভৈরবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, এবং তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তখন মহামন্ত্র নাম দেন। তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁকে শ্রীগুরু বলে আন্তরিক অসীম শ্রদ্ধা করেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের উপর এঁনার অপূর্ব্ব বাৎসলা স্নেহ। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে দণ্ডবৎ করলেই তিনি তাঁকে বুকে টেনে তাঁহার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহ করেন, আর অমনি চোখের জলে ভেসে যান। তাঁর বাড়ী সিঙ্গুরে, তাই তিনি সেখানে আগে অষ্টপ্রহর নাম করতে রাজী হোলেন, তারপর হুগলীতে যাবেন এই কথা বাবুদের বললেন। হুগলীর বাবুভক্তেরা একটা দিন পেয়ে বাড়ী রওনা হয়ে গেলেন। শ্রীল ভৈরব চন্দ্র গোস্বামীও সিঙ্গুর চলে গেলেন।

অতঃপর আমরাও পরদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে খোল করতাল সব লয়ে সকালে সিঙ্গুর অভিমুখে রওনা হোলাম। ট্রেন এসে ষ্টেসনে থামল, ষ্টেসন থেকে বাড়ী অনেকটা দূরে, আমরা সবাই হেঁটে সেখানে পেঁাছলাম। বাড়ীর কাছে এসে পেঁাছতেই শ্রীল দাদামহাশয় চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলেন,—ওরে কোথায় আছিস, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ক'রে আয়, ও গিন্নি শীগ্‌গির এস, দেখ কে এসেছে! আমার রাম এসেছে! একেবারে যেন পাগলপানা হয়ে গেছেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। শ্রীল দাদামহাশয় আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়েছেন,—পরণের কাপড়খানাও খুলে যাচ্ছে! কাছাও খুলে গেছে! কাছা দেবার আর সময়ই পাচ্ছেন না, কাছা হাতে ক'রে না গুজেই ছুটছেন আর বলছেন,—ও গিন্নি ও গিন্নি শীগ্‌গির এস, আমার রাম এসেছে। এইরূপ বাৎসল্য স্নেহ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি তাঁর ছেলে মেয়েরা ছুটে এল। তাঁর স্ত্রীও ছুটে এলেন অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর চরণোপরি মস্তক রেখে দণ্ডবৎ করলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দেখাদেখি উপস্থিত সবাই দণ্ডবৎ করল।

তারপর শ্রীদাদা মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের হাত ধরে, তাঁর সেবিত বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর সামনে তাঁকে নিয়ে এসেই কাঁদতে লাগলেন, বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন,—"দীনের কুটীরে ভাঙ্গাঘরে থাক! আমার রাম এসেছে! যা-হয় তুমিই তাঁর যত্ন নিও।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন। আমরাও সবাই দণ্ডবৎ ক'রে সেখানে একটি বট বৃক্ষের তলায় মাদুর পেতে বসলাম। চোখের জল ফেলে দাদামহাশয় আমাদের সবাইকে বলছেন,—"আমার মহাপ্রভু কাঙ্গাল! ভাঙ্গা ঘরে থাকেন, আমি আর তোমাদের কিইবা যত্ন করতে পারি? এই সব কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলছেন,—"আপনি স্থির হয়ে বসুন, আমরা সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথা মত ঐ বটবৃক্ষ তলে একটি আসন পেতে তাঁকে বসান হোলো। শশীদা' তামাক সেজে হুকোয় কলকে দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, আর অমনি—বেশ! বেশ! বাবা—বলে তিনি হুকো হাতে নিয়ে তামাক টানতে টানতে গল্প গুজব করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী,—দিদিমা—এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন,—দেখতে খুব কালো ও রোগা আবার নাকে নথ, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে শ্রীদাদামহাশয় হাসতে হাসতে বলছেন,—রাম ঐ দেখ যেন সাক্ষাৎ—শ্রীল বাবাজী মহাশয় দিদিমার চরণে দণ্ডবৎ করলেন, আমরা সবাই তাঁর এই সব কথা বার্ত্তা শুনে হেসে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও হাসতে লাগলেন।

গ্রামবাসী সব এসে জুটেছে। আজ অধিবাস, তাই অধিবাসের সব জোগাড় হোচ্ছে। শ্রীল দাদামহাশয়ের কয় জন শিষ্যও এসেছেন। গরীব লোক তারা, কেউ চিড়ে, চাল, কেউ সজিনার ডাটা, থোড়, মোচা প্রভৃতি নিয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সামনের উঠোনে সব রাখছেন। শ্রীল দাদামশায়কে সবাই প্রণামী দিচ্ছেন—কেউ দুই আনা, কেউ চারি আনা, কেউবা আনা

পরমানন্দে তাই তিনি ট্যাকে গুজছেন আর আনন্দে দিশেহারা হয়ে এদিক্ সেদিক্ ঘুরছেন। শালকিয়া থেকে পাঁচুদা'ও এসেছেন; শ্রীপাদ তাঁকে ইঙ্গিত করলেন—দশ টাকার দশ খানা নোট দিতে। পাঁচুদা' এক শত টাকা তাঁর হাতে দিলেন—উৎসবের জন্য।

এই টাকা পেয়ে আনন্দে তিনি আটখানা হয়ে বলছেন,—"রাম! এত টাকা তুই এলেই পাই শ্রীমহাপ্রভুর সেবার জন্য। এত টাকা আমি চোখেই দেখিনা, শ্রীমহাপ্রভু জোটাল, ভালই হোলো। শ্রীমহাপ্রভুরও সেবা করতে পারব, তোমাদেরও সেবা করতে পারব। আমার মহাপ্রভুকে ভাত ডাল আর লঙ্কা ভেজে কত সময় ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাই।"

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত এসেছেন। নাম অনেকেরই মনে পড়ছে,—শ্রীপ্রিয়নাথ কাকা শ্রীনরোত্তম কাকা, শ্রীবসন্ত কাকা, শ্রীনন্দ কাকা, ভগবানদা', ছোট রমণদা', জানকীদা', উপেনদা', হরেকৃষ্টদা', শ্রীবিশ্বরূপদা', শশীদা', কৃষ্ণকমলদা', নরোত্তম কাকা প্রভৃতি কত সব ভক্ত এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন, শুনে অনেক দূর গ্রাম থেকেও লোক আসছে। অধিবাসের সমস্ত জোগাড় হল, শ্রীনরোত্তম কাকা আরতি করলেন ঠাকুরের। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। মদনদা'ও এসেছেন, আজ মদনদা' ও জানকী খোল বাজাতে লাগল। রীতিমত অধিবাস কীর্ত্তন হোলো তারপর ঘিরে ঘিরে—ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥—এই নাম কীর্ত্তন হোলো।

এখন সবাই একটু বিশ্রাম করলেন। শ্রীমধুপূজারী ও শ্রীনরোত্তম কাকা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আমাদের প্রসাদ পেতে ডাকলেন, রাত্রি তখন একটা; পরমানন্দে সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। ভোর পাঁচটার সময় প্রিয়নাথ কাকা, ছোট রমণদা' প্রভাতি সুরে নাম করতে লাগলেন, শ্রীল দাদামশায় আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাম

করছেন, আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে গ্রামের বহুলোক এসে জুটল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পাঁচুদা'কে বললেন,—"যত লোক আসবেন সবাইকে প্রসাদ দিতে হবে, সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।" পাঁচুদা'—যে আজ্ঞে—বলে, দূর বাজার হতে সব জিনিষপত্র—চাল, ডাল, ঘি, তেল আরও কত কি—কিনে ভারে ভারে নিয়ে এলেন। পাঁচুদা'র অপূর্ব্ব শ্রীগুরু ভক্তি! একটু ইঙ্গিত করা মাত্রই, একটু আদেশ করা মাত্রই—যে আজ্ঞা—ছাড়া, আর কোন কথা ছিলনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পালনই তাঁর যেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। অর্থের দিক থেকে তাঁর কোনই কার্পণ্য ছিল না।

শ্রীল দাদামহাশয়ের একটি ছোট ছেলে নাম তার নিতাই, মাত্র ৫।৬ বৎসর বয়স। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হোলো। তার সঙ্গে আমরা দুই তিন জন লুকোচুরি খেলছি! আমি একটা ভীষণ চালাকী করলাম,—বটগাছের শিষ জিহ্বায় রেখে বেশ পাখীর মত শব্দ করা যায়, এটা আমি শিশুকালে বাড়ীতে শিখেছিলুম। হাত মুট করে নাচচ্ছি আর মুখের ভিতর সেই শিষটা নিয়ে পাখীর মতন শব্দ কচ্ছি, অমনি নিতাই ছুটে এসে আমায় ধরল—মুঠ খুলে পাখী নেবে বলে। সে ভেবেছে,—এই মুঠোর ভিতরই পাখী রয়েছে; তাই হাত খুলবার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু আমি কিছুতেই খুলিনা, কেবল মুঠো নাচাচ্ছি, আর মুখে শব্দ কচ্ছি! সে পাখী নেবে বলে জেদ ধরল, আমি কিছুতেই দোবো না, শেষে ভ্যাক্ ক'রে কেঁদে ফেললো এবং বলল,—দাদার কাছে বলে দোবো, ফাঁকি দিচ্ছ আমায়।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আড়াল থেকে আমাদের এই সব ব্যবহার দেখে আর নিতাইয়ের কাঁন্না দেখে আমাদের কাছে এসে আমায় বললেন,—বড় হয়েছ, এখনও ছেলে মানুষী গেল না? অমনি আমি মুখ থেকে ঐ শিষটা বের করে তাকে শিখিয়ে দিলাম; সেও ঐ

রকম করে পাখীর ডাক ডাকল, খুব আনন্দ হোলো তার। তারপর আমি বললাম,—"চল নিতাই আমরা কীর্ত্তন করি গিয়ে।" আমি আরও অনেক ছোট ছেলেদের ঐ পাখীর ডাক শিখিয়ে দিয়েছি বলে সবাই খুব আমার বাধ্য হয়েছে, তাই সবাই মিলে আমরা কীর্ত্তনে নাচতে লাগলুম। ছোটদের বেশ একটা দল হোলো। এমনি ক'রে পরমানন্দে সবাই নাম করছি! দুপুরে সবাই মিলে প্রসাদ পাওয়া হোলো, বৈকাল থেকে গ্রামের লোক কীর্ত্তন শুনতে আসছেন। সন্ধ্যা-আরতির পর শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করলেন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত। তারপর প্রসাদ পেয়ে সবাই বিশ্রাম করলেন। সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম-যজ্ঞ যেই শেষ করলেন অমনি শ্রীল দাদামহাশয় হুহু ক'রে কেঁদে ফেললেন,—চোখের জলে ভেসে বললেন,—"আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল।"—খুব গড়াগড়ি করলেন ঐ নাম-যজ্ঞের স্থলে।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় নগর কীর্ত্তনে বের হোলেন। নাম নিয়ে গ্রাম ঘুরে এলেন,—নগর ভ্রমিয়ে আমার গৌর এল ঘরে। গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে—এই সব কীর্ত্তন করলেন। শ্রীল দাদা মহাশয় পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন! যেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় পদ ধরলেন,—ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে ক'রে—আর কোথায় যাবেন! শ্রীল দাদামহাশয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জড়িরে ধরে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন! শ্রীনন্দ কাকা ছুটে এসে শ্রীল দাদা মহাশয়কে জড়িয়ে ধরলেন। পরমানন্দে সবাই আত্মহারা হয়ে গেছেন, তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন শেষ ক'রে যেই—আয়রে তোরা লুটবি কে আয়,—বলে এই লুটের কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন আর অমনি সবাই মনোরম নৃত্য করতে লাগলেন! শ্রীল বসন্ত কাকা ও শ্রীল দাদা মহাশয় অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নাচতে লাগলেন।

শেষে—গৌর হরি বোল—কীর্ত্তন ক'রে. নাম শেষ হোলো।

শ্রীল দাদামহাশয় দধি মঙ্গলের হাঁড়ি নিয়ে সবাইকে হলুদ জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে গায়ে মাথায় দিতে লাগলেন। তারপর দধি মঙ্গলের হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেললেন। সেই হলুদ জলে সবাই গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এইরূপ পরমানন্দে নাম-কীর্ত্তন শেষ হোলো! সবাই স্নানাদি সমাপন ক'রে আহ্নিক করতে বসলেন। আমি ও নিতাই পাখা নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসে তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম।

বহুদিনের কথা কিছুই ভুলিনি! শ্রীপাদ বলছেন,—"দেখেছ, তোমার দাদামহাশয়ের কি মহাপ্রভুতে প্রেম! আমার উপর তাঁর অপার বাৎসল্য স্নেহ! আমার যখন দীক্ষা নেবার জন্য ব্যাকুলতা আসে তখন তিনি আমাকে মহামন্ত্র ও বীজ দেন, তারপর শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় আমাকে দীক্ষা দিলেন। তোমার দাদামহাশয় আমায় 'নাম' দিয়ে বললেন,—নাম কর—সব লাভ হবে। নাম করতে করতে পথে তিনটি লোকের সঙ্গে দেখা হবে,—লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা এরা সব আসবে। ঐগুলো বাঁচিয়ে চোলো। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?" আমি বললাম,—বুঝেছি। শ্রীপাদ বলছেন,—"আমি শ্রীজগবন্ধুকে পাই বন্ধুর মতন, আর এঁকে পাই বাবার মতন, আর বড় বাবাজী মহাশয়কে পাই দাদার মতন। এই সম্বন্ধ ছাড়া আমি আর ঠাকুর দেবতার মতন ওঁদের দেখতে পারিনি। আজ কাল কেবল ভগবান, আর অবতারের যুগ পড়ে গেছে! আজ কাল কত ভগবান হয়েছেন! কত কত যে অবতার তাঁর সংখ্যাই যেন নাই! দাস কেউ হতে চায় না! এখন ভক্তিমান্ লোকে ভক্তিভাজন ও ভক্তকে ভগবান বানিয়ে ফেলেন! কিন্তু তিনি যে ভগবানের একান্ত দাস, এবং ভগবানও যে ভক্তাধীন—এ-ভাবে আর কেউ ভাবেনা।"

"অবতারের প্রমাণ সমস্ত শাস্ত্র ক'রে গেছেন। শাস্ত্রে তার দিগ্‌দর্শনও রয়েছে। আমি 'বন্ধুর' মধুময় সঙ্গ ছোট বেলা থেকেই পাই। আমি চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সে সমস্ত রাত্রি জেগে তাঁর

সঙ্গে তাস খেলেছি। বন্ধু ছেড়ে তাঁকে অন্য কিছুই ভাবিনি, গান কীর্ত্তন তাঁর আদেশেই করেছি। তাঁর কৃপাই আমার জীবনের সব কিছু।"

"তারপর এই সিঙ্গুরের বুড়োকে বাবার মত দেখেছি। দেখছিস্‌তো! কেমন ভালবাসা তাঁর? সন্তানের মত আমায় স্নেহের চোখে দেখেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা, আমায় রামদাদা বলে ডাকে। তারপর শ্রীল বড়বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ হোলো, প্রথমেই তিনি বললেন—ভাই রাম, একটু নাম শোনাও, সেইথেকে তাঁকে ঐ চোখেই দেখি। তিনি আমায় দীক্ষা দেন,—কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা, গৌর মন্ত্র, নিতাই মন্ত্রাদি সব দেন। কিন্তু আমি কখনও ভগবান বলে দেখিনি তাঁকে, প্রভুর প্রিয় শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপেই তাঁকে দেখেছি! তাঁকেও অনেকে অবতার ও ভগবান বানিয়েছে! দেখনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কথা,—শ্রীমদ্ভাগবৎ, মহাভারত এমন কি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে পঞ্চদশ পুরাণেই তাঁর অবতারত্বের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাঁকেই কিন্তু আজকাল ভগবান বলে বহুলোকেই মানতে চায়না,—একজন ভক্ত-মহাপুরুষই বলতে চায়! তাঁর পাষাণ-গলান লীলা, প্রেম-প্রদান লীলা, পতিত-উদ্ধারণ লীলা সবাই দেখছেন!"

ঝারিখণ্ড পথে শ্রীবৃন্দাবন যাবার সময়, পশুপক্ষী, ব্যাঘ্র, হস্তি, হরিণ, শূকরাদি পশুদেরও নিত্য-স্বভাব জাগিয়ে দিয়েছেন—হরি-নামে নৃত্য করতে করতে তাঁর সঙ্গে চলেছে সব, এমনই মহিমা তাঁর! শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপই হোচ্ছে জীবের নিত্য-স্বভাব-জাগান স্বরূপ! তাঁকেই কেউ মানতে চায়না! আবার সব নূতন ভগবানের ঢেউ উঠেছে! কিন্তু দেখ, ভক্তের মহিমাও কত গরীয়সী! ভগবানের চাইতে ভক্তেরও ভক্তি-প্রেম-শক্তি কত মহীয়সী! হনুমান পরম ভক্ত রামচন্দ্রের। শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর বেঁধে তবে লঙ্কায় যেতে হয়েছিল, কিন্তু মহাবীর হনুমান, 'রামনাম' করেই এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করে যান! প্রহ্লাদের ভক্তির বলে, তাঁর কথার সত্যতা রক্ষার

জন্য স্ফটিক স্তম্ভ হতে নৃসিংহরূপে ভগবানকে আবির্ভূত হতে হয়েছিল ! অর্জ্জুনের সখ্য প্রেমে সেই অনাদির আদি গোবিন্দ রথের লাগাম ধরে রথের সারথী হয়েছেন !"

"দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ রাজা হয়েছেন তখন তাঁর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য। কত শত ব্রহ্মা এসে তাঁকে স্তুতি বন্দনা করছেন। কিন্তু দীন দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের জন্য রাজ সিংহাসন ছেড়ে, শ্রীকৃষ্ণও ছুটে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন,—পাশে এনে সিংহাসনে বসান ! লক্ষ্মী যাঁর দাসী, অষ্ট সিদ্ধি নবনিধি যাঁর পদতলে লুন্ঠিত হয়ে থাকে, সমস্ত দেবতার শিরস্থিত মুকুট যাঁর চরণ তলে লুটোপুটি খায়: যিনি অবতারী, সমস্ত অবতারের মূল কারণ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য সখা সুদামা বিপ্রের কাছ থেকে চিঁড়ে কেড়ে নিয়ে খেলেন ! সুদামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দশ ভুবনের রাজা। এখন দ্বারকার রাজা হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাই গরীব ব্রাহ্মণ রাজদর্শন করতে আসবেন.—কি উপঢৌকন নেবেন ! কয়মুটো চিঁড়ে সুদামা ছেঁড়া নেকড়ায় বেঁধে নিয়ে গেছলো ! আর কি শ্রীকৃষ্ণ থাকতে পারেন ! ভক্তের প্রেমে তিনি সদা বশীভূত ! তাই চিঁড়ের পোটলা তার বগলে দেখে কেড়ে নিয়ে একমুট খেয়ে ফেললেন !"

"যেই শ্রীকৃষ্ণ আর এক মুটো নিয়ে খেতে যাচ্ছেন অমনি রুক্মিণী দেবী হাত ধরে ফেলে বললেন,—'নাথ ! আর খেয়োনা, তুমি প্রসন্ন হয়ে একমুষ্টি চিঁড়ে যখন খেয়েছ তখন লক্ষ্মী সেখানে অতুলনীয়া হয়ে থাকবেন। দ্বিতীয় মুষ্টি খেলে কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমায়ও সেখানেই থাকতে হবে !' ' দেখ্ দিকিনি ভক্তের কি মহিমা ! ভক্ত যে ভগবান থেকে বড় এ-কথা কেউ বোঝেনা। দু'চার হাত বানালেই বুঝি সব ভগবান হয়ে যায় ?" এইরূপ কত সিদ্ধান্তই আমাদের শুনালেন।

তারপর শ্রীপাদের প্রসাদ পাবার সময় হল। তখন বেলা

আড়াইটা হবে! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই প্রসাদ পেতে বসলাম। আজ মহোৎসব—বহু ভক্তবৃন্দ এসে প্রসাদ পেতে বসে গেলেন। পরমানন্দে সবাই প্রসাদ পেতে লাগলেন। কত জন৷ ধ্বনি দিতে লাগলেন, এইরূপ ভাবে সবাই প্রসাদ পেয়ে উঠলেন। শ্রীল দাদা মহাশয় তখনও প্রসাদ পাননি। তাঁকে প্রসাদ পাবার জন্য কত অনুরোধ করা হল। কিন্তু কিছুতেই পেলেন না। মাত্র একটু কণিকা প্রসাদ পেয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের হাতে তাঁহা দিয়ে বললেন,—"তোমরা সবাই পাও, আমি ঘুরে ঘুরে দেখি। আজ আমার কত ভাগ্যি, আমার পেটেই তোরা সব হয়েছিস, তোদের মুখেই খাব প্রসাদ!"— এই সব বলে বেড়াচ্ছেন আর সবার প্রসাদ পাওয়া দেখছেন আর চোখের জলে ভাসছেন। এইরূপ ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলকে প্রসাদ পাইয়ে, তারপর শ্রীদাদা মহাশয়ের প্রসাদ পাবার জন্য শশীদা' পারশ এনে দিলেন। তিনি প্রসাদ পেয়ে একটু বিশ্রাম করতে গেলেন। সেদিন আর কাউকে যেতে দিলেন না। রাত্রিটি ওখানে থেকেই পরদিন সকালে কলিকাতা অভিমুখে শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদল বলে রওনা হলেন।

শিয়ালদহ স্টেশনে এসে গাড়ী থামল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই লোটা কম্বল নিয়ে ট্রামে উঠে হাওড়ায় এসে আবার ট্রামে করে পাঁচুদার বাড়ী এসে পৌঁছিলাম। আজ বিকেলে শ্রীপাদ ভক্তদের বাড়ী যাবেন, তাই তাড়াতাড়ি স্নান আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। ৪টা বাজল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে মালার ঝোলা হাতে নিলেন। কোমরে একটী বহির্ব্বাস কৌপীন বাঁধলেন, লোম কাপড়খানা হাতে নিয়ে, উপর থেকে নেমে বারান্দায় এলেন। পাঁচুদা'র ঘোড়ার গাড়ী গেটেই আছে। সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে ছুটে এলেন। সবাইকে বললেন,—"আজ আর আসবনা,

চোরবাগানে এক ভক্তের বাড়ীতে থাকব ; কাল নয়টা দশটায় আসব, তোমরা প্রস্তুত থেকো। সন্ধ্যায় হুগলী যেতে হবে, সেখানে অষ্টপ্রহর হবে,—এই বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় গাড়ীতে উঠলেন, মেঘলাল দাদা সঙ্গে গেলেন। আর কেউ যাবেনা, আমি ছলছল নেত্রে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকান মাত্রই তিনি ডাকলেন,—ময়না ! এস। আমি আনন্দে আটখানা হয়ে তাঁর পাশে গিয়ে বসলুম আর গাড়ী চলতে লাগল, পাঁচটার সময় তুলসীদের বাড়ীতে গাড়ী এসে থামল। চোর বাগানে তাঁদের বাড়ী, শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন দেখে তুলসী, তাঁর দিদি ও বাবা সবাই ছুটে এলেন,—যেন কত আপন জন এলেন।

ওখানে বাৎসল্যবতী বৃদ্ধা চুনোগলির মা'কেও দেখলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে ক'রে সিঁড়ি ধরে বাড়ীর সবাই উপরে উঠলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় গিয়ে একটি চেয়ারে বসলেন। সবাই এসে তাঁর শ্রীচরণ ধৌত ক'রে সেই জল একটা গামলায় ক'রে রেখে দিলেন এবং একটু একটু খেলেন ও মাথায় দিলেন। তুলসীর দিদি ঐ চরণামৃত বোতলে পূরে রাখলেন। হঠাৎ পাশের বাড়ীর একটা জানলার দিকে আমার নজর পড়ল, তাকিয়ে দেখি—খুব বড় ঘরের একটি বৌ অপলক দৃষ্টিতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখছেন আর চোখের জলে তাঁর মুখমণ্ডল ভেসে যাচ্ছে। তাঁর আর্ত্তি ও চোখের জল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম ! শুনলাম, লাহা বাড়ীর বৌ, খুব বড়লোক তাঁরা। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁকে মন্ত্র দিয়েছেন কিন্তু তাঁর শ্রীগুরু সেবার সৌভাগ্য মোটেই মেলেনা, তিনি দর্শনও খুব কম পান। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কচিৎ তাঁদের বাড়ীতে যান। বহু লোকজন তাঁদের বাড়ীতে ;—কাজেই শ্রীপাদের সেবার অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা কখনও হয়ে ওঠেনা। কখনও কখনও শ্রীপাদ পারিষদ বৃন্দ নিয়ে তাঁদের বাড়ী কীর্ত্তন করতে যান, তাঁরা সব দণ্ডবৎ প্রণতি করেন,

তারপর একটু বাল্য ভোগের প্রসাদ পেয়েই চলে আসেন; সেখানে থাকতে তাঁর মন মোটেই চায়না। ঐ মায়ের চোখের জল ও আর্ত্তি দেখেই বুঝেছিলাম,—ওঁর কি গুরুভক্তি, কি গুরু নিষ্ঠা! শ্রীগুরুদেবকে দর্শন ক'রে কেবল চোখের জল ফেলা খুব কমই দেখি! আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম,—"ইনি কে? আপনাকে দেখে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কেবল চোখের জল ফেলছেন।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"খুব ভক্তিমতী মা উনি; মন্ত্র নিয়েছেন, খুব বড় সংসার, বড়লোকের বউ কিনা তাই আমাদের কাছে সব সময় আসতে পারেন না, একটু সেবাও করতে পাবেন না বলে অত কাঁদছে! এই দেখনা, এঁদের বাড়ী এসেছি সবই অনুকূল, তাই আজ থাকব কাল যাবো—পাঁচুবাবুর বাড়ীতে। দেখবি কি প্রীতি, ছাড়তেই চাইবে না সব।" এইরূপ সব কথাবার্ত্তা হোচ্ছে। রাত্রি সাতটা হবে তখন অমনি মাখনদা', নন্দদা', যুগলদা', চারুদা', বলাইদা' সব এসে জুটলেন। এঁদের পেয়ে খুব আনন্দ সবার। আজ আর কীর্ত্তন হোলনা। গল্প গুজব ক'রে কাটল, পূজারী রসুই ক'রে, ভোগ দিয়ে বসে আছেন।

চোর বাগানের মা,—তুলসীরদিদি—আমাদের সবাইকে প্রসাদ পেতে ডাকলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই প্রসাদ পেয়ে উঠলাম। রাত্রি প্রায় ১২টা। সেদিন চারুদা', মাখনদা'রা সব বাড়ী চলে গেলেন, কেবল মেঘলালদা' ও আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে রইলাম। একটু পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় খাটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমরাও নীচে একটা মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে শৌচাদি সেরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় মালা জপ করতে লাগলেন, এমন সময় পাঁচুদা' ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হলেন। তাঁরা সব অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন এই বেলাটা থাকার জন্য, কিন্তু শ্রীল বাবাজী

মহাশয় থাকলেন না, একটু মরিচ জল প্রসাদ পেয়ে সবাই গাড়ীতে করে হাওড়ার পুলে এসে পৌঁছলাম। পাঁচুদা'র গাড়ী গঙ্গার ধারে রাখা হল, আমরা সবাই গঙ্গার তীরে গেলাম, এবং স্নান ক'রে প্রায় ১০টার সময় শালকিয়ায় পাঁচুদা'র বাড়ীতে এসে পেঁাছলাম।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক করতে বসলেন। আমরা সবাই বৈঠকখানা ঘরে বসে তিলক কচ্ছি, এমন সময় একটি প্রায় ১৬ বৎসর বয়সের ছেলে,—বেশ বলিষ্ঠ ও মাসকুলার বডি—এখানে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় কোথায় আছেন? আমি বললাম,—"উপরে আছেন।" ছেলেটি ঘর ছেড়ে চলে এসেছে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণাশ্রয়ে থাকবে বলে। আমি নাম জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল,—"আমার নাম কিশোরী।" আমি বললাম,—"এত ছোট বেলায় সাধু হোতে এসেছ কেন?" আমারও তখন বয়স সাতার আঠার হবে। আমাকেও ঐ ছেলেটা বলল,—"আপনি ছোটবেলায় সাধু কেন হয়েছেন?" আমি হেসে তাঁকে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে খুব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন। সেইদিন থেকেই কিশোরী শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকল,—তাঁহার কাছে দীক্ষা নিল এবং শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেবায় নিজের জীবন ধন্য করতে লাগল!

আমি তখনও দীক্ষা নেইনি,—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও কখনও আমায় বলেন না যে মন্ত্র নেও, কিন্তু তবুও কত প্রীতি ভালবাসা তাঁর। তাঁকে ছেড়ে একটা দিনও কাটেনা। সেই দিন সন্ধ্যায় হুগলী এসে পেঁাছলাম, শ্রীল বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্ত্তন করলেন। আড্ডি বাড়ীতে আজ আনন্দের পাথার বয়ে যাচ্ছে! চারুদা', বলাইদা', মাখনদা', যুগলদা', তিনুদা', ব্রজেনদা' এই রকম কত ভক্ত যে এসে জুটলেন! খুব আনন্দে নাম-কীর্ত্তন হলো তারপর প্রসাদ পেয়ে সবাই বিশ্রাম করলেন। সবাই ভোরে উঠে

নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। নাম-ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হতে লাগল! সে-যে-কি আনন্দের ঢেউ উঠল তা বলে শেষ করা যাবেনা! আজ সন্ধ্যাকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করবেন, তাই বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে, আসরে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয় অপূর্ব্ব নাম-মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন, রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হল তারপর সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। সকালে আজ নগর কীর্ত্তন হবে; অসংখ্য লোক এসে জমেছে!

শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবাহন কীর্ত্তন ক'রে তারপর নগর কীর্ত্তনে বের হলেন—গৌর হরি হরি বোল, প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌর হরি হরি বোল—এইরূপ নাম-কীর্ত্তন করতে করতে দুই তিনটা বাড়ীর অঙ্গনে গিয়ে নাম করলেন তারপর গঙ্গার তীরে যে প্রশস্ত রাস্তা, সেই পথে কীর্ত্তন নিয়ে চলেছেন! মা সুরধুনী দর্শনে উদ্দীপনা এসেছে,—অমনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং অপূর্ব্ব আঁখর দিলেন,—"যায় নিতাই হেলে দুলে, সুরধুনীর কূলে কূলে, যায় নিতাই হেলে দুলে, হেম দণ্ড বাহু উর্দ্ধে তুলে, যায় নিতাই হেলে দুলে, গৌর হরি বোল বলে. যায় নিতাই হেলে দুলে"—খানিকক্ষণ খুব মাতন কীর্ত্তন হল। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় দুই হাত উর্দ্ধে তুলে নাচতে নাচতে চলেছেন,—সঙ্গে প্রায় পাঁচশত লোক, সবাই নাচতে নাচতে, সুরধুনীকূলে রাস্তা দিয়ে চলেছেন। আজ হরেকেষ্টদা' ও মদনদা' অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে চলেছেন!

প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত এইরূপ নৃত্য করতে করতে সবাই চলেছেন। রাস্তায় যে সব লোক আসছেন বা যাঁর সঙ্গে দেখা হোচ্ছে তাঁরাই এসে যোগ দিচ্ছেন, আর সবাই নাচতে নাচতে চলেছেন। গাড়ী মোটর সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল! অনেকে মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে, হাতে তালি দিতে লাগল। রাস্তার ধারে ধারে

বড় বড় সব দুতালা তিনতালা বাড়ী। মেয়েরা সব ছুটে এসে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে কীর্ত্তনের উপর। আনন্দে সবাই উলু উলু ধ্বনি দিচ্ছেন, অনেক মেয়ে, সব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, তাঁরাও দরজায় দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিতে লাগলেন। সেদিন কীর্ত্তনের যে কি উন্মাদনা তা যে না দেখেছে তাকে বলে বা লিখে বুঝাতে পারবনা। কতলোক ভাবে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে! বিশ্বরূপদা' শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে, তিনুদা'ও পাশে, আর বলিষ্ঠ বপুবিশিষ্ট বলাইদা'ও অপূর্ব্ব নৃত্য ভঙ্গিতে চলেছেন। এক মাইল পর্য্যন্ত সবাই নেচে নেচে চলেছেন তারপর খুব কীর্ত্তন হল—একটি শ্রীমন্দিরে গিয়ে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির! অপূর্ব্ব সুঠাম গৌর মুরতি! অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করে আবার রাস্তায় বের হলেন। এইরূপ ভাবে বহুস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাম করে প্রায় ১টার সময় নগর কীর্ত্তন করে ফিরে এলেন।

—শ্রীগৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে—এই সব কীর্ত্তনাদি ক'রে কীর্ত্তন শেষ করলেন! শেষে দধি মঙ্গলের হরিদ্রার জল সবারই গায়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমের পল্লব দিয়ে ছিটিয়ে দিলেন, তারপর কীর্ত্তনের স্থানে সেই দধি মঙ্গল হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেললেন। সেখানে সবাই দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে এসে যখন বিশ্রাম করতে বসলেন তখন প্রায় বেলা আড়াইটা, তারপর স্নানাদি সেরে ও আহ্নিক সেরে সবাই প্রসাদ পেতে বসলেন। প্রসাদ পেতে ৪টা বাজল, তারপর বহু দীন কাঙ্গালী কত প্রসাদ পেল, এইরূপ পরমানন্দে মহোৎসব শেষ ক'রে সবাই বিশ্রাম করতে লাগলেন।

সে রাত্রি আমরা আড়িড বাড়ীতেই সবাই রইলাম। তার পরদিন আবার পাঁচুদা'র বাড়ীতে এসে পেঁাছলাম। এইরূপ পরমানন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের দিনগুলো কাটছে।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"শ্রীপানীহাটীতে উৎসব আসছে দু'চার দিন পরেই সেখানে দণ্ড মহোৎসব হবে। যে বৃক্ষতলে

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বসেছিলেন, সে বৃক্ষ এখনও আছে,—কাছে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী ; আমার সঙ্গে গিয়ে সব দেখতে পাবে ! শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিতাই চাঁদকে যতী ধর্ম্ম ছেড়ে গৃহী হয়ে এখন গৌড়দেশে গিয়ে আচণ্ডালে নাম-প্রেম বিলাতে বললেন।”

“শ্রীনীলাচলে গম্ভীরায় একদিন দুই প্রভু যুক্তি করেন ; তারপর নিতাই চাঁদকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। ঐযে সেদিন কীর্ত্তন করলাম মনে নাই ?” আমি বললাম,—“আমি শ্রীগৌর কিশোরের ও শ্রীনিতাই চাঁদের লীলা কি বুঝি !”—তরে শোনো বলছি—“কি দয়া তাঁদের ! ‘বিরলে নিতাই লইয়া হাতে ধরি বসাইয়া, মধুর কথা কন ধীরে ধীরে। জীবেরে সদয় হইয়া, হরিনাম লওয়াও গিয়া, যাও নিতাই সুরধুনী তীরে।’ কত আঁখর দিয়েছি মনে নাই বুঝি ? আমার কীর্ত্তনের সময় সবই মনে আসে। সে-সময় আমাকে নিতাই যা মনে করিয়ে বলান তাই তখন বলি। বুঝতে পেরেছিস ?” আমি বললাম,—হাঁ। —তবে মনে পড়ছে, বলি শোন ! “গৌরের মুখ বুক ভেসে যায়। বলিতে বলিতে নয়ন ধারায় গোরার মুখ বুক ভেসে যায়। বলছেন নিতাই আমার কথা রাখ, হাতে ধরি কেঁদে বলছেন প্রভু, নিতাই আমার কথা রাখ। কোন নিষেধ বিধি দিওনা, তা হোলে কেউ নাম লবেনা। প্রভু কহে—নিত্যানন্দ, জগজীব হইল অন্ধ, কেহ তো না পাইল হরিনাম। এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে, কৃপা করি লওয়াইও নাম। যত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডি আর, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়, সবে যেন হরিনাম লয়। কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ, তারা জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ। তারা তর্কনিষ্ঠ অভিমানী, তাদের বঞ্চিত কোরোনা নিতাই, অভিমানী বলে যেন, তাদের বঞ্চিত কোরোনা নিতাই। কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাইহ সবাকার দুখ। সঙ্কীর্ত্তন প্রেম রসে, ভাসাইয়া সব দেশে, পূর্ণ কর সবাকার আশ।’ হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,

কি করিবে বলরাম দাস।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় এইসব কথা বলতে বলতেই চোখের জলে ভেসে বললেন,—"যে বৃক্ষতলে বসে নাম প্রচার করেছিলেন, সেইখানে যাবো। এইতো সেই তিথি এসে পড়েছে! দেখবে এখন। আমি বললাম,—পাঁচশো বৎসর হয়ে গেছে এখনও সে গাছ আছে! তিনি বললেন,—হাঁ, আছে। তার গোড়ায় বেদী করে বাঁধান হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে উৎসবে আসে। ঐখান থেকেই মালসা ভোগ আরম্ভ হয়:—শুনবে সে-কথা।" অমনি তিনি বলতে লাগলেন, "শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম শুনেছ? আমি বললাম,—"হাঁ, ছয় গোস্বামীর একজন তো।" তিনি বললেন,—"তা হলে পড়েছ তাঁর জীবনী?" আমি বললাম,—"একটু একটু জানি।" শ্রীপাদ বলতে লাগলেন,—"তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন। তখনকার সময় তাঁদের ষ্টেটের ইনকাম ছিল ১২ লক্ষ টাকা, সপ্তগ্রামে তাঁদের বাড়ী ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করতেন। মনে মনে তাঁদের চরণে আত্মসমর্পণও করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন ঐ পানীহাটীতে নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য আসেন তখন তিনি তাঁকে দেখতে যান বাড়ী থেকে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে যেই তিনি এসেছেন অমনি প্রভু ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন,—'চোরা! এতদিন পরে ধরা দিলি!'—এই বলে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন!"

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য ভক্ত এসেছেন, চারিদিকে কীর্ত্তনের স্রোত চলছে। নিত্যানন্দ প্রভু বললেন,—'চোরা! আজ তোকে দণ্ড করব। আমার এখানে যত লোক এসেছে এদের সবাইকে চিঁড়া, দধি ও কলা মেখে মালসায় ভোগ দিয়ে প্রসাদ দিতে হবে।' প্রভুর আদেশ মাত্রই রঘুনাথ তাঁর প্রজাদের বললেন, —'যাও চিঁড়া, দধি, দুগ্ধ, গুড়, চিনি ও কলা সব যে যত পার নিয়ে এস।' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির গামলা, মালসা আরও সবকিছু

নিয়ে এল। ঐসব গামলাতে চিঁড়ে ধুয়ে রাখা হল। তারপর মর্ত্তমান-কলা, দধি, চিনি প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর ক'রে চিঁড়ে মাখিয়ে ঐ বটবৃক্ষতলে মালসায়, মালসায় সব সাজান হোলো; তুলসী দিয়ে সব ভোগ হোলো,—শ্রী শ্রীগৌর কিশোর নীলাচল থেকে এসে গ্রহণ করলেন! অনেকেই দেখতে পেয়েছিলেন এবং অপূর্ব্ব দোনা ফুলের গন্ধও সবাই পেয়েছিলেন! মহানন্দে সেই সব প্রসাদ সবাই পেলেন;—কতজনা মালসায় ক'রে, খুরিতে ক'রে সব গৃহে নিয়ে গেলেন। প্রথমে নিতাই চাঁদের কৃপা পেলেন রঘুনাথ। নিতাইচাঁদের কৃপা হলে তবে গৌর মেলে, এ-কথা বহুবার বলেছি। সেই থেকে এই মালসা ভোগ আরম্ভ হোলো। ঐ দেখ-না, আমরা অষ্ট প্রহর কীর্ত্তন করবার পর মালসা ভোগ দেই।" আমি উল্লাস ক'রে বল্লাম—এই মালসা ভোগের স্বাদ ভারি সুন্দর, এই প্রসাদ আমার খুব ভাল লাগে। —"তোর ভাল লাগে, আমার বুঝি লাগে না?" দেখিস্‌নি আমি আগে মালসা ভোগ একটু পেয়ে তারপর অন্য প্রসাদ পাই!" —হা—তাতো আমি দেখেছি।

এইরূপ পরমানন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে কত সুন্দর সুন্দর কথা শুনছি, এমন সময় হিরু ও বিরু নামে দুইজন উৎকল দেশের ভক্ত এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীপাদ পদ্মে সাষ্টাঙ্গ লুটে পড়ল। তারা চোখের জলে ভাসছে আর বলছে,—আমাদের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে দিন; এবং আপনার রাতুল চরণে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়ে রাখুন। তাদের এই আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা দেখে স্নেহাপ্লুত হৃদয়ে শ্রীপাদ বললেন—"ওঠো, বোসো! কটক থেকে আসছ বুঝি?" তারা বলল,—"হাঁ"। শ্রীপাদ বলছেন তাদের, "কাল গাড়ীতে রওনা দিয়েছ বুঝি? রাত ভোর জেগে এসেছ, যাও স্নান করে নেও। স্নান করে একটু সরবৎ খাও।"—এই কথা বলে, শ্রীল বাবাজী মহাশয় উপরে গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। আমার দিকে তিনি তাকিয়ে বলছেন,—"দেখেছ কি আর্ত্তি ব্যাকুলতা,

এরা কেবল চাইছে—'মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে রাখুন।' এই সত্যিকারের চাওয়ার মানুষ, আমার কাছে যারা আসে, অধিকাংশ লোকই চায় চাকরী করে দিন, অসুখ ভাল করে দিন, ব্যবসা যেন ভাল হয়,—এই সব কামনা করেই বেশী লোক আসে। সংসারে সুখ বা দুঃখ ওতো একটার পর একটা থাকেই। কখনও লাভ কখনও লোকসান। তারপর দুঃখ কেউ চায়না, তবুও দুঃখ আসেই, অনাহুত ভাবে সবারই আসবেই তেমনি সুখও কখন কখনও অনাহুত ভাবেই আসবেই। চাঁদিমা রাতের পর আঁধার থাকবেই—ইহা চিরন্তন সত্য। সংসারেও নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কারও হয়না। তারপর চাওয়ার ভিতর সুখ কোথায়! শোক তাপ আছেই, পুত্র বড় হোলো, এমন বধূ-বশ হোলো যে মা বাপকে ছেড়ে সরে পড়ল, আর কোন খোঁজও তাঁদের করতে চায়না। ছেলের উপর এত মমতা ক'রে এইতো পরিণাম হোল! শেষকালে প্রায়ই এই রকম হয়,—আদরের মেয়ে বড় হোলো, বহু টাকা খরচ করে বিয়ে দিল, কিছু দিন পরে বিধবা হয়ে ঘরে এল, সারা জীবন তার সেবা করতে হোলো! আজ মানের জন্য কেউ ফুলে উঠেছে, তাকে কতজনা ভক্তি কোচ্ছে, স্তুতি কোচ্ছে আবার কয়দিন পরেই কত নিন্দা হতে লাগবে! এই জন্য নিন্দা ও স্তুতির পারে যেতে হয়। ঐ যে কথা আছে,—তুল্য নিন্দা স্তুতিমৌনী এ-সব সংসারে থাকবেই। ভাগ্যবান সেই যে শ্রীগুরুপদাশ্রয়ে থেকে নাম ক'রে। কত কত জন্মের সুকৃতির ফলে জীবের এই অবস্থা আসে। নইলে সবাই বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ ভজন ও শ্রীগুরু সেবা না করলে, মায়ার জাল কেউ এড়াতে পারেনা,—মহৎ কৃপা বলবান। মহৎ কৃপা না হলে কিছুই হয়না।"

এইরূপ কত গূঢ় সিদ্ধান্ত শুনালেন, তারপর গাড়ীতে বসে স্নান করতে গেলেন। স্নান ক'রে এসে আহ্নিক সেরে আজ মন্ত্র দেবেন। পাঁচুদাকে বললেন,—"হিরু বিরু ওদের নিয়ে

এস, মন্ত্র দেবো”। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আরো কয়জনকে দীক্ষা দিলেন তারপর তিনি হিরু ও বিরুকে মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে, তাঁর শ্রীচরণাশ্রয় দিয়ে কাছে রাখলেন ও তাঁর শ্রীঅঙ্গ সেবায় নিয়োগ করলেন,—যেন কত জন্মের সম্বন্ধ তাদের। এক মুহূর্ত্তেই তারা আপন হয়ে গেল, শ্রীগুরুদেবের নিত্য কিঙ্কর যারা তাদের এমনই হয়। হায়!, অভিমানী আমি, কৃপা করে স্নেহবশে কাছে রেখেছেন কিন্তু কখনও দীক্ষা দেন না ; আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমি শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে মন্ত্র নোবোনা, তিনি অযাচিত ভাবে আমায় ডেকে মন্ত্র দেবেন।

তারপর দুই একদিন পরেই আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পানীহাটীতে দণ্ড মহোৎসব সদলে দেখতে গেলাম। ঐ বট বৃক্ষতলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও গড়াগড়ি দিয়ে কীর্ত্তনে বসলেন। চারিদিকে যেন লোকের সমুদ্র। যে আসছে সেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে,—ঐ যে বাবাজী মহাশয় মাঝখানে কীর্ত্তনে বসেছেন। একটু পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। সে কীর্ত্তনের মহিমা আমি লেখনীতে কি ক'রে বর্ণনা করি! চারিদিকে—হরি হরি বোল,—যেন কান্নার হাট লেগে গেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আকুল প্রাণে ক্রন্দন করছেন,—খানিকক্ষণ কীর্ত্তন করলেন তারপরই যত আক্ষেপ অনুরাগের কথা,—কত যে কথা কীর্ত্তনে গাইছেন আর আকুল প্রাণে কাঁদছেন। সে কাঁদা-বদন দেখলে পাষাণও গলে যায়! কীর্ত্তনের কথা সব মনে নাই কিন্তু একটা কথা এখনও আমার প্রাণে গেঁথে আছে,—“এইতো সেই বটবৃক্ষ, কোথায় আমার নিতাই গুণমণি। তুমি নিশ্চয় এসেছ হেথায়। দাস কই সে প্রভু কই, সে মধুর লীলা কই? ওগো ধনি! সুরধুনী কোথা মোদের গোরাগুণমণি, বলে দে বলে দে।” এই রূপ কত পাষাণ-গলান কীর্ত্তন করতে পাঁচটা বেজে গেল! কীর্ত্তন সমাপ্ত হোলো তারপর একটা বাড়ীতে গিয়ে মালসা ভোগের প্রসাদ পেলেন। সেখানে শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট

মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হোলো। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গুরু ভাই, কত প্রীতির কথা বার্ত্তা হোলো।

এইরূপ ভাবে কিছুদিন আগে একবার বরাহনগর পাঠবাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-উৎসবে তাঁর সঙ্গে গেছলাম। তখন চারিদিকে জঙ্গল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যেখানে এসে বসেছিলেন সেই স্থানটি নির্দ্দেশিত আছে। সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে। ভাঙ্গা ঘরে শ্রীমহাপ্রভু থাকেন। সব জীর্ণ দশা প্রাপ্ত! চারিদিকে ডোবা। সাপে ব্যাঙ ধরেছে, তার ডাক শুনছি। শ্রীপাদ খানিকক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে কাছে এক জমিদারের বাড়ীতে রইলেন। এখন আর সে পাঠবাড়ী নাই। যেদিন থেকে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই পাঠ-বাড়ীর সেবা গ্রহণ করেছেন সেইদিন থেকে মন্দির, নাট মন্দির, গ্রন্থমন্দির, বৈষ্ণব খণ্ড হয়েছেন; এখন অতি সুন্দর স্থান! হাজার লোক রোজ দর্শন করতে আসেন। তখন সন্ধ্যার সময় পাঠবাড়ী যেতে ভয় লাগত। অন্ধকার জঙ্গল, জন-মানব-শূন্য সব রাস্তা ঘাট ছিল!

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে এইরূপ পরমানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন বললেন,—"বসন্তপুরে একটা নাম-যজ্ঞ আছে। খুব গরীব লোক তারা কিন্তু অপূর্ব্ব প্রীতি তাদের; নিজেরা ভিক্ষে ক'রে হরি সভার উৎসব ক'রে; সেখানে পরশু যেতে হবে। তুমি যাবে নাকি?"—"আপনি নিয়ে গেলে নিশ্চয় যাবো।" দু'দিন কাটল, আমার শরীর একটু অসুস্থ হোলো, একটু জ্বর হয়েছে। তাই আমাকে রেখেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় বসন্তপুর রওনা হয়ে গেলেন সদল বলে। আজ সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্ত্তন, তাই যেতেই হবে তাঁর। খুব বৃষ্টি হোচ্ছে, শ্রীল বাবাজী মহাশয় তবুও গেলেন। সেদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে ছেড়ে থাকা আমার দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়ল। বার বার হাত দেখাচ্ছি,—জ্বর আছে কি না জানবার জন্য; রাত্রি ১২টার সময় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। জানকীও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে

যায় নাই। তাকে বললাম,—ভাই কাল আমায় নিয়ে যাবি সেখানে। অমনি জানকী বললো,—"বেশতো,—তুমি আর আমি সকালে রওনা হব। তোমার জ্বর হয়েছিল, হাঁট্‌তে পারবেতো!" আমি বললাম,—"এইতো জ্বর ছেড়ে গেছে। আর ভাবনা কি!" দুদিন পরেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় ফিরে আসবেন কিন্তু তখন তাঁকে এই অল্প সময়ও ছেড়ে থাকতে পারতুম না। তাঁর সেই স্নেহ প্রীতি আমায় সব ভুলিয়ে দিয়েছে! তখন এই বিশ্বে আমার কোথাও আর আকর্ষণ ছিল না; যা-ও ছিল—সে সব মায়ার ডুরি তিনিই ছিঁড়ে আমায় ঘরের বাহির ক'রে নিয়ে এসেছেন!

মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারও হতে পারে; বড় ব্যবসা করে কোটীপতিও হোতে পারে; বহু অর্থ উপায় ক'রে বড় বড় দালানও ক'রতে পারে; স্ত্রী, পুত্র কন্যার জন্য লাখ লাখ টাকাও জমাতে পারে; বড় বড় পার্ক তৈয়ারী করে নিজের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করে, একটা কাগাসনও স্থাপন করতে পারে; বিশ খানা প্যালেসিয়াল বিল্ডিংও তৈয়ারী করতে পারে; কিন্তু মানুষ সংসার-মায়া-মুক্ত, অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অনুরাগী শত চেষ্টায়ও হতে পারে না। ইহা একমাত্র মহতের কৃপায় সম্ভব। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে ও তাঁর অকুণ্ঠ সেবায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করার সৌভাগ্য সুলভ-লভ্য হয়। নইলে এ-সৌভাগ্য চিরকাল দুর্লভের মধ্যেই থেকে যায়। একমাত্র শ্রীগুরু পাদপদ্মের অপার করুণায় ভক্তি পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীগুরু মুখে শুনেছি, মায়ার বাঁধন, আসক্তির বন্ধন, কেউ ছিঁড়তে পারে না,—মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গ এমন কি দেবতারাও এই নশ্বর আসক্তি ত্যাগ ক'রতে পারেন না। এ-কেমন বলিতেছি,—"দেখেছ, গো-হাটায়, একটা বড় মোটা দড়ির দুই প্রান্ত পরস্পর দূরস্থ দুইটী মোটা বৃক্ষের গুঁড়ির সহিত সামান্য উঁচু করে বাঁধা থাকে—বেশ লম্বা দড়িটা। সেই মোটা লম্বা দড়িতে, ছোট ছোট দড়ি দিয়ে গোরু বেঁধে রাখে,

প্রায় ৫০টি গোরু এমনি বাঁধা থাকে ;—ঠিক মায়ারজ্জুতে আমরা এমনি ভাবেই বাঁধা থাকি ! যদি কোন ক্রেতা এসে ঐ গোরু সব দেখে দেখে কোন একটী পছন্দ করেন, তবে তিনি গোরুটীর কত দাম জিজ্ঞাসা করেন। গোরুর মালিক দাম দুইশত টাকা চায়। ক্রেতা টাকা দিয়ে কিনে ঐ বড় দড়ি থেকে বন্ধন মুক্ত ক'রে ঐ গোরুকে নিয়ে যায়। তেমনি সমস্ত জীব এই মায়ারূপ রজ্জুতে বাঁধা আছে, মহৎ জনই শ্রীগুরুদেব, তিনিই কৃপা-মূল্য দিয়া সংসারের সব কিছু মিটাইয়া জীবকে মুক্তি দেন। এই ভুবনমোহিনী মায়া-বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় বা শ্রীগুরু-কৃপায় এই বন্ধন মুক্ত হতে পারে, নইলে কোন সাধনের দ্বারাও এ দুরত্যয়া মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড় সুকঠিন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগত না হলে এই সংসার রূপ মৃগতৃষা কেউ এড়িয়ে যেতে পারেন না। "এই সব কত অমূল্য কথা তখন তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি।

যাক, আমি ও জানকী সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বের হোলাম, বেশ টিপ টিপ বৃষ্টি হোচ্ছে, কারও ছাতা নেই,—ভিজছি ; তবুও কিন্তু অন্তরে বড়ই আনন্দ ; কারণ এই যে—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে যাবো এবং তাঁকে দেখতে পাবো। হাওড়া থেকে গাড়ীতে এসে ষ্টেসনে পেঁছিলাম—খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তিন মাইল রাস্তা বসন্তপুর। মাঠের ভিতর দিয়ে পথ। মাঠ একেবারে জলে ভেসে গেছে। কোথাও গলা-জল আবার কোথাও সাঁতার দিতে হবে। ১২টার সময়ে ষ্টেসনে এসে জানকী আর আমি যুক্তি কচ্ছি—এখন এই দুর্গম রাস্তা কি করে পার হব ! জানকী বলল,—"চল জীবনদা' আমরা ফিরে যাই।" আমি বললাম, —"না, ফেরা হবে না, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে যাবোই। চল্ না, তুই আর আমি জলে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে যাবো ! আমি সাঁতার কাটতে খুব ভাল জানি, তুই জানিস তো ?" জানকী বলল,—"জানি বৈকী।"—"তবে আর কি, চল্ না !" এই বলে দুজনাই কোমরে

চাদরখানা বেশ ক'রে জড়িয়ে বাঁধলাম, সঙ্গে আমাদের আর কিছুই নাই, দুইজনা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সাঁতায় কেটে খানিক দূর গিয়ে আবার মাজাজল হোলো, বেশ হেঁটে চলতে লাগলুম, আবার খানিক দূর গিয়ে সাঁতার জল,—এমনি ভাবে ১২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ঐ মাঠের জলের ভিতর দিয়ে কখনও সাঁতার আবার কখনও মাজাজল, গলাজল এমনি করে জল ঠেলে ঠেলে এসে সেথায় পেঁাছলাম। শরীর ক্লান্ত পা আর চলছে না তবুও যেতে হবে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে! ধীরে ধীরে আমরা তাঁর কাছে এসে পেঁাছলাম;—শ্রীপাদ মালা হাতে ক'রে জপ করতে করতে বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আমরা তাঁকে দেখামাত্র আনন্দে শ্রীচরণে লুটে পড়লাম। গায়ে মাথায় জল, কাপড় চোপোড় সব জলে চপ চপ কোচ্ছে। তুলসী ও তার দিদি ছুটে এলেন, এবং বললেন,—"তোমরা যে আজ আসবে সে-কথা তিনি একটু আগেই বলছিলেন,—মাঠ-ভরা জল কি ক'রে ওরা পার হবে!"—এই সব তিনি কতই ভাবছিলেন। আমাদের দেখে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন! ভিজা কাপড় দেখে, মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে, স্নেহে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তুলসীর দিদি বললো,—"দুগ্লাস সরবৎ আহ্নিক করার সময় কি জানি কেন রেখে দিয়েছেন। আমরা ঐ অধরামৃত সরবৎ চাইলেও দিলেন না। তিনি বললেন,—'সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকবে তার পর ওরা এলে দেবো।' ওরা কে তা বলেন নি, এখন বুঝছি এই ব্যাপার।"

আমরা তাড়াতাড়ি সরবৎ খেলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর পুরানো চাদরখানা আমায় পরতে বললেন, ভিজে কাপড় ছেড়ে চাদর খানা পরলাম। জানকীকে তাড়াতাড়ি মেঘলাল দা' একখানা কাপড় দিলেন। জানকী কাপড়খানা পরল। ভিজা কাপড়গুলো তারা মেলে দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটা চেয়ারে বসলেন, আমরা তাঁর পায়ের কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম।

শ্রীপাদ বললেন,—“কিছুই খাওয়া হয়নি বুঝি?” আমি বললাম, না। —“জ্বর হয়েছিল বলেইতো তোমায় নিয়ে আসিনি!” আমি বললাম,—“ঐ দিন রাত্রেই জ্বর ছেড়ে যায়, সকালে আমরা আর থাকতে পারিনি, দুজনা বেরিয়ে পড়লাম।” তিনি বললেন,—“আজ দিনভোর বৃষ্টিতে ভিজেছ, আবার মাঠে সাঁতার জল, তোমরা কি ক'রে এলে? আমি পালকীতে এসেছি তখনও মাঠে এক এক জায়গায় হাঁটুজল। সারা রাত্রে বৃষ্টিতে সব ভরে গেছে, দুটো দিন পরেইতো দেখা হোতো, আর থাকতে পারলে না বুঝি?” আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম। শ্রীপাদ বললেন,—“আমিও বন্ধুসুন্দরকে ছেড়ে থাকতে পারতুম না। ঐ যে তোমাদের কাকা অদ্বৈত, সেও আমায় ছেড়ে কখনও থাকতে পারতো না। কোথায়ও যেতে গেলে আমার কাপড় টেনে ধরতো, যেতে দিত না, সঙ্গে নিয়ে যেতাম, তবে ছাড়তো। নব অনুরাগ কিনা তাই!”

তারপর তুলসীর দিদিকে বললেন,—“ছোঁড়া দুটোর অসুখ না ক'রে ফেলে। গরম গরম দুটো প্রসাদ পেতে দাও, আর গরম জল খেতে দিও।” দিদি বললো,—“হাঁড়িতে গরম প্রসাদ রয়েছে; এস, তোমরা প্রসাদ পাবে।” এই বলে আমাদের ঘরে নিয়ে প্রসাদ পেতে দিলেন। তিনুদা' বিশ্বরূপদা' বলতে লাগলেন,—“এমনি করে জল সাঁতরিয়ে আসতে হয়?” আমরা চুপ করে রইলাম। প্রসাদ পেতেই ক্লান্তি এলো, আমরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ৮টার সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গল, সব ক্লান্তি চলে গেছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন,—“দুটো প্রসাদ পেয়ে নেও; কাল নগর কীর্ত্তন ও মহোৎসব হবে; প্রসাদ পেতে দেরী হবে।” তখন অগত্যা তাঁর সঙ্গে ঘুমের ঘোরে প্রসাদ পেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

তারপর দিন নগর কীর্ত্তন ক'রে, সবাই মরিচজল পেয়ে স্নান আহ্নিক সেরে হরি-সভার ওখানে সবাই বসে মহোৎসবের প্রসাদ

পেলেন। কেবল শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় ও তিনুদা' অন্দরে গিয়ে প্রসাদ পেলেন, আমরা সবাই হরি সভার ওখানে বসে প্রসাদ পেতে লাগলুম। সবাই ধ্বনি দিতে লাগল। চারুদা'ও সেদিন আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেছেন, সেদিন চারুদা' একটা মধুর ধ্বনি দিলেন, সেই ধ্বনিটা আমার এখনও মনে আছে, ধ্বনিটী এই,—"কি লাগি আইলি ভবে। এমন জনমে, হরি না ভজিলি, কেমন মানুষ তবে। মানুষ আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম। নহিলে বদনে, কেন না বলহ, শ্রীগোবিন্দ নাম। পাখীরে যে নাম লওয়াইলে লয়, শারী শুক আদি যত। তুমি যে ইহাতে আলস্য করহ, এহয় কেমন মত। দিবস রজনী আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার। তাহার ভিতরে, কখন কেন কি, গোবিন্দ বলিতে নার। ভজিব বলিয়া কহিয়া আইলি ভুলিলি কি সুখ পেয়ে। ডুবিলি আবার সংসার কূপেতে, মজিবি নরকে গিয়ে। বদন ভরিয়া হরি হরি বল, ক্ষতি না হইবে তায় কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায়।" এই সব ধ্বনি দিতে দিতে প্রসাদ পাওয়া শেষ হোলো।

আজই শ্রীল বাবাজী মহাশয় সন্ধ্যায় কলকাতায় যাবেন। তাই একটু বিশ্রাম করেই পাঁচটার সময় সবাই রওনা দিয়ে, অতি কষ্টে জল ভেঙ্গে ঘুরে ঘুরে ষ্টেসনে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পালকীতে রাস্তা ঘুরে এলেন। রাত্রি ৮ টার সময় পাঁচুদা'র বাড়ী এলাম। উৎকলবাসী সেই ভক্ত বিরুর জ্বর হয়েছে তাই সে যায়নি। প্রায়ই জ্বর হয় তার, আমায় খুব ভালবাসে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেবাই তার কামনা কিন্তু তখন মেঘলালদা' উপেনদা'ই তাঁর সেবা করেন;—সে অসুস্থ আর সেবা করতে পারে না। আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয় এস, সি, আড্ডির বাড়ী যাবেন। বহু ভক্তের সমাগম সেথা হবে। আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঠাকুর নিয়ে সদল বলে সেখানে গেলেন। আমি বিরুর কাছে রইলাম। খুব

ভীষণ জ্বর ;—প্রায় ৫ ডিগ্রী জ্বর, বেহুস হয়ে পড়েছে, আমায় হাত ছানি দিয়ে সকালে ৮টার সময় ডাকল। আমি কাছে এলাম, আস্তে আস্তে বলল,—"হায়! হায়! শ্রীগুরু সেবায় বঞ্চিত আমি। আমাকে বাবাজী মহাশয়ের ঐ চিত্রপটখানি দাও।" আমি তাড়াতাড়ি চিত্রপটখানা পেড়ে তাকে দিলাম। আঃ! বলে সে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চিত্রপটখানি দুই হাতে বুকে সাপটিয়ে ধরল, একবার একটি কথা শুনলাম,—"জয় শ্রীগুরু"। আর কোনই সাড়া শব্দ না পেয়ে মুখপানে তাকালুম! আমার মনে হল সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—চিত্রপটখানা বুকে ধরে! তবুও আমার সন্দেহ হোলো, গায়ে হাত দিয়ে দেখি তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পাঁচুদা'কে ডাকলুম,—এই ব্যাপার দেখে আমরা চোখের জল সামলাতে পারি নাই।

পাঁচুদা' গাড়ীতে উঠে খুব হাঁকিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে খবর দিতে গেলেন। এই কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তখনই এস, সি, আড্ডির বাড়ী হতে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে, মালা জপ করতে করতে এসে পড়লেন। গাড়ী হতে নেমে বিরুর কাছে এলেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমূর্ত্তি-পট বুকে সাপটিয়ে ধরা রয়েছে! তখনও সে হাত ছেড়ে দেয়নি। "জয় শ্রীরাধারমণ"—বলেই তার দিকে তাকাতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চোখের জল গড়িয়ে পড়ল, আর অমনি মৃত বিরুর হাতও খুলে গেল! আমি চিত্রপটখানি লয়ে আবার উপরে টাঙিয়ে দিলাম, এই ব্যাপার দেখে সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল,—এমন শ্রীগুরু নিষ্ঠা যে তাঁকে বুকে ধরেই সে দেহ ত্যাগ করেছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় বহুক্ষণ বিষণ্ণ বদনে বসে রইলেন, আড্ডি বাড়ী হতে অনেকেই ছুটে এলেন। তারপর তাকে সবাই স্কন্ধে লয়ে নাম করতে করতে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে প্রায় ৩টায় সময় আমরা ফিরে এলাম। তারপর প্রায় চারটার সময় আমরা প্রসাদ পেলাম। তার অপূর্ব্ব শ্রীগুরু নিষ্ঠা দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তারপর সন্ধ্যায় আরতি কীর্ত্তন হোলো। আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এসে বসলাম! তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শ্রীনবদ্বীপ দাদার শ্রীগুরু নিষ্ঠার কথা বলতে লাগলেন,—"জান, নবদ্বীপ দাদা শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়কে দাদা বলে ডাকতেন, যদিও শ্রীগুরু তিনি। তাঁর যে-কি প্রীতি ছিল, কি-যে তাঁর শ্রীগুরু নিষ্ঠা তা বলে বোঝাতে পারবো না। একদিন ঝাজপেটা মঠে, বড় বাবাজী মহাশয়কে আমরা সবাই তেল মাখাচ্ছি অমনি চমকে উঠে বললেন, 'নবদ্বীপ আমায় টক কুল খাওয়ালো রে!' আমরা বললাম,—'সে কোথায়, সেতো সাক্ষী গোপালে রয়েছে! সেখান থেকে আপনাকে টক কুল কি করে খাওয়াল?' —'আচ্ছা এলে জিজ্ঞাসা করিস!' পরদিন নবদ্বীপ দাদা সকালেই এলেন। আসা মাত্র আমরা ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ও বললেন,—'নবদ্বীপ কাল টক কুল খাইয়ে দিয়েছিল, দাঁতটা টকে গেছে।' এই কথা শুনবামাত্রই শ্রীনবদ্বীপ দাদা কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর কাছ থেকে সরে একটা ঘরে গিয়ে বেশ কাঁদতে লাগলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—'কি হয়েছে দাদা, বলনা কেন? অমনি তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন,—'শৌচে যাবার আগে কুল গাছের তলায় একটা বড় কুল পড়ে আছে দেখলাম। খেতে লোভ হোলো, তাই কুলটি হাতে তুলে,—দাদা খাও বলে, ওঁকে নিবেদন করে—নিজে খেয়েছি,—তাইতে তাঁর দাঁত টকে গেছে। কতদূর থেকে নিবেদন করেছি এই তুচ্ছ জিনিষ, তাও তিনি গ্রহণ করেছেন! কি মূর্খ আমি! এই তুচ্ছ বস্তু তাঁকে খাওয়ালুম, ধিক! আমার জীবনে;' এই কথা বলে নবদ্বীপ দাদা কেঁদে ফেললেন। আবার শুনবি একটী কথা, বলেই শ্রীপাদ বলছেন,—একদিন সকাল বেলায় শ্রীনবদ্বীপ দাদা এসেই দিদির কাছ থেকে বটী নিয়ে আলু বেগুন সজিনার ডাটা বানালেন। তাড়াতাড়ি নিজে উনুন ধরিয়ে রান্না করতে বসলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,

'এ কি ব্যাপার নবদ্বীপ দাদা!' —'যা যা কথা বলিস না! ৮টার ভিতরই আজ আমি রাধাকান্তের ভোগ দেবো। দাদা কটক থেকে আসবেন এখন। এসেই তিনি প্রসাদ খেতে চাইবেন— ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার, এই কথা বলবেন এবং এই সজিনার ডাটা খেতে চাইবেন। আমি বেশ লঙ্কা দিয়ে রাঁধব। শুকনো লঙ্কা আর মসলা বেশ করে ললিতা বেঁটে দেতো।' তিনি সবার বড়, তাই সখীমা তাঁর আদেশে মসলা বেঁটে দিলেন। আলু সেদ্ধ আর বড়ী দিয়ে তিনি সুন্দর রসাল ব্যঞ্জন করলেন, আর সজিনা ডাটা বেগুন আলু দিয়ে খুব লঙ্কা বাঁটা দিয়ে তরকারী করেই ৮টার ভিতরই শ্রীরাধাকান্তকে ভোগ দিয়ে পারশ ঢেকে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন,—'যাও, এখন তোমরা শ্রীরাধাকান্তের নিত্য নৈমিত্তিক ভোগ করতো।' শ্রীরাধাকান্তের ভোগ হয় ১১টার সময়। তাঁর এই কাণ্ড দেখে সখীমা বলছেন,—'কর্ত্তা আবার আসছেন! যখনই আসবেন ৫০।৬০ জন লোক সঙ্গে আসবেন। কটকে আছেন, কোন খবরই নেই, অথচ নবদ্বীপ দাদার খেয়াল দেখছ সব?' এই সব কথা বার্ত্তা হোচ্ছে অমনি—জয় নিত্যানন্দ রাম—বলে, শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় এসে হাজির হলেন। সখীমা ছুটে গিয়ে দণ্ডবৎ করতেই তিনি বলছেন,—'ললিতা! বড্ড খিদে পেয়েছে, কাল রাত্রে প্রসাদ পাইনি। তোদেরতো ঠাকুরের ভোগ হতে ১১টা বাজবে। এখন কি আর প্রসাদ পাওয়া যায়?' অমনি সখীমা বললেন,—'এই আসন পেতে রেখেছি, বসুন না প্রসাদ পেতে।' আবার তিনি বায়না ধরলেন,—'আলু সিদ্ধ, আর বড়ি আলু দিয়ে রসা, আর সজিনা ডাটা বেগুন আলু দিয়ে বেশ ঝাল তরকারী যদি দিস্ তবে প্রসাদ পাবো। অমনি সখীমা বললেন,—'আপনি বসলেই ঠিক এই সব জিনিষ পাবেন।' তাঁর কথায় আসনে বসলেন, প্রসাদের পারশ তাঁর সামনে এল। অমনি শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় বললেন,

'তোদের এত সকালে ৮টার সময় ঠাকুরের ভোগ কি ক'রে হোলোরে? ঠিক যে-যে প্রসাদ আমি পাবো বলে ফটক থেকে মনে করেছি ঠিক ঠিক সেই সেই প্রসাদ কি ক'রে হোলো?' অমনি তিনি বললেন,—'নবদ্বীপ আছে নাকি এখানে? সে ছাড়া তো আমার মনের কথা কেউ টের পাবে না।' সখীমা বললেন,—"হাঁ, তিনি নিজে এ-সব রেঁধে ভোগ দিয়ে রেখেছেন।'—'ও!' —এই কথা বলে তিনি প্রসাদ পেতে লাগলেন।"

"দেখেছ, কি গুরুনিষ্ঠা? শ্রীগুরুদেবের মনে যা উঠল তা তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপদা'র হৃদয়ে খেলে গেল। এ-প্রকার গুরুনিষ্ঠা জগতে দুর্ল্লভ।" শ্রীপাদ আবার বলছেন,—"একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁর বচসা হল। শ্রীনবদ্বীপ দাদা বলছেন,—'শ্রীগুরুদেব সর্ব্বোপরি তত্ত্ব, নিতাই গৌর রাধাগোবিন্দের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।' শ্রীল বড় বাবাজী বললেন,—'তোমার এ-সব মন মুখ বাণী। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই পরতত্ত্ব।' নবদ্বীপ দাদা বললেন,—'না শ্রীগুরু তত্ত্বই পরতত্ত্ব।' এই সব কথা হচ্ছে, অমনি শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় বললেন, 'যা তোর মুখ দেখবো না।' অমনি নবদ্বীপ দাদা বললেন, 'বেশতো, আমিও আর এ-প্রাণ রাখবনা, তোমার কথার অপলাপ আর হবে না।' এই বলে নবদ্বীপ দাদা মাথা নীচু ক'রে পিছন ফিরেই শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হোলেন। ভ্রমর ঘাটে তিনি এসে একটা আসনে বসলেন, এমন সময় গোবিন্দ দাদাকে বললেন,—'একটা আসন বিছিয়ে দাও ওখানে, দাদাকে বসতে বল, শ্রান্ত ক্লান্ত তাঁর দেহ, বাতাস কর সবে।' নবদ্বীপদা' বললেন,—'সেতো বলেছে আমার মুখ দেখবেনা।' আমিও চলে যাচ্ছি, ঐযে আমায় নিতে এসেছেন সবে। ঐযে কি সুন্দর রাসস্থলী নৃত্য হোচ্ছে!' এই বলতে বলতে তিনি দেহ ত্যাগ করলেন। এদিকে পুরীতে সমুদ্রের ধারে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় বালীর উপর পড়ে আকুল ক্রন্দনে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, আর বলছেন,—'নবদ্বীপ আমায় ফাঁকি দিয়ে

চলে গেল ! আমি নিজের দোষেই তাকে হারালাম। তার মধুময় সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হোলাম।' এই সব কথা তিনি বলে বলে বালকের মতন কাঁদতে লাগলেন। দেখদিকিনি কি তাঁর নিষ্ঠা !" এইরূপ কত কত প্রসঙ্গ আমাদের শুনাতে লাগলেন। রাত অনেক হোলো, সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। আমি এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার ভোর হল, সবাই শৌচাদি সেরে নাম করলেন। আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয় রথের ভিক্ষার জন্য বের হবেন। আমায় দেখে বলছেন,—"এবার তোমায় আমি শ্রীধাম পুরী নিয়ে যাবো। তুমি তো শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করনি, কি আনন্দের ধাম দেখবে ! এই কয়দিন আমি রথের ভিক্ষে ক'রে নিই তারপর সবাই রওনা হব। পুরীতে ৬ মাস বৃষ্টি হয় নাই, দুর্ম্মূল্য সব জিনিষ। পঞ্চাশ টাকা চালের মণ হয়েছে ! কি দারুণ ভয়ানক অবস্থা ! ঠাকুর কি করবেন তিনিই জানেন।"

তিনি বললেন,—"তোমরা থাক, আমি ফণীকে নিয়ে ভিক্ষা করতে আজই বের হব।" ফণীকাকা একটু পরে এলেন অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও ফণীকাকা আর মেঘলালদা' ভিক্ষায় গেলেন, শ্রীপাদ বলে গেলেন,—"আমরা দু'চার দিন পরেই আবার এখানে আসছি।"

তিনি এই কথা বলতে বলতে ট্রামে গিয়ে উঠলেন। আজ দু'দিন হোয়ে গেল, আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখতে পাচ্ছিনা বলে, মনটা কে যেন গামছা দিয়ে নিঙড়োচ্ছে ! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ৯টা বাজে এমন সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয় এলেন। আমরা সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তিনি রথের ভিক্ষা ক'রে এলেন, সে রাত্রি থাকলেন আবার সকালে চলে গেলেন। এইরূপ ভাবে মধ্যে মধ্যে আসেন আবার চলে যান। একদিন কলকাতায় কীর্ত্তনে গেছলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা হোলো। পাঁচুদা'র বাড়ীতে কত কত রাঘবের ঝালি এসে জমেছে। পুরীতে সব শ্রীমন্মহাপ্রভুর

সেবার জন্য যাবে। এইরূপ ভাবে তাঁর রথের ভিক্ষা শেষ হোলো; আজ সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন। এস, সি, আড্ডি এলেন, গাড়ীর একটী বড় কামরা রিজার্ভ হয়েছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রথে পাঁচশো লোক যাবে। বহু ভক্ত আসছেন, যাচ্ছেন। ৪টার সময় থেকেই সব জিনিষপত্র ষ্টেসনে চলে গেল। সব মালগাড়ীতে উঠান হোল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও ষ্টেসনে গিয়ে হাজির হয়েছেন। অসংখ্য লোক ষ্টেসনে এসেছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করবার জন্য। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কামরার সামনে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই এসে তাঁকে দণ্ডবৎ করছে, ফুলের মালা গলায় দিচ্ছে।

কত সাহেবরাও সব ঘুরে ঘুরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখছেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয় রথে পুরী যাবেন বলে বহু লোক আগে থেকে এসে টিকিট ক'রে, মহানন্দে গাড়ীতে উঠেছে! আমি তাকিয়ে দেখছি সমস্ত কামরাতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ভক্ত। আমরা রিজার্ভ গাড়ীতে উঠলাম, অমনি এস, সি, আড্ডি একজন পূজারিকে দিয়ে ঝাঁকা ভরে লুচি প্রসাদ নিয়ে ষ্টেসনে এসে পৌঁছিলেন। প্রসাদের ভার এমনভাবে একপাশে রাখা হল যেন ঝালির সঙ্গে স্পর্শ না হয়—ঝালি সব অন্য পাশে রহিল। আটটা যেই বাজল, আমরা শ্রীপাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠলাম, অমনি সকলের হরিবোল ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হতে লাগল আর ট্রেনও ছেড়ে দিল। খড়গপুর এসে অনেকক্ষণ ট্রেন থামল। আমরা সবাই প্রসাদ পেয়ে নিলাম। আবার খানিক পরে ট্রেন ছেড়ে দিল। বালেশ্বর, কটক ও ভুবনেশ্বরে অনেক ভক্ত এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করল। বেগে ট্রেন চলেছে, প্রায় পুরীর কাছে এল;— অমনি শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল! আমরা সবাই হরিবোল ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় দেখিয়ে বলছেন,—"ঐ দেখ, শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চূড়া।" আমি উল্লাসভরে

তাকিয়ে দেখছি আর মনে মনে ভাবছি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অপার করুণার কথা,—যদি এঁনার সঙ্গে দেখা না হোতো, ইঁনি কৃপা করে এত স্নেহ না করতেন তবে কি আর আমার ভাগ্যে কখনও শ্রীজগন্নাথ দর্শন হোতো ? এই সব করুণার কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল এল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেন বুঝে ফেলেছেন আমার মনের ভাব, তাই একটু হাসলেন। আস্তে আস্তে ট্রেন এসে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াল। অমনি চারিদিক থেকে—হরিবোল—ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। নিশান খুন্তি খোল করতাল নিয়ে কীর্ত্তনের দল এসেছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে যাবেন বলে। সমস্ত ঝালি নামান হোলো, লোটা কম্বল সব নামিয়ে একটা গরুর গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া হোলো।

ঠাকুর নিয়ে কৃষ্ণকমলদা'ও নরোত্তম কাকা আগে চললেন আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে, আমরা সবাই ষ্টেসনের বাহিরে এলাম। কটকের মুসীদা' সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। সমস্ত জিনিষপত্র গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো! মদনদা' হরেকেষ্ট দাদা মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। নিশান খুন্তি ঠাকুর আগে আগে চললেন আর শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম করতে করতে চলেছেন। অসংখ্য লোক তাঁর পেছনে এসে কীর্ত্তনে দোয়ারকী করছেন। সেই নাম-ধ্বনি দিগ্ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হোতে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দুটি আঁখি বয়ে অশ্রু ঝরছে! এক-এক বার তাঁর নাম করতে করতে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে, পুলকাবলী সর্ব্ব অঙ্গে দেখা দিয়েছে! মধ্যে মধ্যে তাঁর শরীর কম্পন হোচ্ছে! তাঁর মুখোৎগীর্ণ নামে আজ সকলের প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে। ক্রমেই নামের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। নাম করতে করতে ঝাঁজপেটা মঠে এসে তিনি অনেকক্ষণ ব্যাকুল প্রাণে নাম ক'রে শ্রীগুরুদেবকে কীর্ত্তনে কত আবদার ক'রে ডাকলেন, তারপর কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সামনে যেই তিনি

এলেন, অমনি ভাবে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। থর থর ক'রে তাঁর অঙ্গ কাঁপছে, আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না! একবার উঠছেন একবার পড়ছেন, এমনি করে তিনি মন্দিরের সামনে নৃত্য করছেন।

এমন সময় শ্রীগম্ভীরা থেকে কীর্ত্তন নিয়ে বৈষ্ণবেরা এলেন। সবাই ফুলের মালা হাতে ক'রে এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গলায় ও পারিষদদের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীপাদের সঙ্গে সবাই কীর্ত্তন করতে করতে গম্ভীরায় গিয়ে অনেকক্ষণ নাম কীর্ত্তন ক'রে সবাই বিশ্রাম কোল্লেন। আজ ওখানেই শ্রীমহান্ত মহারাজ সবার প্রসাদের বন্দোবস্ত করেছেন। ঐ খানেই সবাই স্নান আহ্নিক সেরে, অগণিত ভক্ত সব প্রসাদ পেলেন। তারপর সন্ধ্যার পূর্ব্বে নাম করতে করতে সবাই ঝাঁজ-পেটা মঠে এলেন। এইরূপ ভাবে পরমানন্দে কেটে গেল। পর দিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতে গেলাম। মন্দির বন্ধ, মন্দির পরিক্রমা ক'রে সমস্ত দেবতাকে দণ্ডবৎ ক'রে তারপর মঠে তাঁর সঙ্গে এলাম! আবার তাঁর সঙ্গে বিকেলে ঝালি সমর্পণ লীলা দেখলাম, সেখানে অপূর্ব্ব প্রাণ মাতান কীর্ত্তন শুনলাম।

আমি সেই সব লীলা ব্যক্ত করতে কখনও পারব না। যাঁরা শ্রীপাদের সঙ্গে এইসব লীলা দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছেন তাঁরাই বুঝবেন এই মধুময় লীলা। পরদিন শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলায় শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করতে করতে গুণ্ডিচা মন্দিরে এলেন। তারপর গুণ্ডিচা মার্জ্জন করতে লাগলেন—হাজার হাজার লোক হাতে ঝাড়ু ও ঘট-ভরা জল নিয়ে কেউবা আবার মাটীর কলসী ভরে জল নিয়ে—হরি হরি বোল ধ্বনি করে—মন্দির মার্জ্জন করছেন। সে যে কি আনন্দ তা লিখে আমি বর্ণনা করতে পারবো না, তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সকলে এসে স্নান করলেন। সবাই পরমানন্দে সাঁতার দিচ্ছেন; কেউ হরিবোল—বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। এইরূপ ভাবে

স্নানাদি সেরে সবাই আইটোটায় এসে আহ্নিক পূজা করলেন। ভারে ভারে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এল, মউর ব্যাসরাদি সব প্রসাদ! জল দিয়ে সেই সব প্রসাদ পাকাল করা হোলো। তারপর সবাই যে যেখানে পারে বালীর উপর বসে পড়লেন। তাকিয়ে দেখছি প্রায় দুই তিন হাজার লোক প্রসাদ পেতে বসে গেছেন। পরমানন্দে সবাই প্রসাদ পেতে লাগলেন। প্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ; যে খেয়েছে সেই বুঝবে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদের মহিমা!

শ্রীজগন্নাথ পরদিন রথে উঠলেন। কত বাজনা বাজছে; শ্রীজগন্নাথ ধীরে ধীরে রথে উঠলেন। যেই শ্রীজগন্নাথ রথে উঠলেন, আর লক্ষ লক্ষ লোকে হরি ধ্বনি ক'রে উঠল। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দেবী রথে ওঠা মাত্রই—জয় জগন্নাথ—নাম ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হতে লাগল। তুরী, ভেরী, ঘণ্টাদি বাদ্য বাজতে লাগল। শ্রীজগন্নাথের রথের দড়ি ধরে কালাবেঠিয়াগণ সবাই টানছেন। এত বড় উৎসব আর জীবনে কখনও দেখি নাই। আর এত লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমও কোথাও দেখি নাই। চারি সম্প্রদায়ের সাধু,—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণব—সবাই শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন কচ্ছেন আর দড়ি ধরে পরমানন্দে টানছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই রথের আগে কীর্ত্তন নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন কোচ্ছেন। রথ চলতে লাগল। শ্রীপাদও রথের সামনে কীর্ত্তন করতে করতে চলেছেন! সে যে কি আনন্দ তা আমি কি করে বর্ণনা করব! রথের আগে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে কত আনন্দে কীর্ত্তন কোচ্ছেন, কি মধুর সব আঁখর স্ফূর্ত্তি হোচ্ছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নেচে নেচে রথের আগে চলেছেন; সে যে কি মধুর নৃত্যভঙ্গী!—যে দেখেছে সেই সে আনন্দ-মধুর দৃশ্যের কথা বলতে পারবে! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাশে তাঁর শ্রীগুরু ভাই শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী, নন্দ কাকা, বিহারী কাকা, রাধাচরণ

দাস, বিশ্বরূপদা', নিতাইদা', উপেনদা', শশীদা', ভগবানদা', যুগলদা', চারুদা', বলাইদা', এই রকম অসংখ্য ভক্ত নেচে নেচে চলেছেন! শিঙ্গার মঠের গোস্বামী, আরোও কত গোস্বামী সন্তান নেচে নেচে চলেছেন! কত আঁখর স্ফূর্ত্ত হোচ্ছে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে; হঠাৎ এমন একটী মধুর আঁখরের স্ফূর্ত্তি হোলো যে অমনি আর সবাই মাথায় চাদর একটু টেনে ঘোমটার মতন ক'রে হেলে দুলে চলছেন, যেন রঙ্গিণীগণ চলেছেন! আঁখরটি বেশ মনে আছে,—
"হেলে দুলে যায় গৌর কিশোরী, সঙ্গে নিতাই আনন্দ মুঞ্জরী।"
এই আঁখরটি দেবার সঙ্গেই সমস্ত লোকজন নাচছে, পেছনে কত শত নারীও ছুটে ছুটে কীর্ত্তন সঙ্গে চলেছেন।

নীলাচলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অপার লীলা-মহিমা এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণন করতে অপারক বলে, একটু একটু দিগ্‌দর্শন করছি মাত্র। প্রায় পাঁচটার সময় গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছাকাছি রথ এসেছেন। প্রায় ৬ মাস বৃষ্টি নেই পুরীতে। ভীষণ গরম, উড়িষ্যায় হাহাকার পড়ে গেছে! সেবার আষাঢ়ের শেষে রথযাত্রা তাই একবিন্দুও বৃষ্টি নেই। গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন নিয়ে এসেছেন;— দাঁড়িয়ে খুব কীর্ত্তন-নর্ত্তন হোচ্ছে, শ্রীমহাপ্রভুর গুণ-কীর্ত্তন করতে করতে তিনি গাইলেন,—"প্রেমজলে ডুবালে, স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা, প্রেমজলে ডুবালে।" এই কথায় কীর্ত্তনে ভীষণ উদ্দণ্ডনৃত্য হোতে লাগল। আগের থেকে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, উপরে আমি তাকিয়ে দেখছি যে খুব মেঘ করেছে, আর অমনি ভীষণ বর্ষণ হোতে লাগল! আমরা সবাই ভিজে গেলাম। খোলের উপরে ছাতা ধরা হোলো, খোলও ভিজে যাচ্ছে। শ্রীজগন্নাথ শ্রীগুণ্ডিচার দ্বারে এসে পৌঁছলেন। সে যে কি বৃষ্টি আরম্ভ হোলো, তা ব'লে বোঝাতে পারবো না।

প্রায় ছয়টা হোতে সাতটা পর্য্যন্ত অজস্র ধারে বর্ষণ হয়ে ঐ অতবড়,

বড় দাণ্ডের উপর হাঁটু জল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঐ জলের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন হোলো তারপর খানিক পরে বৃষ্টি থামল। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের ঠিক সামনে একটুও জল জমেনি, সেইখানে বসে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করতে লাগলেন, কীর্ত্তনে পাথার বয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দ-কীর্ত্তন যে না শুনেছে তাকে বলে কেউ বোঝাতে পারবে না। অল্পক্ষণ পরেই রাস্তার জল বেশ সরে গেল। চারিদিক্ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সবাই বলাবলি কোচ্ছে,—কি আশ্চর্য্য! আজ ছয় মাস বৃষ্টি নাই উড়িষ্যায়, কিন্তু আজ রথের আগে শ্রীল বাবাজী কীর্ত্তন মুখে যেই বললেন,—"প্রেমজলে ভাসালে, স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা, প্রেমজলে ভাসালে।" আর কি! বলার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বৃষ্টি হোলো! কটক থেকেও খবর এল, সর্ব্বত্র এইরূপ বৃষ্টি হয়েছে। পুরীর সব কাগজে কটকের কাগজে—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের এইরূপ প্রভাব ও তাঁর করুণার কথা—সব লেখা দেখলাম। এই কথা সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে এসে বলছে আর তিনি হেসে বলছেন,—"ঝড়ে ঘর পড়ে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় আজ মেঘ বর্ষিত হয়ে উড়িষ্যাদেশকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল,—এ কথাটাও কেউ বোঝে না! মানুষের বুদ্ধি একেবারে ভ্রান্ত।" এইসব কথা বলে আইটোটায় এলেন। আজ আইটোটাতেই থাকবেন তারপর পৌণ্ড্রি বিজয় হবে! শ্রীজগন্নাথ শ্রীবলরাম গুণ্ডিচা মন্দিরে থাকবেন তারপর দুই একদিন পরেই শ্রীজগন্নাথ শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ীতে বেদীর উপরে গিয়ে বসলেন। এখন শ্রীল বাবাজী মহাশয় রোজ মন্দিরে যান, আর সন্ধ্যার সময় অপূর্ব্ব সব কীর্ত্তন করেন। সে সব কীর্ত্তনের মহিমা আমি লিখে দিগ্‌দর্শন কোর্ত্তে পারবো না। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সমস্ত কীর্ত্তন ছাপান হোচ্ছে, তাহা পড়লেই সবাই বুঝতে পারবেন,—তাঁর কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের স্ফূর্ত্তি।

এইরূপ পরমানন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ

দর্শন— ঠাকুর বিগ্রহ সব দর্শন করে ও শ্রীমহাপ্রসাদ পেয়ে পরমানন্দে দিন কাটছে। একদিন দেখলাম বড় সুন্দর এক বৈষ্ণব মূর্ত্তি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলেন! শ্রীল বাবাজী মহাশয় বড় শ্রদ্ধা ক'রে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। নাম তাঁহার শ্রীবাসুদেব মহারাজ। পুরীতে তাঁর খুব প্রতিভা, তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে স্নেহবশে বললেন,—"তোমারি সমুচা ভক্তবৃন্দ লেকে আজ শ্রীমহাপ্রসাদ পানে হোগা।" শ্রীল বাবাজী মহাশয়—যে আজ্ঞা—বললেন। সেইদিন প্রায় ৩ হাজার লোককে তিনি বসিয়ে ঘুরে ঘুরে শ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়ালেন। তাঁর কাছে যে যায় সে বিমুখ হয়না মহাপ্রসাদ পেতে। এ-সব আনন্দ লিখে বোঝান যায় না। তারপর উল্টোরথে শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দিরের কাছে এসে পৌঁছলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম করতে করতে রথের আগে আগে চললেন; মন্দিরের সামনে ৩টি রথ এসে থামল, ঐ খানে মন্দিরের সামনে কয়দিন থাকবেন! আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, নীচ, ধনী ও দরিদ্র সেই চাঁদ মুখ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হয়ে গেছে.— এ-সব ভাব ও গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতা ভাষায় বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য।

কয়দিন পরে শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মন্দিরের ভিতর গেলেন। এইদিন হোতে প্রায়ই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মঙ্গল আরতি দর্শন ক'রে, তাঁর সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা করি, আবার ঝাঁজপেটা মঠে ফিরে আসি। এই সময় এক-এক দিন এক-এক জনের বাড়ীতে মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হয়, আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সেথা যাই ও কীর্ত্তন শুনি. আর অপূর্ব্ব প্রসাদ পাওয়াও হয়! এমনি ক'রে আনন্দের আতিশয্যে দিনগুলো কাটছে। টোটা গোপীনাথের উৎসব আসছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলাম। সেখান থেকে গিয়ে তিনি টোটা গোপীনাথের. উৎসব করবেন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন ক'রে, নিতাই গৌর সীতানাথ দর্শন কোরে, তাঁর সঙ্গে পরিক্রমা করি। ওখানে শ্রীশ্যাম জ্যাঠামহাশয়, শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় ও সনাতনদা', হরিবোল দাদা আর হরিদাদা থাকেন, তাঁদের মধুময় সঙ্গ লাভ হোলো। সবাই বড় ভাল বাসতেন আমায়, আজ সবাই অপ্রকট হয়ে গেছেন কিন্তু তাঁদের প্রীতি এখনও ভুলিনি, ভোলা যায়ও না। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কলকাতা থেকে উত্তম চাউল এনেছেন,— টোটা গোপীনাথে উৎসব হবে! সমস্ত চাল ডাল সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। মঠ থেকে বহু ভক্ত গিয়ে সেবার জোগাড় করছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রায় ৯টার সময় সেখানে নাম করতে করতে গিয়ে হাজির হোলেন। অপূর্ব্ব গোপীনাথ বিগ্রহ ও শ্রীবলরাম বিগ্রহ দেখে পরমানন্দ লাভ করলাম; কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো! অদ্বৈত কাকা, চারুদা', বলাইদা', প্রিয়নাথ কাকা, যুগলদা' প্রভৃতি কত কত তাঁর পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ-কীর্ত্তন হবার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্দণ্ডনৃত্য হোলো, তারপর ভোগ হোলো, সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আরতি দর্শন করে ঐ আঙ্গিনায় সবাই প্রসাদ পেতে বসে গেলেন। প্রসাদের সুগন্ধে চারিদিক্ মুখরিত হয়ে গেছে। সে যে কি অপূর্ব্ব গন্ধ তা বলে বোঝান যাবেনা।

প্রসাদ পেয়ে সবাই মন্দিরের কাছে একটী বাগানে বিশ্রাম করে, তারপর নাম করতে করতে সন্ধ্যার পরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এসে পৌছলাম! শ্রীশ্যাম জ্যাঠা মহাশয়ের ওখানে বারান্দায় একটী কম্বল পাতা হয়েছে। ঠাকুরের আরতি দর্শন ও পরিক্রমা ক'রে তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সবাই দণ্ডবৎ প্রণতি করলাম। অতঃপর শ্রীশ্যামজ্যাঠা মহাশয়ের কাছে বারান্দায় এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বসলেন। শ্রীশ্যাম জ্যাঠামহাশয় আমার পরিচয় সব জানলেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন,—"কতদিন এসেছ এঁর কাছে?" আমি বললাম,—"এই অল্পকটি দিন; শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাবেন বলে নিয়ে এসেছেন। তিনি কৃপা ক'রে নিয়ে এলেন বলেই, এইরূপ সব উৎসব দেখতে পাচ্ছি, নইলে আমার চোদ্দ পুরুষের ভিতর এখানে কেউ এসেছে বলে মনে হয় না।" এই কথা শুনে সবাই মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন। আমি উৎগ্রীব হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"এই বুঝি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ। আমায় বলুন না কি কি লীলা এখানে হোলো।"

অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"এই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি শ্রীমহাপ্রভু নিজ হাতে দিয়েছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মত ভক্ত আর হয় না! কি দৈন্য তাঁর, শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতে পর্য্যন্ত যেতেন না! মন্দিরের কাছেও তিনি যেতেন না, পাছে জগন্নাথের সেবক তাঁকে ছুঁয়ে ফেলে! দূর থেকে তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করতেন আর অমনি শ্রীমহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতেন,—'প্রভু! আমায় ছোবেন না আমি অস্পৃশ্য যখন, এত করুণা কেন প্রভু!' শ্রীমহাপ্রভুও দৈন্য ক'রে বলতেন,—'আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে নিজে ধন্য হই, তুমি দৈন্য ছাড়।' এই সমস্ত কারণে তিনি মন্দির থেকে অনেক দূরে থাকতেন এক নির্জ্জন বাগানে, সেইখানে রোজ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করতেন।"

আমি বললাম,—"হরি হরি—এই নাম জপ বুঝি করতেন?" —"নারে তা নয়, মহামন্ত্র জপ করতেন,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' এই নাম এক লক্ষ উপাংশু জপ করতেন তিনি, আস্তে আস্তে নিজের কানে শোনা যায় এমনি করে। আর এক লক্ষ মানস জপ করতেন। আর এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে জপ করতেন। সংখ্যা রেখে জপ করতেন। সংখ্যা না রাখলে জপ সিদ্ধ হয় না বুঝেছিস তো?" আমি জিজ্ঞাসা

করলাম,—"আমিতো বইতে পড়েছি,—তিনি কৃষ্ণচৈতন্য বলতে বলতে মরে গেলেন।"

—"দূর্! বৈষ্ণব মরেনা, দেহ রক্ষা করেন, তাঁদের অপ্রাকৃত দেহ! মরে গেলেন কিরে?" তিনি বললেন,—"দেহ রক্ষা করলেন। এই রকম দেহ কি সবাই রক্ষা করতে পারে! শুনবি তবে শোন!" অমনি শ্রীপাদ বলতে লাগলেন,—"শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গায়ে রৌদ্র লাগত তাই শ্রীমহাপ্রভু বকুলের ডাল দাঁতন কোর্ত্তে কোর্ত্তে সেখানে পুতে দেন, তার পরই খুব বড় গাছ হয়, ছায়া হোলো, তার তলায় বসে নাম কোর্ত্তেন। ঐ বৃক্ষ এখনও আছে! চল একদিন দেখাবো তোকে! শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন কোর্ত্তে রোজই মহাপ্রভু আসতেন। তিনি ভোরে শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করেই শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিতেন।"

"দেখ! ভক্তের জন্য ভগবান শ্রীগৌর কিশোর নিজেই এসে রোজ তাঁকে দর্শন দিতেন! এমনই ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য লীলা! একদিন শ্রীহরিদাস ঠাকুর অসুস্থ হয়েছেন, শ্রীমহাপ্রভু এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কেমন আছ?' শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন,—'আমার অসুস্থ বুদ্ধি ও মন। নাম সংখ্যা ঠিক কোর্ত্তে পাচ্ছি না।' প্রভু বললেন,—'তোমার সিদ্ধ দেহ এত সাধন কেন!' অমনি শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁর কাছে একটি প্রার্থনা কোচ্ছেন,—'প্রভু! আমার এ প্রার্থনা পূরণ করতে হবে,—তোমার অপ্রকট লীলা আমি দেখবো না। তুমি এসে তোমার শ্রীচরণ আমার মস্তকে দেবে এবং আমার নয়ন ভৃঙ্গ তোমার মুখ-কমল-মধু পান কোর্ত্তে কোর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলতেই প্রাণ চলে যাবে।' শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের এ-প্রার্থনা পূরণ করেছেন। ভক্ত যাহাই বাঞ্ছা করবেন তাহাই তিনি দিতে বাধ্য হন! শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কামনা তাঁকে পূরণ কোর্ত্তে হয়েছিল! নইলে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু এ-নাম থাকে না। তারপর দিন শ্রীহরিদাস ঠাকুর একটু অসুস্থ হয়েছেন। শ্রীমহাপ্রভু

কাছে এলেন ; শ্রীচরণ মস্তকে দিলেন, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নয়ন ভৃঙ্গ শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্মে ডুবে গেল ! আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে প্রাণ কৈল উৎক্রমণ।" যেই এই কথা শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হোতে লাগল, চোখ দিয়ে অজস্র জল পড়তে লাগল ! প্রায় দশ মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর একটু স্থির হয়ে বলতে লাগলেন,—"শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উঠায়ে, তিনি বক্ষে তুলে নিলেন, তারপর স্কন্ধে রেখে নৃত্য করতে লাগলেন। ভক্তগণও আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন কোর্ত্তে লাগলেন। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে সমুদ্রে নিয়ে স্নান করিয়ে বলছেন,—'আজ শ্রীহরিদাসের পাদপদ্ম স্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থ হল।' তারপর সমুদ্রের তীরে বালুতে তাঁর সমাধি দিলেন। ঐ দেখ ! এখনও ঐ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে সমাধি দেওয়া ঐ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান !"

"তারপর তিনি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা ক'রে তাঁর উৎসব করলেন। বুঝলে, কি সুন্দর ভক্ত বৎসল লীলা ? আবার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে ঐ-যে বকুল গাছ আছে ঐ বৃক্ষ শ্রীমহাপ্রভুই প্রকটিত করেছেন, ঐ বৃক্ষের ভিতর শাঁস নেই। শুধু বল্কলের উপরই ঐ বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে !" শ্রীপাদ বলছেন,—"এর একটা কারণ আছে, এক সময় শ্রীজগন্নাথের রথ তৈয়ারী কোরবার জন্য ঐ গাছ কাটবার কথা হয়েছিল। ঐ গাছের কাঠ দিয়ে রথ তৈয়ারী হবার কথা হয়। মিস্ত্রি গাছ কাটবে বলে এসে দেখে ভেতরে শাঁস নেই, শুধু বল্কল !" সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেল। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্তে রোপিত কি না ! তাই এই রকম হোলো। এই বৃক্ষ এখনও সেই লীলার সাক্ষী দিচ্ছেন। আমরা ঐ তিথিতে এসে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসব কোরবো। আমি তোমায় নিয়ে আসব সেই সময়, কয়দিন পরে আমরা কটকে যাবো ; দেখবে, শ্রীরাধারমণের আশ্রম ওখানে আছে।" এইরূপ

পরমানন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কথা শুনে খুব আনন্দ হোলো।

তারপর সবাই ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। পরদিন খুব ভোরে শ্রীঝাঁজপেটা মঠে এলেন;—শ্রীগুরুপূর্ণিমার উৎসব হবে;—শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীপাদের তিরোভাব তিথি। বহু ভক্তের সমাগম হোচ্ছে। সবাই বড় বড় ফুলের মালা শ্রীগুরুদেবকে পরাবে, মুখে শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ দেবে, এই আনন্দে সবাই ছুটে ছুটে আসছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকালেই বসেছেন কীর্ত্তনে; শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিথি কিনা তাই তাঁর কথা-কীর্ত্তন কোচ্ছেন আর অশ্রু-কম্প-পুলকে বিভাবিত হয়ে পড়ছেন। অসংখ্য লোক এসেছে। কত বড় বড় লোক স্ত্রী পুত্র কন্যা সঙ্গে ক'রে এনেছেন,—শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করবেন ও শ্রীগুরু পূজা করবেন বলে। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হোলো তারপর আঙ্গিনায় গিয়ে উদ্দণ্ডনৃত্য-কীর্ত্তন হোতে লাগল।

আমি সেই দিন একটা নূতন দৃশ্য দেখেছিলাম। সেইদিন এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে সবাই—বালক, বৃদ্ধ, নারীও নৃত্য করছিলেন। এমন কি খুব সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও নিজ নিজ মান যশ লজ্জা ত্যাগ ক'রে ঐ দিন নৃত্য করেছিলেন। একজন জজবাবু এসেছেন, তাঁর সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা এসেছেন। হঠাৎ দেখলাম জজবাবুর স্ত্রী দু হাত তুলে নৃত্য করছেন, আর তিনি তাঁকে পেছন থেকে ধরে রেখেছেন, পাছে পড়ে যান বলে। শেষে তিনিও সামলাতে না পেরে তাঁর বড় মেয়ে তাঁকে পেছন থেকে ধরল, তখন দেখলাম মা-ও নাচছে মেয়েও নাচছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পাশে দাঁড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপছেন, অশ্রুজলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে! দু হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। —সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌ হারি— এ-কথা শোনাছিল, আজ প্রত্যক্ষ দেখছি। শেষে জজ বাবুও নাচছেন তাঁর স্ত্রীও নাচছে, কন্যাও নাচছে! তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে ঐ একটী

কথা বেরুচ্ছে—ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। সেদিন কীর্ত্তনের উন্মাদনা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত চলল, তারপর ঐ মহিলা মাটীতে পড়ে নীরবে সমাধির মত হয়ে রইলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন শেষ ক'রে স্নান আহ্নিক সেরে একটী চেয়ারে বসলেন, আর সবাই এসে তাঁর গলায় মালা পরালেন, তাঁকে আরতি করতে লাগলেন, মুখে মহাপ্রসাদ দিতে লাগলেন সবে! প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত এই লীলা চলল। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাবার সময় হোচ্ছে দেখে তিনি সবাইকে পাতা পেতে প্রসাদের ব্যবস্থা করতে বললেন। মহিলাটি তখনও সমাধিস্থ! তাঁর মেয়ে ও স্বামী এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিবেদন করলেন, অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"এখনও তাঁর জ্ঞান হয়নি?" এই কথা তিনি বলেই তার মাথার কাছে এসে খুব উচ্চৈঃস্বরে —গৌর হরি বোল—বলতেই মেয়েটি নয়ন মেলে তাকালেন এবং উঠে বসে মাথায় কাপড় দিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন। কীর্ত্তনে নাচবার সময় পরণের কাপড়ও তাঁর পড়ে গেছলো! শুধু একটী শেমিজ মাত্র পরণে তখন; নারীর লজ্জাই প্রধান,—তাও তিনি ভুলে গিয়ে—হা গৌরাঙ্গ—বলে নাম কচ্ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের এই মহীয়সী শক্তি নিজে চোখে দেখেছি তাই লিখে ফেললাম।

তারপর মহাপ্রসাদ পাবার সব ব্যবস্থা হল। তিলার্দ্ধ জায়গা নেই, সবাই পাতা নিয়ে বসে পড়েছেন। ভারে ভারে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ এল, অনেকে পাতায় পাতায় প্রসাদ দিতে লাগলেন। সে যে কি আনন্দ প্রসাদ-পাবার তা বলে বোঝানো যাবেনা। মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হতে প্রায় ৫টা বাজল। তারপর সবাই একটু বিশ্রাম করলেন। বিশ্রাম ক'রে উঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয় আরতি দর্শন করতে লাগলেন, আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে

আরতি দেখতে লাগলাম। এইরূপ পরমানন্দে আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় পুরী ছেড়ে কটকে যাবেন বলে, একদিন শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে বসে অপার কীর্ত্তন-আনন্দে সবাইকে পরমানন্দ দান করলেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন হচ্ছিল, পাণ্ডারা ছুটে ছুটে এসে প্রসাদি মালা পট্টডুরি তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য লোক তাঁর শ্রীমুখে নাম শুনে কৃতার্থ হলেন। কীর্ত্তন শেষে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীঝাজপেটা মঠে এলেন। আমরা কয় জনা লুকিয়ে আনন্দ বাজারে গেলাম। শ্রীঅদ্বৈতকাকা ছিলেন, আমি, চারুদা', বলাইদা', আর বসন্ত কাকা ছিলেন। সবাই প্রাণভরে শ্রীজগন্নাথের সোয়ার পিঠা, খাজা, গজা, জগন্নাথ বল্লভ, মুনখুরমা যে যত পারি খেতে লাগলুম, আর যখন চলেনা, নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছিনা এমন সময় চারুদা' বলছেন,—জীবন! আর যে পাচ্ছিনা, শ্রীমহাপ্রসাদ ছেড়ে দেওয়া ভয়ানক পাপ। শ্রীগুরুদেবের আদেশ : শ্রীমহাপ্রসাদের কখনও অবমাননা কোরোনা। কিন্তু আর যে পাচ্ছিনা, তুই একটা কাজ কর,—একটা নোড়া নিয়ে আয়, গলার ভিতর মহাপ্রসাদ আর যেতে চাচ্ছেনা, ঐ নোড়া দিয়ে গেদে গেদে দিলে বেশ যাবে!

শ্রীঅদ্বৈত কাকা আরও রসান দিয়ে বললেন,—"বেটাদের কোন জ্ঞানই হোলোনা, এতদিন দাদার সঙ্গ করছে। কোন অনুভবই নাই, অপরাধেরও ভয় নেই।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"কাকা কি অপরাধ হয়ে যাবে?" অমনি বললেন,—"বুঝছিস না? চারু নোড়া আনতে বলছে। নোড়া দিয়ে গলার ভিতর মহাপ্রসাদ ঠুসে ঠুসে দিতে গেলে যদি নীচে দিয়ে কিছু গোলমাল হয়ে পড়ে, তা হলে মন্দির কলুষিত হয়ে যাবে, আর পাণ্ডারা উত্তম মধ্যম দিয়ে ঘাড় ধরে বের কোরে দেবে! বরঞ্চ একটা কাঠি দিয়ে ধীরে ধীরে গলার ভেতর মহাপ্রসাদ গুঁজলে পরে নীচে দিয়ে বোধ হয় খাবার

কোন সম্ভাবনা থাকে না।" এই কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। প্রসাদ বেচেছে, চারুদা' পকেটে ভরল, অদ্বৈতকাকা ঠোঙ্গায় বাঁধলেন আমরাও তাই করলাম। এইসব আনন্দ আতিশয্যে আমরা মঠে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন,—"এত সময় কোথায় ছিলে?" অমনি আমি, অদ্বৈত কাকা ও চারুদা'র ঐ সমস্ত কথা শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বলে ফেললাম। আর শ্রীল বাবাজী মহাশয় খুব হাসতে লাগলেন। রাত ১১টা হল; সবাই মহাপ্রসাদ পেতে বসল, আমরা চুপি চুপি ছাদে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একবার টোটা গোপীনাথ দর্শন করবার বাসনা করলেন। আর অমনি খোল করতাল বাজল, পারিষদ সঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরলেন,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করতে করতে শ্রীপাদ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে প্রভুকে দর্শন ও ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন ক'রে শ্রীমন্দির পরিক্রমা ক'রে, নাম নিয়ে গম্ভীরা মঠ হয়ে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এসে খানিক ক্ষণ উদ্দণ্ডনৃত্য-নাম-কীর্ত্তন ক'রে, টোটা গোপীনাথের দর্শনের জন্য নাম করে রাস্তায় বের হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ১০০ জন নাম করছি। নাম করতে করতে যেই রাস্তায় খানিক দূরে এসেছি, অমনি কতকগুলি লোক এসে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন,—"বল—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ঐ-সব মেকী নাম ছেড়ে এই নাম কর।" এই কথা শুনে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুব নাম কীর্ত্তন করতে লাগলাম আর উদ্দণ্ডনৃত্য আরম্ভ হল। গগনভেদী নাম-ধ্বনি উঠেছে। এই নাম বন্ধ করবার জন্য অনেকে টিন বাজাতেও লাগলেন। সবাই খুব চটে গেছেন এই ব্যাপারে।

চারুদা', বসন্ত কাকা, বলাইদা' বলছেন,—"একটু মজা দেখিয়ে

দোবো? নাম বন্ধ করতে এসেছে এত বড় আস্পর্দ্ধা! শ্রীল বাবাজী মহাশয় শান্ত স্বরে বললেন,—"তোমরা নাম কর, অন্য দিকে তাকাও কেন? তোমাদের শ্রীগুরু প্রদত্ত নামে নিষ্ঠা কতটুকু আছে তাই পরীক্ষা করবার জন্য ঠাকুরের এই ভঙ্গী, নইলে সাধু ভক্ত যাঁরা তাঁরা নামের বিদ্বেষ করবেন কেন?" এই কথা শুনে সবার উষ্ণতা গেল এবং পরমানন্দে সবাই উদ্দণ্ডনৃত্য-নাম করতে লাগলেন। আর তাঁরাও বিফল মনোরথ হয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমরা আস্তে আস্তে শ্রীটোটা গোপীনাথ মন্দিরে গেলাম, সবাই দণ্ডবৎ প্রণতি করে আবার নাম করতে করতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এলাম, এখানে দণ্ডবৎ প্রণতি করে, ঝাঁজপেটা মঠে চলে গেলাম। আজ দুপুরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ওখানে প্রসাদ পেতে হবে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক সেরে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে তিনি ও বসন্ত কাকা, নন্দ কাকা, ফণী কাকা ও আমি এই কয়জন মিলে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এলাম। অনেকে আগেই চলে এসেছেন। পরমানন্দে ১টার সময় সবাই প্রসাদ পেয়ে ওখানেই বিশ্রাম করলেন। সে রাত্রি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয় রইলেন, আমরাও অনেকে তাঁর কাছে রইলাম। আবার অনেকে ঝাঁজপেটা মঠে চলে গেলেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসে আছি। শ্যাম জ্যাঠামহাশয়, শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় আরো কত ভক্ত বসে আছেন। কৌতূহল বশে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—এই নাম এত মধুর নাম, তবুও তাঁরা ঐ সমস্ত বাজে কথা কইল কেন? মেকি নাম, মেকি নাম বলে চেঁচাতে লাগল কেন?" অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলতে লাগলেন,— "শোনো তবে বলি। এই নাম এখন সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে যাচ্ছে বলে, অনেকের একটু অসুবিধা হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠা দেখলে

মানুষের একটু মাৎসর্য্য-জ্বালা এসে পড়ে। এই নাম সর্ব্বত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা, এমন কি ছোট ছোট বালক বালিকাও আনন্দে ও অনায়াসে করতে পারে। নামের মহিমা যারা জানবেন তাঁরা কখনও কোন নামে বাধা দেবেনা। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা জানতো,—'অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপায় করিল বহু নামের প্রচার। সর্ব্ব শক্তি দিলা নামে করিয়া বিভাগ, আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।' প্রভুর অনন্ত নাম রয়েছে। যার যে নাম করবার ইচ্ছা হবে, যার যে নামে নিষ্ঠা সে সেই নামই করবে। একটা নামে নিষ্ঠা আছে বলে অন্য নামকে অশ্রদ্ধা করব, এর চাইতে আর অপরাধ নাই। কেহ কৃষ্ণ নাম ক'চ্ছে কেহ শ্যামসুন্দর বলছে, কেহ রাধারমণ বলছে, কেহ কংসারি বলছে, কেহ বৃন্দাবন বিহারী বলছে, কেহ পার্থসারথি বলছে, আবার কেহ দ্বারকা নাথ বলছে ; সব নামেই তো সেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। আবার কেহ নিতাই বলছে আবার কেউ নিত্যানন্দ বলছে কিন্তু সেই নিতাইকেই তো বোঝায়। আবার কেহ গৌর বলে, কেহ গৌরাঙ্গ, নিমাইও বলে, আবার শচী-দুলালও বলে, কেহ বা কৃষ্ণচৈতন্য বলে ; সব নামেই তো সেই গৌর কিশোরকে বুঝায়! সেই জন্য কোন নামের বিদ্বেষ করলে মহা অপরাধ হয়। মুর্খ লোকে বিষ্ণায় বলে, আবার জ্ঞানী লোকে বিষ্ণবে বলে। তিনি ভাবগ্রাহী, দুই বাক্যই গ্রহণ করেন। এমন কি নাম শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হোলেও, হাস্য ছলে, বা পরিহাস ছলেও ব্যবহৃত বা ব্যক্ত হোলেও,—নাম কোন রকমে উচ্চারণ করলেই—তাকে তিনি তারণ করবেনই। নামের এমন মহীয়সী শক্তি সমস্ত শাস্ত্রে মহাজন বলে গেছেন। তারপর এই —'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' নাম এত সহজে উচ্চারণ হয় যে বালক, শিশুও অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে। যত যত অবতার হয়েছেন, নিতাই চাঁদের মতন মার খেয়ে আর কে প্রেম দিয়েছে ?"

"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারেও না মারিল চিত্ত শুদ্ধি করিল সবার।' একথা মহাজনরা বলেছেন। পতিতের জন্য আর কার প্রাণ কাঁদে ? পতিতকে বুকে ধরে আমার নিতাই চাঁদ, ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেম ভক্তি পতিতকে দান করেছেন। এমন পতিতের বন্ধু আর কে আছে, এমন পতিত পাবন কোন ঠাকুর এসেছেন কি ? পতিত কে খুঁজে খুঁজে বুকে ধরেছেন। আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে গিয়ে নাম প্রেম বিলিয়েছেন ! গোলোক ভাণ্ডার হতে প্রেম লুটে এনেছেন নিতাইচাঁদ। জাতি কুল অধিকার কোন বিচার না ক'রে, প্রেম দান করেছেন—এই নিতাইচাঁদ। জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপতাপ নিয়ে, শুধু একবার—গৌর হরিবোল—বললেই তাকে বুকে করে নিয়ে সুদুর্লভ প্রেম-ধন দান করেছেন ! এত বড় সুমহান দাতা আর কোন অবতারই আসেন নি বললেও অত্যুক্তি হবেনা।"

"কত কত মদ্যপ দুরাচারও তাঁর কৃপায় বঞ্চিত হয়নি ! কেন, জগাই মাধাইয়ের কথা তো জান ? তাদের উদ্ধার ক'রে বীজ রোপন ক'রে গেছেন, এখন এই রকম কত জগাই মাধাই উদ্ধার হয়ে যাচ্চে ! নাম-প্রেমে—গৌরহরি বোল—বলে নৃত্য করছে। নিতাইচাঁদের মহিমা, তাঁর করুণা ও প্রেমদাতৃত্ব শক্তির ওর কেউ পাবেনা। শ্রীগৌর কিশোর একদিন শ্রীরাঘব পণ্ডিতের হাতে ধরে বলেছিলেন,—"শুন শুন ওহে রাঘব আমি নিজ গোপ্য কই। আমার দ্বিতীয় নাই শ্রীনিত্যানন্দ বই। নিত্যানন্দ স্বরূপেরে যে প্রীতি করয়ে অন্তরে। সত্য সত্য সেই প্রীতি করয়ে আমারে।' স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌর সুন্দরই তাঁকে এত বড় উন্নত আসনে রেখে গেছেন, আর আমরা তাঁকে মা'নব না ! কত মহীয়সী শক্তি তাঁর। —'গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে। মূর্ত্তিমান তুমি কৃষ্ণ

রস অবতার। তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর।' এই রকম কত মহিমা তাঁর। তারপর জীব সব মায়া কবলিত, কলিহত জীব আমরা তাই নিতাই চাঁদের চরণ আশ্রয় ছাড়া আর কে পতিতজনকে আশ্রয় দেবে !"

"তাই শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় প্রথমে নিতাই নাম বলে তারপর গৌর নাম করলেন। তাঁর কেমন সিদ্ধান্ত একটু বিচার ক'রে দেখলেই সকলে বুঝতে পারবে। এই গৌর কে? না—রাধে শ্যাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কে? পেতে হয় কি ক'রে?—জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। 'জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—মানেই মহামন্ত্র নাম জপ বুঝায়;—শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মহামন্ত্র নামই জপ করতে সবাইকে বলেছেন।—ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ—এই কথাই তিনি বলে গেছেন। তারপর একটু বিচার করলেই দেখবে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের যাহা সার কথা তাই উক্ত হয়েছে,—'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—এই কথায়।"

"কেমন সুন্দর দেখদিকিনি;—ভজ ধাতুর অর্থ সেবা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিতাই-গৌর-রাধা-কৃষ্ণেরই ভজন বা সেবা করেন। নিতাই-গৌর, রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহই প্রায় সর্ব্বত্রই সেবিত হন। অন্য বিগ্রহ সেবিত হবেন না, তা আমি বলবো কেন? যাঁর যেরূপ ভাল লাগে তিনি সেই সেবাই করবেন;—কেউ শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবা করেন, কেউ গৌর-গদাধর সেবা করেন, কেউ আবার শ্রীনরহরির প্রাণ গৌরাঙ্গের সেবা করেন;—এই রকম সাধকের নিষ্ঠা অনুযায়ীই তিনি সেবিত হবেন। কিন্তু নিতাই-গৌর সেবা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত।"

"গৌর ছাড়া নিতাই নাই। নিতাই ছাড়া কি গৌর থাকতে পারেন! ব্রজ লীলায় আশ্রয় ও বিষয় আছে,—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়। তেমনি গৌর লীলায় শ্রীগৌর কিশোর বিষয়, আর নিতাইচাঁদ আশ্রয়। আজ কাল হয়েছে কেবল দ্বেষ হিংসা। নিতাই বললে দোষ হোলো, নিত্যানন্দ বললে দোষ

নেই। গৌর বললে মাথা ঘুরে গেল, আর কৃষ্ণচৈতন্য বললে কোনো দোষ হলনা। রাধে-গোবিন্দ বললে দোষ নেই আর যেই রাধে শ্যাম বললে অমনি ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়ে গেল।”

“এই সব নামের বিচার যারা করে তারা হতভাগ্য, এ ছাড়া আর কি বলা যাবে? বড় বাবাজী মহাশয় কত করুণায় আপ্লুত হয়ে এই নাম গ্রথিত করেছেন, একটাও নূতন নাম নয়। চারিযুগ থেকেই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নিত্য। স্বরূপ যেমন নিত্য তেমনি নামও নিত্য,—ইহা যারা বোঝেন না, তাদের বেনা বনে মুক্তা ছড়িয়ে কি হবে! ভজ ধাতুর অর্থ সেবা; জানতো, আজ কাল সেবা করা বড় কঠিন। সেবাপরাধ মুক্ত হয়ে পবিত্র ভাবে সেবা করা, এই কলি যুগে খুব কঠিন বলে, “রাধে” নাম করা হয়েছে। এটা সম্বোধন পদ। হা নিতাই! হা গৌর! হা রাধে! হা শ্যাম!—বলে ডাকাই শ্রেষ্ঠ সেবা বুঝলে তো? আর ‘জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ বলেই মহামন্ত্র নাম জপ করবার জন্য বলেছেন। কেমন সুন্দর সিদ্ধান্ত কিন্তু দ্বেষ হিংসা পরায়ণ চিত্ত যাদের, তারা এ কথা বোঝে না, তারা নিজের টেক্ কেউ ছাড়েনা। তাতে আমাদের কি এসে যাবে?”

“আমরা চিরদিনই এই শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম করব। কেউ না করে, বেশ তো, না করুক! কিন্তু আমাদের জীবনে মরণে—এই ‘ভজ—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ—হরে কৃষ্ণ হরে রাম।’ এ-নাম আমরা একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে বুঝেছি তাই এই নাম চিরদিনই করব। অন্যের বাজে কথায় আমরা ভুলবো কেন? জানতো, হাতী বাজার দিয়ে যায়, আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, হাতী কিন্তু ফিরেও তাকায় না। এই রকম নির্ভীক হয়ে প্রভুর নাম করে যাও। নামের বিচার করা যে মহা অপরাধ এখন তা বেশ বুঝেছ তো?” আমি বললাম,—“এমন সুন্দর ক’রে আপনি ছাড়া আর কে আমাদের বোঝাবে?” তাঁর শ্রীমুখে এই অপূর্ব্ব

নামের ব্যাখ্যা শুনে প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। তারপর ঠাকুরের ভোগ হোলো, সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। পরদিন সকালে কটক রওনা হবেন। মুসীদা' এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। কটক ষ্টেসনে এসে দেখি, একদল নাম-কীর্ত্তন করতে করতে এসেছেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয় নামের কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ করলেন। সবাই নাম করতে করতে চলে গেলেন, মাত্র ৫।৬ জন আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রইলাম।

সেবার শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র,—উড়িষ্যার পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল ও শ্রীরাজকিশোর বাবু,—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও এসেছেন; আরও কত কত সম্রান্ত লোক এসেছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবেন বলে। ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা শ্রীরাজকিশোর বাবুর বাসাতেই এলাম। তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় মুগ্ধ হয়ে এবার সেখানেই রইলেন। বাড়ীতে পোঁছে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটি ঘরে রইলেন আর সমস্ত পারিষদ অন্য ঘরে রইলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটি চেয়ারে বসে নাম জপ কচ্ছেন, আর অমনি রাজকিশোর বাবু এসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন, আর তাঁর শ্রীচরণ ধরে আকুল প্রাণে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন,—"আমায় শ্রীচরণ আশ্রয় দিন, আমি মহাপাষণ্ড, এমন কোন পাপ নাই যা আমি করিনি। আপনি পতিত পাবন, এ পতিতকে আপনি ছাড়া আর কেউ আশ্রয় দেবে না।" তাঁর এই আর্ত্তি দেখে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল ঝরতে লাগল। 'জয় নিত্যানন্দ রাম'—বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন এবং হাত ধরে তাঁকে উঠিয়ে বসালেন, সজল নয়নে বললেন,—"নিতাইচাঁদ কৃপা করবেন! ভয় কিসের?" এই আশ্বাস বাক্য শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন, তারপর তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন।

আজ তাঁদের গৃহে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন, এই আনন্দে

সবাই মসগুল হয়ে গেছেন। আনন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। কি ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেবা করতে পারবেন, কি ক'রে তাঁর ঠাকুরের উত্তম উত্তম ভোগের ব্যবস্থা করতে পারবেন,—এইই কেবল তাঁদের ভাবনা। একটা বাজল, ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল; সবাই আনন্দে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। তারপর সন্ধ্যা আরতির পর শ্রীল বাবাজী মহাশয় নিতাই গুণ-কীর্ত্তন করলেন। কটকের বহু শিক্ষিত লোক আজ নাম শুনতে এসেছেন।

একে রাজ কিশোরবাবু—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তারপর কত দৈন্য তাঁর,—ভক্ত-জীবনে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য এসেই পড়ে! এতটুকু তাঁর হৃদয়ে অভিমান নাই, তাই বহু শিক্ষিত লোক এসেছেন তাঁর গৃহে। কীর্ত্তনেও অপার আনন্দ হোলো। তারপর প্রায় সাড়ে বারোটার সময় সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঘরে শ্রীনন্দ কাকা ও ফণিকাকা আসন করেছেন, আর আমি তাঁদের কাছে আছি। সবাই প্রসাদ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে শৌচাদি সেরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় মালা হাতে ক'রে জপ করতে করতে বারান্দায় পায়চারি কোচ্ছেন,—তখন সকাল ৬টা হবে। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে বেড়াচ্ছি।

আমি হঠাৎ উপরের বারান্দার দিকে তাকালুম, দেখি কি,—শ্রীরাজ কিশোরবাবু ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি দোতলার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা সবাই অনিমিখ নয়নে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অভিরমণীয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কোচ্ছেন! সবাই উপরে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এক-একবার তাকিয়ে দুই এক পা করে চলছেন, আর ভৈরবী সুরে এই পদটী গাইতে লাগলেন,—"ভজ হুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে। দুরলভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এভব সিন্ধুরে। শীত আতপ বাত বরিখন এদিন যামিনী জাগিরে। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখ লব

লাগিরে। এধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পারতি তরে।
কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নিতিরে। শ্রবণ
কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাস্যরে। পূজন সখিগণ আত্ম
নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষীরে।” একে শ্রীল বাবাজী
মহাশয়ের কোকিল কণ্ঠের মত স্বর, তারপর ভৈরবী সুর, প্রাণ
যেন সবার কেঁড়ে নিল! উদারা থেকে পদটি ধরেছেন আর
মুদারা তারা ছেড়ে গিয়েও কণ্ঠের লহরী খেলছে। অমন বলিষ্ঠ তেজ-
দীপ্ত, অথচ আবার মধুর প্রেমাপ্লুত কণ্ঠ আমি জীবনে কখনও কারও
শুনিনি, যারা তাঁর কীর্ত্তন শুনেছেন তাঁরাই এ-বাক্যের তাৎপর্য্য
বুঝতে পারবেন। ভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি ঐ পদটি গাইছেন আর
সবাই শুনে অশ্রুজল বর্ষণ কোচ্ছেন। পদ শুনতে শুনতে
রাজকিশোর বাবু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, বসে বসে
মাথায় হাত দিয়ে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রী,
পুত্র ও কন্যা সবাই কাঁদছে! শ্রীল বাবাজী মহাশয় এক-একবার
কেঁপে উঠছেন, আবার নয়নের জল সামলিয়ে নিচ্ছেন; ভাবে
এক-একবার তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে,—অমনি ভাব ধারণ ক'রে
ফেলছেন! ভাব ধারণ করবার সামর্থ্য তাঁরই দেখেছি। সে যে
কি অপূর্ব্ব সুরে সেইদিন গাইলেন! এখনও সে-স্বর, সে-পদ
আমার কর্ণে বাজে আর তাঁর সেই ভাবে বিহ্বল-হয়ে-বলা ঐ
পদটীর মূর্চ্ছনা এখনও আমার প্রাণে সাড়া দিয়ে যায়।

শ্রীনন্দ কাকা এসে বললেন,—“দাদা চল স্নান করবে, আজ
রাজকিশোর বাবুকে দীক্ষা দিতে হবে, একটু সকাল সকাল স্নান
সেরে নেও।” তাঁর কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শান্ত হয়ে
বসলেন। আমরা সবাই তাঁকে তেল মাখাতে লাগলুম। তিনি
কত গল্প করতে লাগলেন, তারপর স্নান আহ্নিক সারা হোলো।
দীক্ষা দেবার জন্য শ্রীপাদ নন্দ কাকাকে ডাকলেন। শ্রীনন্দ
কাকা, রাজকিশোর বাবু ও তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাইকে

ডাকলেন, নাম আরম্ভ হল ; শ্রীল বাবাজী মহাশয় দীক্ষা দেবার আগে প্রার্থনা-কীর্ত্তন ক'রে বলছেন,—"একবার এস হে। এস জগৎগুরু শ্রীনিত্যানন্দ একবার এস শ্রীগুরুরূপে। আমার কোনই অধিকার নাই, একবার এস রাধারমণ! একবার এস আমার পাগলা প্রভু! ভজাও প্রাণের নিতাই গৌরাঙ্গ, পাপ তাপ সব আমায় দিয়ে ভজ প্রাণে নিতাই গৌর হে।"

এই কথা বলতে তিনি কেঁদে আকুল হয়ে পড়লেন। তাঁরাও সব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অপূর্ব্ব নামের ধ্বনি উঠল আর এক এক জনকে ডেকে শ্রীপাদ কর্ণে মন্ত্র দিতে লাগলেন, রাজকিশোর বাবু মন্ত্র পেয়ে ভাবে বিহ্বল হয়ে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। শ্রীপাদ আজ কটকবাসী অনেককেই মন্ত্র দান করলেন। তারপর নাম শেষ হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় উঠে বসলেন এবং সবার প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করতে নন্দ কাকা ও মুন্সীদা'কে ডেকে বললেন,—"প্রসাদ পাবার স্থান ঠিক করতো।" তারপর আমরা সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসে গেলাম। নন্দ কাকা ঘুরে ঘুরে দেখছেন, আমি ডাকলুম,—"কাকা আসুন প্রসাদ পেতে।" একটু পরে বসছি—তিনি এই কথা বললেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীনন্দ কাকার মনের ভাব বুঝলেন,—অমনি একটু অধরামৃত একটি বাটীতে দিয়ে নন্দ কাকাকে দিলেন। শ্রীনন্দ কাকা অধরামৃত নিয়ে রাজকিশোর বাবুকে দিলেন। তাঁরা একটু একটু সবাই পেয়ে জল খেয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদ পাওয়া দর্শন করতে লাগলেন। তারপর প্রসাদ পেয়ে উঠে তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন।

সেদিন রাজকিশোর বাবুর বাড়ীতে কটকের বহু ভক্ত প্রসাদ পেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করতে গিয়ে বললেন,—"আজ শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের বাড়ীতে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হবে, আর ওখানেই পূজারী গিয়ে ভোগ রাঁধবে; সবাই কীর্ত্তনের পরে

প্রসাদ পাবে।" এই কথা বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করতে গেলেন। আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পদ-সেবা করতে লাগলুম।

বিকেল হোলো, সবাই শৌচাদি সেরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কাঠজুড়ী নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। বেড়াতে বেড়াতে শ্রীরাস বিহারী মঠে গেলাম,—শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের সেবা দেখলাম! দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে তাঁর সঙ্গে ফিরে বাসায় এলাম। সন্ধ্যা কীর্ত্তন হয়ে গেছে। অনেক রকম গাড়ী, মোটর রাজকিশোর বাবুর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই খোল করতাল ঠাকুর নিয়ে গাড়ীতে রওনা হোলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নন্দকাকা, ফণিকাকা ও আমি শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয়ের মোটরে তাঁর বাড়ী এসে পৌঁছলাম। এসে দেখলাম,—খুব বড় আসর হয়েছে; ওখানকার যত বড় লোক, মানী লোক সবাই এসেছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনতে। আমরা আসরে গিয়ে বসলাম।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় ভূমিষ্ট হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম ক'রে একটি চেয়ারে বসালেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্রাদি ও আরোও অনেক আত্মীয় স্বজন সব তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর একটু পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন-আসরে গিয়ে বসলেন। আজ অপূর্ব্ব নিতাই চাঁদের মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন! নিতাই গুণ গাইতে গাইতে অপূর্ব্ব একটী পদ আঁখর দিয়ে দিয়ে গাইতে লাগিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক এসেছেন, কত প্রফেসার এসেছেন, কত পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক এসেছেন।

এখন অপূর্ব্ব একটি পদ ধরলেন: নিতাই যারে দেখে তারে বলে, এই সুরধুনীর কূলে কূলে নিতাই যারে দেখে তারে বলে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেন সুরধুনীর কূলে নিতাই চাঁদকে দেখেছেন! এবং নিতাই চাঁদ যেন সব কথা বলছেন! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে যে সমস্ত নিগূঢ় আঁখর স্ফূর্ত্ত হয়,—সে-সব আমি নিজে বলেছি বা আমি তৈরী করে বলেছি,—এমন

কথা আমি তাঁর জীবন ভোর কখনও তাঁর মুখে শুনিনি; সবই তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ বলছেন,—অথবা নিতাইচাঁদ বলছেন,—এ ছাড়া কোন দিনের জন্যও শুনিনি—আমি বলেছি। অথচ তাঁর কীর্ত্তনের সময় অফুরন্ত আঁখর স্ফূর্ত্ত হোতো। যখনই কেউ তাঁকে তাঁর এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-কথা সম্বন্ধে বলতো যে—সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই আপনার কীর্ত্তনে বের হোচ্ছেন—তখনই তিনি শুনা মাত্রই বলতেন,—"আমার কোন কথাই নয়! সব দাতার দান! নিতাইচাঁদ দেন, সে বলায়, তাই বলি!"

আমাদের যদি কেউ একটু ভাল বলে বা মহিমা বর্ণনা ক'রে অমনি আমাদের গালভরা হাসি এসে যায় এবং তাঁর সঙ্গে কত প্রীতির ব্যবহার করি, কত সেবা যত্ন করি কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ ক'রে আমি খুব ভাল রকমই দেখেছি যে এই মর্ত্ত জগতের নিন্দা বা স্তুতিতে তাঁকে কোনদিনই চঞ্চল বা অশান্ত করতে পারেনি। অথচ তাঁর জগৎ জোড়া প্রতিষ্ঠা;—বরঞ্চ যে তাঁকে নিন্দা করত বা অশ্রদ্ধা করত তাঁকে তিনি এত বেশী ভালবাসতেন যে আমি তা বলে শেষ করতে পারব না, অম্লান বদনে, হাসি মুখে নিন্দা সহ্য ক'রে, তাঁর সতত কল্যাণ কামনাই করতেন। আমি নিজে চোখে দেখেছি, যারা তাঁকে কঠোর বাক্য বলেছে, যারা তাঁকে দুর্ব্বিসহ নিন্দা করে আঘাত করেছে, তিনি করুণায় আপ্লুত হয়ে, তাদের সব অপরাধ—অবর্ণনীয় জঘন্য অপরাধ ও নারকীয় পাপ—ক্ষমা ক'রে তাদের শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে ভক্তি বলে বলীয়ান ক'রে, তাদের পতিত পাবনত্ব শক্তিও দান করেছেন। এখনও তার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। যারা তাঁর মধুময় সঙ্গ করেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে এই কথার ভিতর এতটুকুও অতিরঞ্জন হয়নি।

যাক, শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের বাড়ীতে কীর্ত্তন ধরেছেন,—"নিতাই যারে দেখে তারে বলে,—কি করে বরণ কুল। কোন কুলে

কি গোবিন্দ মেলে, আকুল প্রাণে না ডাকিলে, কুলে কি গোবিন্দ মেলে, আকুল প্রাণে ডাকিলে গোবিন্দ,—তোমার হোলাম—বলে।” এই কথা বলতে বলতে মাতন আরম্ভ হোলো, প্রায় আধ ঘণ্টা মাতন চলল।

তারপর আবার পদ ধরলেন,—“দেখ কপিকুলে ধন্য বীর হনুমন্ত, শ্রীরাম ভকত রাজ। সে যে হৃদয় চিরে দেখায়েছিল, বনের বানর হয়ে কেবল ভকতির বলে, হৃদয় চিরে দেখায়েছিল; মানুষ হোয়ে তোমার গরব কিসের, সে তো পশু হোতেও অধম বটে, যে মানুষ হয়ে হরি না ভজে, সে তো পশু হোতেও অধম বটে। শ্রীরাম ভকত রাজ; সে যে হৃদয় চিরে দেখায়েছিল,—সীতা রামের যুগল রূপ, সে হৃদয় চিরে দেখায়েছিল। রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর সভার মাঝ। দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে যাঁহার যশ। স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নরহরি হইয়া যাহার বশ। তার উত্তম কুলে জনম নয়। নরসিংহরূপে প্রকট হোলেন, প্রহ্লাদের বিশুদ্ধ ভকতির বলে, নরসিংহরূপে প্রকট হোলেন। দেখনা, কি কুল বিদুরের ছিল, খাইল যাহার ঘরে।”

এই পদ গাইতে গাইতে শ্রীপাদ কেঁদে উঠলেন, অশ্রুজলে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। একটু ভাব সম্বরণ ক’রে তিনি বলতে লাগলেন, কি সুন্দর আঁখর দিতে লাগলেন,—“তাঁরতো উত্তম কুলে জনম নয়, দাসী পুত্র বিদুর বটে, তার উত্তম কুলে জনম নয়, খুদ কণা যেচে খেলেন, দুর্য্যোধনের নানা উপচার ফেলে, খুদ কণা যেচে খেলেন, বড় ক্ষুধা পেয়েছে দাও দাও বলে, ক্ষুধ কণা যেচে খেলেন। বড় সুধা! সুধা সুধা বলে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে দাও দাও বলে।” আঁখর দিতে দিতে তিনি বালকের মত কেঁদে উঠলেন। মস্তক বিশেষ ঘূর্ণিত হোতে লাগল। তাঁর অঙ্গে অশ্রু কম্পাদি ভাব সকল আবির্ভূত হল। খানিকটা মাতন হবার পর তিনি শান্ত হয়ে

আবার পদ ধরলেন।

পদটী এই : "চণ্ডাল হইয়া মিতালী করিল গুহক চণ্ডাল বরেরে।" আবার তিনি আঁখর দিতে লাগলেন—"রামামিতে বলে ডাকিত। চণ্ডাল হয়েও পূর্ণব্রহ্মে রামামিতে বলে ডাকিত। উচ্ছিষ্ট ফল খেতে দিল, চণ্ডাল কন্যা শবরি, উচ্ছিষ্ট ফল খেতে দিল। সে তো নয় তার কুলের গরব, সে যে কেবল ভকতির বল, সে তো নয় তার কুলের গরব ;" ব্রজ বঁধুদের কথা আসছে তাই তিনি আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছেন আর বলতে লাগলেন,—"দেখনা, কিবা সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারীরে তারা তো গোয়ালার মেয়ে, তাদের উত্তম কুলে জনম নয়, তারাতো গোয়ালার মেয়ে; যেমন নাচায় তেমনি নাচে, অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে যেমন নাচায় তেমনি নাচে, ক্রীড়া-পুত্তলিকায় মতন, যেমন নাচায় তেমনি নাচে, শ্রীরাস মণ্ডলের মাঝে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে।" এই বলতে বলতে ভাবে হো হো করে হেঁসে উঠলেন, মনে হচ্ছে যেন সামনে দেখছেন,—শ্রীরাস মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য। পরক্ষণেই অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবে তাঁর শরীর বিভাবিত হয়ে পড়ল,—মস্তক এমন ঘূর্ণিত হচ্ছে যে মুখ চেনা যাচ্ছেনা! একটু ভাব সম্বরণ ক'রে পদ ধরলেন,—"জাতি কুলাচার কি করিবে তাঁর শ্রীহরি যে ভজে তারিরে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাইরে। অমনি তিনি আঁখর দিচ্ছেন,—কেন কুল কুল করে কুল হারাওরে, এমন সাধের জনম পেয়ে, কেন কুল কুল করে কুল হারাওরে, চণ্ডালও হয় দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজ হয়েও হয় শ্বাপদাধম, কৃষ্ণ প্রভু পাসরিলে, দ্বিজ হয়েও হয় শ্বাপদাধম ; তাই বাহুতুলে নিতাই বলে,—বল প্রাণের গৌর হরি কুল অভিমান পরিহরি বল প্রাণের গৌর হরি।" এই কথা বলতে খানিকক্ষণ মাতন হোলো। আবার গাইলেন ;—"বাহুতুলে নিতাই বলে, তোমরা জাননাকি কলিজীব, এবার গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হোলো জাননাকি কলিজীব।" এই বলেই একটি সুন্দর পদ গাইলেন,—"শ্রীনন্দ নন্দন গোপীজন বল্লভ,

শ্রীরাধা নায়ক নাগর শ্যাম। সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর, সুরমুনি গণমন, মোহন ধাম। শচীসূত হইল সেই, নন্দের নন্দন যেই শচীসূত হইল সেই, নন্দসূত বলি যারে ভাগবতে গায়রে, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাইরে, তোমরা জাননাকি কলিজীব, আমার নিতাই কেঁদে কেঁদে বলে, তোমরা জাননাকি কলিজীব, এবার গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হোলো, আবেশে নিতাই বলে, শ্রীগৌরাঙ্গ রহস্য আবেশে নিতাই বলে, জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনোদ।"

"রাধাভাব দ্যুতি চোরা, তিন বাঞ্ছাপুরাইতে, রাধা ভাব দ্যুতি চোরা, আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে রাধাভাব দ্যুতি চোরা, আস্বাদিয়ে পিয়াইতে, রাধাভাব দ্যুতি চোরা, অনর্পিত বিতরিতে, রাধাভাব দ্যুতি চোরা, হইল ইচ্ছার উদ্যম, রাস রসে খেলতে খেলতে হইল ইচ্ছার উদ্যম,—কে আমায় মুগ্ধ করে! আমি তো ভুবন মোহন, কে আমায় মুগ্ধ করে! আমি উহাই আস্বাদিব,—কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তিঁহো ভোর। এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নাহল পূরণ, কি করিবে না পাইয়া ওর। তাই ভাবিয়া দেখিল মনে রাধার স্বরূপ বিনে এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়!"

"তাই রাধা ভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি নদীয়াতে হইল উদয়রে। এবার কৃষ্ণের চৈতন্য নাম, দিতে রাধা প্রেমের প্রতিদান, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম।" অমনি মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হল। যেন প্রেমের পাথার বইতে লাগল। তিনি ভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, শরীর এত ভীষণ কম্পিত হোচ্ছে, যে শরীর চেনাই যাচ্ছেনা! মস্তক এমন ঘূর্ণিত হোচ্ছে যে দেখলে অবাক হতে হয়! নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল ঝরছে! তা আবার চারিদিকে ছিটকে পড়ছে! এ-কি ভাবোদ্রেক! এই সময় তাঁর সাষ্টাঙ্গে যে-কি মহাভাবের উদ্রেক হয়েছে তা বর্ণনা করার চেষ্টা আমার পক্ষে পল্লবগ্রাহিতা!—এ-যেন বামনের চাঁদ ধরবার চেষ্টার মত। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ মাতন হোলো।

তারপর শান্ত হয়ে পদ ধরলেন,—"ব্রজ তরুণীগণ লোচন মঙ্গল এবে নদীয়া বধূগণ নয়ন আমোদ।" তারপর কত আক্ষেপ, অনুরাগ ও বিরহের কীর্ত্তন করলেন; আমি কতটুকুই বা লিখব! লিখলে তার শেষ হওয়া কঠিন; তাই অল্প একটু কীর্ত্তন লিখলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সমস্ত কীর্ত্তন ছাপান হচ্ছে, তাতেই তাঁর সমস্ত কীর্ত্তন সম্বলিত হয়েছে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হোলো তারপর কীর্ত্তন শেষ ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটী ঘরে গিয়ে বসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে—আজ আমার পরম ভাগ্য—বলে দৈন্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এদিকে প্রসাদ পাবার সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, সবাই প্রসাদ পেতে বসলেন। তারপর সবাই প্রসাদ পেয়ে গাড়ীতে উঠে রাজকিশোর বাবুর বাড়ীতে এসে বিশ্রাম করলেন। এই রকম কটকে গোকুল বাবুর বাড়ীতেও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন উৎসব হোলো। প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, বিশেষ বিশেষ লীলাবলী মনে আছে। তাও খুব অল্প কথায় লেখা হোলো।

কটকে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটল, তারপর তাঁর সঙ্গে ভাগবৎ বাবুর বাড়ী ভদ্রকে এসে পোঁছলাম। ভাগবৎ বাবু শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে গৃহে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন! তাঁদের প্রীতি ও ভক্তির কথা আমি আর কতটুকুই বা বর্ণনা করব! তাঁদের সেবা যত্ন এখনও মনে পড়ে। সেখানে কত কীর্ত্তন হোলো, কত মহোৎসব হোলো। তারপর কয়দিন সেখানে থেকে আমরা কলিকাতায় চলে এলাম। অনেকদিন পরে পাঁচুদা'র গৃহে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এলেন। কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে পেয়ে পরমানন্দিত হোলেন। এই সময় গোপাল দাস বলে একটী ছেলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের

কাছে এল। অপেরা কাকার দেশে তার বাড়ী। ছোট ছেলে,—বেশ অনুরাগী, তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাকে আশ্রয় দিলেন। এখন পরমানন্দে সবারই দিন কাটছে পাঁচুদা'র বাড়ীতে।

শালকিয়া গিয়া শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শন লাভ করতে অনেকেরই অসুবিধা হয়, তাই দর্জ্জিহাটায় একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে সবাই মঠের মতন ক'রে নিলেন ;—সুন্দর একটি ঠাকুর ঘর, ৪টা জল-কল, ভাড়ার ঘর, রসুই করবার ঘর, উপরে একটি বিশ্রাম করবার ঘর ; সুন্দর স্থান দেখে শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসন্ন হোলেন। এখানে সেবার সমস্ত ভার পাঁচুদা'ই প্রথম নিলেন। পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসব এসে পড়েছে তাই এখানে কয়দিন থেকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবের জন্য ভিক্ষা করতে লাগলেন। উৎসবের ভিক্ষা শেষ হোলো ; শ্রীল বাবাজী মহাশয়—ফণিকাকা, নন্দ কাকা, আমি ও আরও পাঁচ ছয় জন—ভক্ত সঙ্গে গাড়ী ক'রে হাওড়ার ষ্টেসনে এসে পৌঁছলেন। জিনিসপত্র সব নামান হোলো। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভিক্ষা,—আড়াই হাজার টাকা একটা বাক্সে রয়েছে। ঐ বাক্সটাও নামান হোলো, ইত্যবসরে ফণিকাকার সঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কথা বলছেন, আমিও কাছে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ফণিকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন,—কই বাক্স কোথায়! এইতো এখানে রেখেছিলাম, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবের সমস্ত টাকা আর এমন কি পুরী যাবার ট্রেনের টিকিটও উহার ভিতর। কই সে বাক্স?—এদিক ওদিক সব খুঁজতে লাগল, কেউ সন্ধান পেলনা।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নাম জপ কোচ্ছেন, কিছুই বলছেন না। সবাই ঘুরে এল এদিক ওদিক থেকে, টাকার কোন সন্ধানই পাওয়া গেলনা,—সবাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন! এমন সময় একটা পুলিশ একটা লোককে ধরে নিয়ে এল,—তার হাতে ঐ বাক্স রয়েছে! অমনি আনন্দে ফণিকাকা বলছেন,—এইতো বাক্স—বলেই তাকে খুব দু-চারটে চড় মারতেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাকে

শান্ত করলেন। পুলিসটি বলল,—"আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আপনাদের কাছে, হঠাৎ এই লোকটী বাক্সটা নিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল, আপনারা কেহই টের পাননি। আমি কিন্তু তার পেছন নিলাম, অনেক দূরে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসেছি। বেটা চোর! উহাকে জেলে ভরে রাখব!" শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাকে বললেন—"ঠাকুরের দয়ায় যখন আমরা পেয়ে গেলাম বাক্সটা, তখন ছেড়ে দিন একে।" তাঁর কথা শুনে পুলিস প্রসন্ন হয়ে তাকে ছেড়ে দিল, চোরও ভয়ে আড়স্ট হয়ে গেছল।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দয়ায় মুক্ত হোলো,—এই আনন্দে সে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম ক'রে চলে গেল। তাকে আমি এক বৎসর পরে দর্ম্মহাটায় মঠে দেখি! তখন সে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে পরম ভক্ত জীবন যাপন করে! করুণায় আপ্লুত হয়ে শ্রীপাদ তাকে ক্ষমা করেছিলেন, তাই সে ধন্য হয়ে তাঁর চরণ আশ্রয় ক'রে ভক্ত জীবন লাভ করে!

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সকল জিনিষপত্র নিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনে উঠলাম। মহানন্দে একটা ছোট কামরাতে আমরা দশ বার জন বসলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল, খড়গপুর, কটক, বালেশ্বর ও ভুবনেশ্বরে অনেক ভক্ত এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করল। ট্রেন পুরীর কাছে আসতেই দূর থেকে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখলাম; স্টেশনে গাড়ী এসে থামল। পরমানন্দ কাকা, মুন্সীদা' ও আরো অনেক ভক্ত এসেছেন। গাড়ী থেকে নামিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে সব জিনিষপত্র উঠল। আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নাম করতে করতে কাঁজপেটা মঠে গিয়ে উঠলাম। সেখানে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় থাকতেন, তাই আগে তাঁকে দর্শন করে, তবে শ্রীল বাবাজী মহাশয় অন্যত্র যান।

শ্রীগুরুদেব এখন অপ্রকট হয়েছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কিন্তু

প্রকটই মনে করেন। সবাই স্নান আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। অনেকেই বিকেলে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে চলে গেলেন। কেবল ফণিকাকা ও আমি রইলাম শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে। সন্ধ্যার পর আরতি দেখে আমরা মন্দিরে গেলাম। নরোত্তম কাকা ঠাকুর নিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে চলে গেলেন। আমরা একটু পরে দর্শন ক'রে যাবো,—এই কথা শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলে দিলেন; শ্রীজগন্নাথ দর্শন ক'রে, ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন ক'রে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করে, আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে গম্ভীরায় গিয়ে দর্শন করে, সমুদ্রের ধারে গেলাম। সমুদ্রের জল স্পর্শ কোরে আমরা সবাই সমুদ্র মহাতীর্থ বলে দণ্ডবৎ ক'রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এসে পৌছলাম।

তখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আরতি হচ্ছিল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দর্শন ক'রে দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিক্রমা ক'রে, মঠের পেছনের ঘরে শ্যাম জ্যাঠা মহাশয় ও গোবিন্দ জ্যাঠা মহাশয়কে দণ্ডবৎ ক'রে, আমরা সবাই তাঁদের কাছে বসলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটী আসনে বসলেন। বয়সে ছোট হোলেও শ্যাম-জ্যাঠা মহাশয় ও শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় তাঁকে এত প্রীতি-শ্রদ্ধা করেন যে তা বলে বোঝান যায় না। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ষ্টেশনে চুরির কথা সব ব্যক্ত করলেন, নদীয়ায় মহাপ্রভুকে চোরে চুরি ক'রে নিয়ে, সেই চোরই ঘুরে ঘুরে মহাপ্রভুর বাড়ীতে এসেই পৌছিল এবং অবাক হয়ে মহাপ্রভুকে রেখে পালিয়ে গেল, আমাদেরও ঠাকুর আজ এইরূপ লীলাভঙ্গী করলেন। ফণিকাকা সমস্ত তাঁদের বলেছেন কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় এই চুরিকে যে-ভাবে দেখেছেন, সে-ভাবই ব্যক্ত করলেন। সমস্ত টাকা গোবিন্দ জ্যাঠামশায়কে দিলেন। কাল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসব।

সন্ধ্যার সময় চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হোলো। পরদিন সকালে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে গিয়ে শ্রীল

বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ক'রে—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চিন্ময় দেহ শ্রীমহাপ্রভু কাঁদে ক'রে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে করতে নিয়ে এসে সমুদ্রে স্নান করালেন ও তারপর সমাধি দিলেন,—এই সব কথাই সবাইকে শুনালেন। তারপর নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তে তিনি সমুদ্রের কিনারে গিয়ে দণ্ডবৎ ক'রে জল মাথায় দিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে এলেন। খানিকক্ষণ নাম কীর্ত্তন ক'রে সবাই স্নান ও আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। আজ সন্ধ্যার পর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ কীর্ত্তন হবে ; বহু ভক্তের সমাগম হতে লাগল।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীনিতাই গৌর ও সীতানাথ বিগ্রহের সামনে বসলেন। সমস্ত প্রাঙ্গণ ভরে গেছে। লোকে লোকারণ্য, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, সে দিন যে-কীর্ত্তন হল তা আমি বলে বুঝাতে পারবোনা। সেই দিন যে পাষাণ-গলান কীর্ত্তন হয়েছিল, তা যে শুনেছে বা দেখেছে, সেই বুঝিবে তাঁর এ-কীর্ত্তনের মহিমা !

আমার মত পাষাণ হৃদয়ও যাদের, তারাও সেদিন গলে গেছলো, আঁখির জলে আকুল হয়ে সবাই কেঁদেছে ! বহু লোক ভাবে গড়াগড়ি দিয়েছে ঐ প্রাঙ্গণে। কত আর্ত্তি, কত ব্যাকুলতা সেদিন দেখেছি ভক্তের, এমন কি পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়ে গেছে! আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেই দিনের কীর্ত্তন উচ্ছ্বাস ও ভাব ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবোনা। কীর্ত্তন শেষে—জয় ঠাকুর শ্রীহরিদাস—এই নাম অনেকক্ষণ ধরে কীর্ত্তন ক'রে শেষ করলেন। তারপর শ্রীমহাপ্রসাদের পংক্তি আরম্ভ হল। বৈষ্ণববৃন্দ একদিকে বসলেন, আর যে যেখানে পারেন বসে গেলেন ;—এমন কি ছাদেও তিলার্দ্ধ জায়গা নেই। অত বড় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠ, তাও সব ভর্ত্তি হয়ে গেল। শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় ও আরো অনেকে শ্রীমহাপ্রসাদ দিতে লাগলেন ;—কত রকম প্রসাদ এসেছেন ! অকাতরে সবাইকে দিচ্ছেন। চারুদা', অদ্বৈত কাকা আর

আমি এক জায়গায় পাশে পাশে বসেছি। ফণিকাকা বহু অমৃত-প্রসাদ দিচ্ছেন। শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় পরিবেষণ করছেন। চারুদা' প্রসাদ দুই এক গ্রাস পেয়েই চেঁচিয়ে বলছেন,—"এই হাঁড়িশুদ্ধ আমায় দিয়ে যান, এমন সুন্দর প্রসাদ কোথায়ও পাওয়া যায় না। কলকাতায় থাকি কোত্থেকে পাব! তাই এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়বোনা।" শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠা-মহাশয় বললেন,—"এই হাণ্ডিতে প্রায় আধমণ কণিকা প্রসাদ আছেন, পারবে তুমি খেতে?" চারুদা' লাফিয়ে উঠে বললো,—"ফুট বলের ব্লাডারের মত পেটটি পাম্প ক'রে নেবো, না ধরে পেটে ঠুসে ঠুসে দোবো; তাতে যদি আমার এখানে প্রাণান্ত ঘটে তবে নিশ্চয়ই বুঝব, ইহা আমার এক পরম সৌভাগ্য;—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ মহোৎসবে এই কাণিকা প্রসাদ পেতে পেতে দেহ ত্যাগ!—এ-অসামান্য সৌভাগ্য বহু সাধনায় ও শ্রীগুরু-কৃপায় সম্ভব। সে-শুভাদৃষ্ট আমার হবে কি?" চারুদা'র এই সব কথা শুনে সমস্ত লোকে খুব হেসে উঠলো, অদ্বৈত কাকা বলছেন, "সাবাস চারু! আমার মনের ভাবটা তুমিই ব্যক্ত করলে।" এই সব কথা শুনে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদের পংক্তি ভোজন হোলো। তারপর হাত মুখ ধুয়ে সবাই চলে গেলেন, আমরা সব পাতা পরিষ্কার করতে লাগলুম,—প্রায় রাত্রি দুইটা বেজে গেল; এখন আমরা সবাই বিশ্রাম করতে গেলাম। পরদিন সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীবাজপেটা মঠে গেলেন,—মাত্র একদিন আর থাকবেন তাই বিকেলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন, ষড়ভূজ মহাপ্রভু দর্শন ও মন্দিরাদি পরিক্রমা সমাপন ক'রে সমস্ত দেবদেবী, শ্রীগম্ভীরা, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি স্থান ও টোটা গোপীনাথ দর্শন ক'রে পরের দিন বিকেলে কটকে এলেন, ওখানে একদিন থেকে ভদ্রক হয়ে কলিকাতায় গেলেন।

তিনি কলিকাতায় তিন চারদিন থেকেই শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন কোরে আসবেন বলে মেঘলালদা', উপেনদা' (নিতাই রমণ দাস) জানকী, নন্দকাকা, ফণিকাকা, মদনদা' ও হরেকেষ্টদা'কে সঙ্গে ক'রে শ্রীনবদ্বীপ ধামে রওনা হোলেন। বিকেলে ট্রেন এসে শ্রীধামে পৌঁছল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই সমাজবাড়ীর মঠে এসে পৌঁছিলাম। রথে যাবার আগে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একবার ধাম দর্শন ক'রে যান, আবার রথের পরেও একবার আসেন। এখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসবের পরও এলেন। মঠে তখন গোপীদা', কানাইদা', বড় দয়াল দাস, নিতাই দাস প্রভৃতি ছিলেন। গোপীদা' শ্রীসখীমার অত্যন্ত অনুগত। সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা নিয়েই তাঁর জীবন কাটে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ এসেছেন,—বহু ভক্ত, কত বৈষ্ণব তাঁকে দর্শন করতে আসছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাদা মহাশয় এলেন, গদাধর দাস বাবাজী এলেন; এইরূপ কত বৈষ্ণবের দর্শন হোতে লাগল।

আমি আজও দীক্ষা গ্রহণ করিনি তবুও কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমাকে এত প্রীতি করেন! একটী অভিমান আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা আছে,—আমি যেঁচে গিয়ে কাউকে গুরুত্বে বরণ কোরবোনা। আমার সেই অভিমান আজও উন্নত শিরে হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে বের হয়ে অবধি এই অভিমানই বদ্ধমূল হইয়াছে!

যখন আমি শ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের আঙ্গিনায় ছিলাম তখন একজন সাধুকে আমি আমার সম্ভাব্য গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেছিলেন, "তোমার গুরু হবেন—শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়।" আমি তখন তাহা বিশ্বাস করিনি। কিছুদিন পরে তিনি অপ্রকট হন, তারপর আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশ্রয়ে ধন্য হই, তিনি কত স্নেহ করেন তবুও আমি আমার গো ছাড়িনি,—কাউকে নিজে

ইচ্ছে করে গুরু করবনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসে কতদিন কতজনার মন্ত্র দেওয়া দেখি, তাঁর সঙ্গে নাম করি—আজ ১ বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে ঘুরছি; কোনদিনও তিনি ঘুণাক্ষরে আমাকে মন্ত্র নিতে বলেন না।

আজ সকালে গঙ্গাস্নানে চলেছি, একজন উন্মাদ পাগল একটা এঁটো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। সে গঙ্গা থেকে আসছে, চড়ায় আমার সঙ্গে দেখা হোলো। তাঁর মাথার হাঁড়িটী সে আমায় দেখে নামাল,—একমাত্র কৌপীন পরা; লজ্জা শরম কিছুই নেই,—বললো—দে ভিক্ষে দে, পয়সা দে। আমার কাপড়ের খোঁটে চারিটি পয়সা বাঁধা ছিল, তাই খুলে তাঁকে দিলাম। সে ভারি প্রসন্ন হয়ে বলল, "পাগল বলে আমায় উপহাস করিসনে; আজ তোর দীক্ষা হবে। ঠিক বলছি মিথ্যে নয়, এই বলে পাগল হাসতে হাসতে চলে গেল।" আমি ভাবলুম দুর্ পাগলের কথা আবার সত্যি হয়! তারপর আমার দীক্ষা নিতে কোন ইচ্ছাই হয়না, আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে এতদিন আছি, কই তিনিতো কোন দিনই আমায় বলেন না!

যাক, আমি সকাল সকাল স্নান ক'রে এলাম। খানিক পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও স্নান আহ্নিক সেরে নিলেন। বহু জনার মন্ত্র হবে তাই শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের ঘরে গিয়ে তিনি বসলেন। সবাই মন্ত্র নিতে ঘরে ঢুকল। আমি অনেক বার যেমন তাঁর দীক্ষা দেওয়া দেখি, নাম করি, সেদিনও তেমনি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। দীক্ষা দেবার আগে প্রার্থনা ক'রে নাম ধরলেন। নামের ধ্বনিতে যেন ছাদ ফেটে যাচ্ছে। নিতাই রমণদা', মদনদা', জানকীদা', দয়ালদা' আরো কত লোক নাম কোচ্ছেন। নামের রোল এমন উঠেছে যে তা বলে বোঝান যাবেনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এক এক জনকে দীক্ষা দিচ্ছেন

আর সে পাশে গিয়ে বসছে, আবার আর একজন আ'সল তাকে দীক্ষা দিলেন। এমনি ভাবে সেদিন বোধ হয় জন ১৫ মন্ত্র দীক্ষা নিলেন; দয়াল দাসকেও মন্ত্র দিলেন। আমি উপরে তাকিয়ে দেখছি যে লোহার কড়ি দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছে,—কাপড় ভিজে গেছে, ঘরের মেঝে সব ভিজে, যেখানে বসে আছি সেস্থানও ভিজে। আমি ভাবছি—একি ব্যাপার! লোহার কড়ি কেন ঘামবে! একটা জানলাও তো খোলা আছে; গরমেই বা এ রকম হবে কেন? এইসব ভেবে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে অঝোরে তাঁর অশ্রুজল পড়ছে; এক একবার অশ্রু মুছছেন আবার মন্ত্র দিচ্ছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঐ কাঁদা-বদন দেখে আমিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেছি। অজ্ঞাতসারেই কাঁদছি। সমস্ত লোকের মন্ত্র দেওয়া হয়ে গেলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ ক'রে উঠে যান কিন্তু সেদিন উঠছেন না, কেবল কাঁদছেন, আমিও কাঁদছি তাঁর মুখ পানে তাকিয়ে।

সে যে কি করুণা আর্ত্তি ভরা মুখমণ্ডল তা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারব না। এক একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন আর আকুল ক্রন্দন! চোখের জল ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়ছে। হঠাৎ তাঁর কমল-করুণ-অভয় হস্ত দুখানি আমার দিকে প্রসারিত ক'রে আমায় যেন কোলে তুলে নিতে চাইছেন! আর অমনি উপেনদা', মেঘলালদা', আমায় ধরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে দিলেন; আমি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলুম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় কোলে ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে, প্রায় দশ মিনিট খুব কাঁদলেন, তারপর গলা জড়িয়ে ধরে—জয় শ্রীরাধারমণ, জয় শ্রীরাধারমণ—বলে আমার দুই কর্ণে মন্ত্র দান করলেন; আমি অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর কোলে ঢলে পড়লাম তারপর আর আমার কোনই হুস ছিল না। তারপর কি হয়েছে কিছুই জানিনা। চার দিন নাকি এই রকমই আমার কেটেছে। আমার পরশের

কাপড়ও নাকি ঠিক ছিল না। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমাকে খাইয়ে দিতেন, কেউ কাপড় পরিয়ে দিতেন, কেউ স্নান করাতেন। দু'দিন পরে প্রকৃতিস্থ হোলাম। দেখছি সামনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমি উঠে আবার তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বুকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর অত ব্যাকুলতা কমলো। সর্ব্বদাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকি, তাঁর আদর যত্ন, হাসি ও ভালবাসাতে আমায় ব্যাকুল করে ফেলেছে। গলা জড়িয়ে ধরে দাদা বলে খুব কেঁদে ছিলাম এবং বলেছিলাম—মনে মনে তোমায় দাদা বলেই জেনেছিলাম কিন্তু আজ যে উল্টো হয়ে গেল। তখন তিনি হেসে বলেছিলেন,—"এই ভাবই তো ভাল, তবে অন্তরে রাখতে হয়, বাহিরে দেখাতে হয় মান মর্য্যাদা।"

আমি গিয়ে শ্রীসখীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলাম, তিনি বুকে টেনে কত আদর করে বললেন,—"তোমার দীক্ষা হয়েছে বুঝি!" আমি বললাম,—"হাঁ।" আমি আবার শ্রীবিহারী কাকা, শ্রীবিজয় কাকা শ্রীবসন্ত কাকাকে ও সমস্ত ভাইদের দণ্ডবৎ প্রণতি করলাম। রোজ সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দর্শনে বের হই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হরি সভার গৌর, নিতাইয়ের বাড়ী, ভজন কুটীর সব দর্শন ক'রে আসি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাদা মহাশয় বললেন,—"তুমি সন্ধ্যার পর তোমার বাবাজীর সঙ্গে আমার আশ্রমে প্রসাদ পেতে যেয়ো।" দাদা মশায় আমায় খুব আদর করতেন, তাই সন্ধ্যার পর আরতি দর্শন করে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসি। ছয়দিন ধামে রইলাম।

কয়দিন পরেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় এলেন। কলেজ স্কোয়ারে ললিত মোহন ঘোষ নাম-করা একজন জমিদার, আবার এডভোকেট তিনি। তাঁর বাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করবেন, এই খবর দিলেন তাঁকে। তিনি এসে সব ঠিক

করে গেলেন,—কাল সন্ধ্যার সময় সেখানে কীর্ত্তন হবে। পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীললিতবাবু গাড়ী পাঠালেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঠাকুর ও খোল করতাল নিয়ে সদলবলে এসে তাঁর বাড়ীর দোতলায় উঠে গিয়ে একটি আসনে বসলেন। তাদের প্রকাণ্ড বাড়ী, যেখানে কীর্ত্তন হবে সে ঘরটাও খুব বড়।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আসামাত্রই শ্রীললিত বাবু ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন সবাই খুব ভক্তি ভরে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। শ্রীললিত বাবুর পুত্র গোবিন্দবাবু তখন খুব ছোট, বোধ হয় দশ বারো বৎসর বয়স হবে। আবার শ্রীনসুবাবু ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যবাবুকেও দেখলাম। তাঁরা খুব ভক্তি ক'রে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। শ্রীল বাবাজী মশায়ের সমস্ত পারিষদ বৃন্দ কীর্ত্তনের আসরে এসে বসলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনতে সেদিন প্রায় এক হাজার লোক এসেছেন। শ্রীললিত বাবু বললেন,—কীর্ত্তনের শেষে সবাই প্রসাদ নিয়ে যাবেন।

তারপর কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। প্রায় ১ ঘণ্টা—ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম—এই নামই শুধু শ্রীপাদ কত মধুর সুরে গাইছেন! নাম-সংকীর্ত্তনে কীর্ত্তন-আসর শ্রীবৃন্দাবনের রাসমণ্ডলের আকার ধারণ করেছেন—ভাবাবেশে সকলেই দেখছেন—শ্রীরাসমণ্ডলে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণ-কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে, আবার কৃষ্ণও বহু মূর্ত্তি ধারণ ক'রে গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে নৃত্য করছেন; হরে কৃষ্ণ হরে রাম—এই নাম কত সুরে কত ছন্দে শ্রীপাদ গাইছেন! নাম ও নামী যখন অভেদ তখন এ-অনুভব মিথ্যা হোতে পারেনা। কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীঅঙ্গ সব ভাবে বিভাবিত হয়ে পড়েছেন। তিনি অশ্রু, কম্প, পুলক, হাসি প্রভৃতি দিব্যভাবে বিভাবিত হয়ে পড়েছেন! তারপর ভাব সম্বরণ ক'রে, নাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।

"জপ—হরে কৃষ্ণ হরে রাম। এই কলিযুগের মহামন্ত্র, জপ—হরে

কৃষ্ণ হরে রাম। এই নাম বই আর সাধন নাইরে। অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দ নন্দন পেতে, এই নাম বই আর সাধন নাইরে"—ইত্যাদি। এই নাম-মহিমা-কীর্ত্তন ছাপান হয়েছে—পাঠ করলে সবাই বুঝবেন নামের মহিমা কি ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। কত কত সার সিদ্ধান্ত তাতে রয়েছে। অনেক বড় নাম-মহিমা-কীর্ত্তন—আমি তাই একটু দিগ্‌দর্শন করেছি মাত্র। সে বিরাট কীর্ত্তন সমূহের কতটুকুইবা বর্ণনা করব!

যাক আমি একবার কীর্ত্তনের চারিধারে দৃষ্টি ক'রে দেখেছি,—সমস্ত লোকই শ্রীবাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনে কাঁদছেন। আমিও এক একবার কেঁদে ফেলছি। মনে ভাবছি, বুঝি কান্নার বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ শ্রীললিতবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ল। অতি সুন্দর ধপ্‌ধপে তাঁর গায়ের রঙ। সুন্দর লম্বা চওড়া শরীর। তাঁর মুখ মণ্ডল লাল হয়ে গেছে; অজস্র ধারে চোখের জল পড়ছে। তিনি অত বড় লোক, মানী লোক, তাঁর এত ভক্তি নামেতে! আমি অবাক হয়ে গেলাম। শ্রীনসুবাবু ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যবাবুও চোখের জলে ভাসছেন। কত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকও এসেছেন। সবাই সেদিন শ্রেণী নির্বিশেষে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনে চোখের জল না ফেলে উঠতে পারেন নাই।

যদিও অনেক দিনের কথা তবুও সমস্তই ছবির মতন আমার মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। চারুদা', যুগলদা', বলাইদা', শ্রীঅদ্বৈত কাকা, মাখনদা', নন্দদা', শরৎদা' প্রভৃতি আসে পাশে কীর্ত্তন কোচ্ছেন। কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীপাদের চোখে যেন অশ্রু-জলের বর্ষা নেমেছে। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। মধ্যে মধ্যে মস্তক ঘূর্ণিত ও কম্পিত হোচ্ছে, আবার ভাব সম্বরণ ক'রে শান্ত হয়ে পদ গাইছেন। অদ্বৈতকাকা অনবরত গামছা দিয়ে চোখ মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। কীর্ত্তনের শেষে যে

আর্ত্তি ব্যাকুলতা দেখেছি তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। কেবল বিরহের কথাই বলছেন,—"কিছুই দেখতে পেলাম নারে। গৌর লীলা তার গণের খেলা, কিছুই দেখতে পেলাম নারে। তোমরা সবে কোথায় গেলে আমাদের কাল কলির কবলে ফেলে, তোমরা সবে কোথায় গেলে!" সে যে কি আর্ত্তি-ভরা কীর্ত্তন, কত দরদ-ভরা কথা, তা আমি কতটুকুই বা বর্ণনা করব! তাঁর ছাপান কীর্ত্তন পাঠ করলেই বুঝবেন এই কথার ভিতর একটুও অতি রঞ্জিত নাই।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হোলো। এই পাঁচ ঘণ্টা সবাই নীরব নিঝুম হয়ে বসে কীর্ত্তন শুনেছেন, আর নীরবে অশ্রুজল ফেলেছেন! কীর্ত্তন শেষ হোলো; শ্রীললিতবাবু, শ্রীনসুবাবু ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যবাবু এসে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। শ্রীললিতবাবু একটী চেয়ারে শ্রীল বাবাজী মশায়কে বসিয়ে তিনি নীচে বসে কথা বার্ত্তা বলতে লাগলেন। আমার মনে পড়ে ললিতবাবুর ভাই, বোধ হয় তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—অতি সুপুরুষ, দেখলে উদ্দীপন হয়—তিনিও সেদিন কীর্ত্তন শুনেছেন, তিনিও শ্রীপাদের কাছে বসলেন।

তারপর নীচের তালায় গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো এবং সবাইকে প্রসাদ পেয়ে যাবার জন্য তাঁরা অনুরোধ করলেন। বিরাট সমাবেশ—লুচি তরকারী হয়েছে, বহুলোক বসে গেছে, বোধ হয় প্রসাদ কুলোবে না; তাই ললিত বাবু তাঁর ম্যানেজারকে সেই গভীর রাত্রে দোকানে আটা ঘি ময়দা আনতে পাঠিয়ে দিলেন। দোকানদার দোকান বন্ধ ক'রে শুয়েছেন, তাকে ডেকে উঠিয়ে ময়দা ঘি সব নিয়ে এসে তখনই আবার লুচি ভেজে তুলসী দিয়ে সবাইকে দেওয়া হল। সেদিন ৩ জন পূজারী এনে রসুই করান হয়। একটা বাজল, সবাই পরমানন্দে প্রসাদ পেয়ে বাড়ী চলে গেলেন। শ্রীললিতবাবু আমাদের গাড়ী ক'রে ও তার নিজের মোটরে শ্রীল

বাবাজী মহাশয়কে দর্মাহাটা মঠে পাঠিয়ে দিলেন।

এই ললিত বাবুর কথা আমি মোটেই ভুলতে পারি না;—আমাকে বড় প্রীতির চোখে দেখেছিলেন। আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দেওঘরের শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য ছিলেন কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের উপর তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। শ্রীজগন্নাথের রথের সময় কতবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ললিতবাবু ও আমি একসঙ্গে রথের দড়ি ধরে রথ টেনেছি। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনে কতবার শ্রীললিত বাবুকে কাঁদতে দেখেছি,—চোখে জল পড়ছে, মুখ লাল হয়ে গেছে তাঁর; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীপাদের কীর্ত্তন শুনছেন তিনি, সেই সমস্ত কথাই আমার মনে আছে। তিনি অতি সুন্দর, দীর্ঘাকৃতি ও গৌর বর্ণ পুরুষ ছিলেন। অত বড় মানী লোক, ধনী লোক তিনি, তবুও তাঁর এতটুকুও অভিমান আমি কোনদিন দেখিনি। আমি তখন মাত্র আঠার বৎসরের একটী ছেলে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকি, তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, নাম করি, তাতেই তিনি আমায় শ্রদ্ধা করতেন এমনকি অনেক সময় ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করে ফেলতেন। তাঁর বয়স তখন অনুমান চল্লিশ বৎসর হবে। আমিও তাঁর দণ্ডবৎ দেখে, নিজেও তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে ফেলতাম। আমাকে হাতে ধরে উঠিয়ে জোড় হাতে বলতেন,—আপনি ব্রাহ্মণ সাধু, আমায় কেন দণ্ডবৎ করেন? ছি! অমন আর করবেন না,—এমনই তাঁর দৈন্য ছিল। তাঁর প্রীতির কথা আমার মনে গেঁথে আছে।

যখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবা নিয়ে শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠা মহাশয় থাকতেন, আর শ্রীশ্যাম জ্যাঠা মহাশয় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে সর্ব্বদা পেছনের ঘরটীতে থাকতেন তখন তাঁদের কাছে শ্রীললিতবাবু তাঁর স্ত্রী পুত্রকে ও আরোও অনেককে নিয়ে আসতেন। খুব মনে পড়ছে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা রেণী আসতেন। শ্রীশ্যাম জ্যাঠা

মহাশয় ও শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয়ের কাছে বসে কত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁরা সৎ কথা শুনতেন। একদিন দেখলাম শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠা মহাশয়ের হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে ললিতবাবু বললেন,—"এই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে, বহু সাধু বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ ক'রে, প্রসাদ পাওয়ালে আমার খুব তৃপ্তি হবে।" শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় বললেন,—"বেশতো আমি কালই ঠাকুরেব উত্তম উত্তম ভোগ দিয়ে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমর্পণ ক'রে সবাইকে দেবো।" অমনি শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ক'রে এলেন। খাজা, গজা, জগন্নাথ বল্লভ, মুণ খুরমা ও কণিকা প্রসাদের ব্যবস্থা করলেন। আবার বহু রকম ভোগ রান্না ক'রে শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথকে নিবেদন ক'রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমর্পণ কোল্লেন।

শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় অতি উত্তম রসুই করতে জানতেন। আমার বেশ মনে আছে—ঘৃত সিক্ত অন্ন অর্থাৎ ঘি ভাত, অতি সুন্দর পরমান্ন আর রসগোল্লা ও পানিতোয়া মঠেই তৈরী করলেন। এক হাজার লোকের মত সমস্ত জিনিষ তৈরী হয়েছে। চারি সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হয়ে মঠে এসেছেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ এলেন আবার ওখানে ঠাকুরের ভোগও রাত্রি আটটার সময় হয়ে গেল। সবাইকে প্রসাদ পাবার জন্য ডাকলেন, পাতা, জল, নুণ ও একটী করে লঙ্কা, প্রত্যেকের পাতে দিয়ে মহাপ্রসাদ দিতে লাগলেন। ঠাকুরের প্রসাদও দিতে লাগলেন! মঠে ছানার অতি সুন্দর রসা হয়েছে তা দিচ্ছেন, আবার শ্রীজগন্নাথের ডাল, মৌর, ব্যাসর দিচ্ছেন, কণিকা প্রসাদও দেওয়া হল, তারপর মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে রসগোল্লা ও পানিতোয়া যে যত চায় ঢেলে দিতে লাগলেন ;—চাইলে আর না-করা নেই। তিনি মানুষকে প্রসাদ পাওয়াতে বড় ভাল বাসতেন তাই তৃপ্তি ক'রে সমস্ত বৈষ্ণবকে প্রসাদ পাওয়ালেন। ললিত বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন,—এই সমস্ত বিবিধ উত্তম প্রসাদ অঠেল করে দিচ্ছেন দেখে আনন্দে

হৃদয় তাঁর ভরে গেছে। বৈষ্ণবদের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল।

তারপর তিনি ললিতবাবুর আত্মীয় স্বজনকে বসিয়ে, নিজে মঠের ভক্ত নিয়ে প্রসাদ পেলেন। সবার ১০ টার ভিতরই প্রসাদ পাওয়া শেষ হয়ে গেল। ললিতবাবু বললেন,—"মাত্র ১ হাজার টাকা দিয়েছি, তাতেই এমন সুন্দর সুন্দর প্রসাদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিলেন! নিশ্চয়ই আরো অনেক টাকা আপনার খরচ হয়েছে। এক হাজার টাকায় কখনও এত লোককে, এমন সুন্দর করে প্রসাদ পাওয়ানো যায় না। আমি কাল সকালে টাকা নিয়ে আসব।" এই বলে তিনি নিজের বাসায় চলে গেলেন। পরদিন আমি শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, শ্রীশ্যাম জ্যাঠামহাশয়ও আছেন। দুজনে কথাবার্ত্তা বলছেন, এমন সময় শ্রীললিতবাবু তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সঙ্গে ক'রে এসে তাঁদের দণ্ডবৎ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,— "কত বেশী টাকা খরচ হয়েছে বলুন, আমি দিয়েদি।" আমি টাকা সঙ্গে করে এনেছি।" অমনি শ্রীগোবিন্দ জ্যাঠামহাশয় হেসে বললেন, —"ঐ টাকা থেকেই ৩০৲ টাকা বেঁচেছে, এই ৩০৲ টাকা গ্রহণ করুন, বৈষ্ণব সেবা ক'রে ৩০৲ টাকা বেঁচে গেছে, আমরাতো বৈষ্ণব সেবার টাকা হজম করতে পারি না। আমরা যে কাঙ্গাল ভিখারী।"

তাঁর এই কথা শুনে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বললেন,—"এরূপ ভাবে এক হাজার লোককে এমন সুন্দর ক'রে প্রসাদ পাওয়াতে আমরা দুই হাজার টাকার কমে কখনও পারতুম না। আপনি কি ক'রে করলেন! আবার ঐ টাকা থেকে ৩০৲ বেঁচেছে তা-ও আমায় ফিরে দিতে এসেছেন!" তাঁর এই উদার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন,—"এই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য আমি একটী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছি, আপনি আমায় সেবার সৌভাগ্য দিন।" তিনি বললেন,—"আপনাদের মঠ, আপনাদের ঠাকুর, শ্রীহরিদাস ঠাকুরও আপনাদের। আমাদের যেমন অধিকার, আপনারও তেমনি অধিকার আছে।" এই কথা শুনে তিনি পরমানন্দিত হয়ে

একটা সুন্দর বাড়ী ক'রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য তাহা দান করেন। বাড়ীটির ভাড়া প্রায় ১০০৲ হবে। মঠের পেছনে এক পাশে ঐ বাড়ীটি এখনও আছে;—আরও নিজের ষ্টেট হতে ৮০৲ টাকা করে প্রতি মাসে সেবার জন্য আসবে বলে, তিনি এই নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

এখনও সেই বাড়ীটি আছে ও প্রতিমাসে ঐ সেবার টাকা আসছে। তিনি বহুদিন অপ্রকট হয়ে গেছেন কিন্তু তাঁর প্রীতির দান, তাঁর এই সেবার কীর্ত্তি এখনও রয়েছে! জয়পুর থেকে সুন্দর শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ নিয়ে এসে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেবা করতেন। শ্রীললিতবাবু দেহ রাখবার পর, ঐ শ্রীবিগ্রহ তাঁদের সেবা করবার অসুবিধা হোতো তাই ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীবরাহনগর পাঠ বাড়াতে এখন রয়েছেন। মঠের সাধুরাই সেবা করেন, সেবার জন্য প্রতি মাসে গোবিন্দ বাবু টাকা পাঠিয়ে দেন এবং মধ্যে মধ্যে এসে দর্শন করেন ও প্রসাদ পেয়ে যান। এখনও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলে তাঁর প্রীতির কথা ও তাঁর সেই গৌরবর্ণ সুঠাম মূর্ত্তি মনে জেগে ওঠে। প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, তিনি আমাকে শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসের একটী সুন্দর চিত্রপট দিয়েছিলেন। বহু দিন আমার কাছে সেই চিত্রপট ছিল, তারপর খুলনার আর, সি, বোসের স্ত্রী আমার কাছে সেই চিত্রপট খানা চান, তাঁকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

একদিন আমি ললিত বাবুর সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারের বাড়ীতে দেখা করতে যাই। অনেকক্ষণ কাছে বসিয়ে কত গল্প ক'রে বললেন,—"আমার কাছে আপনি কিছু নিন।" আমি বলিলাম,—"আমার দরকার তো কিছুই দেখি না, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকি, তিনি খেতে দেন, পরতে দেন, আমার আর কিছু চাইবার নেই।" তবুও পীড়াপীড়ি ক'রে বললেন,—"যা হয় একটা কিছু নিন, টাকা পয়সা কাপড় যা হয় বলুন,—তাই আপনাকে দিয়ে ধন্য হব।" খুড্ড তিনি ধরে বসলেন, তাই আমি বললাম—"উপরে যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস

মূর্ত্তিপট টাঙ্গান রয়েছে ঠিক ঐ রকম একটু ছোট চিত্রপট আমায় আপনি দিন। ঐ চিত্রপট আমি খুব ভালবাসি।” আমি তখন ছেলে মানুষ, আর কিছুই আমার চাইবার নাই। তাই ঐ কথা বলেছিলাম,—তিনিও আমায় ঠিক ঐ রকম শ্রীমহাপ্রভুর চিত্রপট একখানা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রীতির কথা, প্রীতির ব্যবহার আমি এখনও ভুলিনি, ভোলাও যায় না।

এইরূপ পরমানন্দে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে,—শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর সঙ্গ-সুখ-সৌভাগ্য দান ক'রে, তাঁর কৃপাশ্রয় দিয়ে আমাদের কাছে রেখেছেন। দেশ বিদেশে তিনি কীর্ত্তন করে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি ; কত আনন্দ আমাদের! ভেবেছিলাম আমি এ-আনন্দ এখন চিরদিনই পাব! তখন মনে এমন চিন্তাই আসত না যে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে আমরা কোনদিন দেখতে পাব না। মনে হতো—তিনি চিরদিনেরই বন্ধু, তাঁকে আমরা কখনও হারাবনা বা তিনি আমাদের ছেড়ে কখনও থাকতে পারবেন না,—এই বিশ্বাস তখন আমাদের বদ্ধমূল ছিল, এমনই তাঁর ভালবাসা! অহর্নিশ তখন তাঁর মধুময় সঙ্গে আমাদের দিনগুলো কাটত।

বহু দিন হল। একদিন ধর্ম্মহাটার মঠে আমি বসে আছি—হেতমপুরের রাজা শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে সদল বলে আহ্বান করেছেন, তাঁর মধুময় নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনবার জন্য। দুবরাজপুরে নেমে হেতমপুর যেতে হয়। সিউড়ীতে তাঁদের একটা বাড়ী আছে। তখন সিউড়ীর ভিতর হেতমপুরের রাজারই প্রভাব খুব বেশী। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্বান গ্রহণ করলেন।

রাজার ম্যানেজার এসে আমাদের জন্য একটী গাড়ী রিজার্ভ করেছেন। আমরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ৭৫ জন লোক যাচ্ছি। শ্রীঅদ্বৈত কাকা, ফণিকাকা, নন্দকাকা, বিহারীকাকা, প্রিয়নাথকাকা, বিশ্বরূপদা', মদনদা', হরেকেষ্টদা', চারুদা', যুগলদা', বলাইদা', তিনুদা' এই রকম আমরা বহুজন তাঁদের ওখানে বিকেলে

ষ্টেসনে এসে পৌঁছলাম। রাজা মহিমারঞ্জন বাবুর একান্ত অনুরোধে আমরা তাঁদের রাজধানী হেতমপুর যাবো। দুবরাজপুর স্টেসন থেকে ৩ মাইল হেতমপুর। বড় সুন্দর জায়গা। তাঁদের গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে শ্রীমহিমারঞ্জন বাবু তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে সঙ্গে ক'রে ষ্টেসনে এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখে দণ্ডবৎ ক'রে বললেন,—"আমার বড়ই দুর্ভাগ্য, এখনই আমায় কলকাতায় রওনা হতে হবে! আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গাড়ী রিজার্ভ হয়ে গেছে, আজ সন্ধ্যাতেই রওনা হব। আপনাদের জন্য আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে রেখে এসেছি, আপনারা গিয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তন করুন। ওখানে একজন পরম ভাগবৎ কবিরাজ আছেন! প্রফেসর বাবুরাও খুব ভক্তিমান কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আপনার সঙ্গ হয়তো পাবো না। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভীষণ খারাপ।"

এই কথা শুনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু গম্ভীর হয়ে বলছেন,—"আমরা এলাম, আপনি চলে যাচ্ছেন! আপনার প্রীতিতেইতো আপনাদের রাজবাড়ী এসেছি নাম সঙ্কীর্ত্তন করতে, কিন্তু আপনি চলে যাবেন কলকাতায়! আমার মন বাধা দিচ্ছে। আচ্ছা, আজ রাত্রিটা আপনি দেখুন, হয়ত আপনার স্ত্রী নিতাইচাঁদের কৃপায় সুস্থ হয়ে যাবেন। গাড়ী রিজার্ভ হয়েছে, ইচ্ছে করলে টাকাও ফিরে পাওয়া যাবে। যদি আজ রাত্রিতে সুস্থ হয়ে না ওঠেন,—বেশ কালকেই যাবেন।" শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথায় আর তিনি আপত্তি করলেন না; যাওয়া স্থগিত রাখলেন। তিনি ফিরে চলে গেলেন বাড়ীতে। আমাদের জন্য তাঁর নিজেদের ৪ খানা মোটর আর দশখানা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই গাড়ীতে উঠলাম। সন্ধ্যার সময় তাঁদের গেষ্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম। সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রায় দুই শত লোক ধরে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি।

কম্পাউণ্ড সব দেয়াল দিয়ে ঘেরা;-সুন্দর ফুলের বাগান। সুন্দর ৩টি বড় বড় পুকুর। প্রকাণ্ড ময়দান। স্থানটিতে এসে আমাদের মন ভারি প্রসন্ন হোলো। আমাদের সেবা যত্নের জন্য তাঁদের ম্যানেজারবাবুকে সর্ব্বদা সেখানে থাকতে বলেছেন। সাত আট জন চাকর রেখেছেন। শ্রীমহিমারঞ্জন বাবুর পিতা পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাই শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবারই সেবার জন্য আলাদা আলাদা ষ্টেট করে দিয়েছেন! অতি সুন্দর সেবার পরিপাটি। সাধু বৈষ্ণব আসলে তাঁদের সেবার কোন ত্রুটীই হোতে দেন না। যতদিন ইচ্ছা তাঁরা থাকবেন, তাঁদের প্রসাদ পাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। তাই প্রায়ই সেখানে বৈষ্ণবদের আগমন হয়। রাত্রে আমরা সবাই মিলে ঐ গেষ্ট হাউসে কীর্ত্তন করলাম। ঠাকুরের আরতি শেষ হয়ে গেল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মধুদা' প্রভৃতি ৪ জনা পূজারী এসেছেন। শ্রীফণি-কাকা সব সেবার ভার নিয়েছেন। তিনি বলছেন,—আর অমনি সব জিনিসপত্র গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছেন সব। একটি ঘর চাল, ডাল, আটা, ঘি, ময়দা বোঝাই ক'রে আগে থেকেই রেখেছেন। ঠাকুরের ভোগ রান্না হয়ে গেল, ভোগও হয়ে গেল। তখন রাত্রি ১২টার সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই বসে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ পেয়ে সবাই বিশ্রাম করতে গেলেম।

সে দিন বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি, শ্রীল বাবাজী মহাশয় বারান্দা দিয়ে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। হাতে মালা জপ কোচ্ছেন আর এক-একবার—জয় শ্রীরাধারমণ, জয় নিতাই—বলে জোরে হুঙ্কার দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পেছনে চারুদা' বলাইদা' ও আমি রয়েছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও হেঁটে বেড়াচ্ছেন আমরাও পেছনে রয়েছি; কোন কথাই কেউ বলছে না। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখ গম্ভীর দেখে আমরাও কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না। হঠাৎ

আমাদের দিকে ফিরে বলছেন,—"দেখদিখি, আমাদের নিয়ে এলেন রাজা মহিমারঞ্জন, তাঁরই খুব প্রীতি অথচ আজই ওঁর স্ত্রীর ভীষণ অসুখের জন্য গাড়ী রিজার্ভ হয়ে গেছলো ; আমি যেতে দিলাম না ; ষ্টেসন থেকে ফিরে এলেন ; দেখি ঠাকুর কি করেন !" এই কথা বলে, শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম কোত্তে গেলেন। আমরাও গিয়ে যার যার আসনে শুয়ে পড়লাম।

সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠলেন, শৌচাদি সেরে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রভাতি কীর্ত্তন শ্রীঅদ্বৈত কাকা করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় মালার ঝোলা হাতে ক'রে আঙ্গিনায় ঘুরে ফিরে নাম জপ কচ্ছেন। আমরা ৫।৭ জন তাঁর পেছনে সঙ্গে বেড়াচ্ছি। বেলা তখন সকাল ৭টা হবে।

হঠাৎ দেখি একটী মোটর এসে থামল। দেখিকি, রাজা মহিমারঞ্জন, তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যা গাড়ী থেকে নেমে—সবাই হেঁটে এসে, বড় ভক্তি ভরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ করলেন। রাজা মহিমারঞ্জন হেসে বললেন,—"আমার স্ত্রী আজ হঠাৎ একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে ! এই যে হেঁটে এসে আপনাকে দণ্ডবৎ করল। কাল সে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিল ; ৩ জন ডাক্তার নিয়ে কাল কলকাতায় যাবার কথা ছিল, কেবল আপনার কথায় ফিরে এলাম। ডাক্তার আজ সকালে এসে বলছেন,—'আপনার স্ত্রী আজ একেবারে সুস্থ, তার কোন অসুখই নেই'।" রাজা বলছেন—"নিশ্চয়ই আপনার দয়ায় ভাল হয়ে গেছে।" এই বলে তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরে কেঁদে ফেললেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"সব নিতাই চাঁদের করুণা। তিনি সব করতে পারেন। 'ইচ্ছে করলে বিধির কলমও উল্টিয়ে দিতে পারেন।" রাজা বললেন,—"আমিতো নিতাই চাঁদকে দেখিনি, আপনাকে দেখলাম এবং আপনারই অহৈতুক করুণায় আমার স্ত্রী ভাল হয়ে গেল।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—

"আমার শ্রীগুরুদেবের কথাতো শুনেছেন, তিনি নাম ক'রে মড়া বাঁচিয়েছেন, বৃক্ষ নাচিয়েছেন। আপনাদের কথা তাঁকে জানিয়েছি, তাই তিনিই কৃপা করেছেন নইলে আমাদের কি শক্তি আছে ?" কিছুতেই রাজা এ-কথা স্বীকার করলেন না। আমি প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি কিন্তু কোন দিনই তাঁর মুখে শুনতে পাইনি,—এ ভাল কাজ আমি করেছি বা আমা হতে হয়েছে :—এইরূপ প্রতিষ্ঠার কথা কখনও তাঁর মুখে শুনিনি।

রাজা মহিমারঞ্জন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সেবা ও যত্নের ভার নিজেই নিয়ে দেখাশুনা করতে লাগলেন। ফণিকাকার সঙ্গে তাঁর খুব সখ্য প্রীতি হয়ে পড়ল। আজ রাজবাড়ীতে শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহের সামনে শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রভাতী কীর্ত্তন করবেন তাই তিনি সদলবলে সেখানে এসে পৌঁছলেন; সকাল ৬টার সময় হতে প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ হল। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঠিক সামনেই রাজা মহিমারঞ্জন ও তাঁর ভাইরা বসেছেন আর চারিদিকে বহু শিক্ষিত লোক বসেছেন। রাজা মহিমারঞ্জনের দুই কন্যা তাঁর কাছেই বসেছেন। চিকের আড়ালে রাণীরা সব বসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রভাতী সুরে নাম ধরলেন,— "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌর চন্দ্র। প্রাণ ভরে বল ভাইরে,—বড় প্রাণারাম নাম ভাইরে, বল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এ নাম অমৃত হোতেও পরামৃত, বড় প্রাণ জুড়ান নাম ভাইরে।" বলতে বলতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, প্রায় পাচ মিনিট কেবল কাঁদছেন। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সকল শরীরে প্রকাশ হতে লাগল। এক একটা আঁখের দিচ্ছেন আর ব্যাকুল হয়ে পড়ছেন। চারুদা', বলাইদা', অদ্বৈতকাকা সবাই অঝোরে ঝুরছেন। সামনে রাজারাও কাঁদছেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হোতেই খুব ব্যাকুলতা আরম্ভ হল।

কত কত আঁখর দিচ্ছেন তা বলে কেউ শেষ করতে পারে না। তাঁর প্রভাতী কীর্ত্তন ছাপান হয়েছে পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন কি সুন্দর সদাস্বতঃস্ফূর্ত্ত কীর্ত্তনাবলী। ঘণ্টা খানেক পরে দেখছি সব লোক অঝোরে ঝুরছে। চিকের ভিতর থেকে মেয়েরাও সব কাঁদছে। এক-এক সময় যেন পুত্র শোকে অভিভূত মর্ম্মন্তুদ কান্নার মত শব্দ আসছে। আমি পেছনে বসে কখনও কখনও নাম কচ্ছি তাঁর সঙ্গে, আবার চারিদিক তাকিয়ে দেখছি—সবাই কেবল চোখ মুছছে, রাজা মহিমারঞ্জনের চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে।

সেদিন যে কীর্ত্তন হয়েছে, সে কীর্ত্তন শুনে সবারই যা অবস্থা হয়েছিল তা আমি বর্ণনা ক'রে উঠতে পারবোনা। একজন খুব বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক-একবার ব্যাকুল চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠছেন, তাঁর চোখের জলের বিরাম দেখিনি। রাজাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও সব অঝোরে ঝুরছে, কীর্ত্তন সেদিন শেষ হোলো ঠিক বেলা ৩টার সময়। এত অধিক সময় প্রভাতী কীর্ত্তন আমি আর কোনদিনও শুনিনি, এই দীর্ঘ নয় ঘণ্টা শ্রীল বাবাজী মহাশয় এক আসনে বসে কীর্ত্তন করেছেন। কীর্ত্তনের সে-যে কি প্রভাব তা যে দেখেছে সেই বুঝতে পারবে। গৌর হরি হরিবোল—বলে কীর্ত্তন শেষ হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন তারপর দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে একটু সরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজারা, রাণীরা, ছেলে মেয়েরা সব এসে দণ্ডবৎ করলেন এবং রাজা মহিমারঞ্জন তাঁর দুই মেয়ে সঙ্গে ক'রে একটী বড় মোটর গাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বসিয়ে গেষ্ট হাউসে এসে পৌঁছলেন। একটু বসার পর শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তেল মাখাতে লাগল তাঁর সেবাইতরা। শ্রীল বাবাজী মহাশয় স্নান ক'রে আহ্নিকে বসলেন। আজ রাজবাড়ীতেই শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হয়েছে, সবাই সেখানে গিয়ে

প্রসাদ পেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও গিয়ে প্রসাদ পেয়ে প্রায় ৫টার সময় ফিরে এসে বিশ্রাম করলেন। সেদিন রাজারাও ঠাকুরের সামনের আঙ্গিনায়, আমাদের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন, সেদিন কোন অভিমানই তাঁদের আর ছিল না। ৩ খানা মোটর আমাদের আসা যাওয়ার জন্য ওখানে সর্ব্বদা থাকত।

আজ আবার সন্ধ্যার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হবে। শ্রীল বাবাজীমহাশয় একটু বিশ্রাম ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়ে আরতি দর্শন করলেন তারপর মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে নাম কীর্ত্তন করলেন। রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত নাম হোলো। তারপর প্রসাদ পেয়ে সবাই রাত্রি ২॥ টার সময় এসে বিশ্রাম করলেন। পরদিন সকালে রাজারা এলেন, তাঁদের খুব সাধ তখনই চব্বিশ প্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন করবার। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আদেশ হোলো শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতেই নাম সঙ্কীর্ত্তন হবে।

তিনি শ্রীনরোত্তম কাকার উপর আদেশ করলেন,—"যাও, তোমরা সব গিয়ে সেখানে নাম যজ্ঞের মঞ্চ সব ঠিক কর।" অমনি সব ঠিক করা হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় আরতি হোলো, তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্ত্তন করতে বসলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির আজ লোকে লোকারণ্য। শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন তাই চারিদিক থেকে কত লোক, কত বৈষ্ণব-মহাজন এসেছেন। রাজা ম্যানেজারকে হুকুম দিয়েছেন,—যে কয়দিন শ্রীল বাবাজী মহাশয় এখানে থাকবেন—যত লোকজন আসুক না কেন—সবাইকে যেন প্রসাদ দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অধিবাস কীর্ত্তন হল। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় উঠে,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এই নাম ধরলেন। গগন ভেদ ক'রে নামের ধ্বনি উঠল। তারপর মাতন আরম্ভ হোলো, অপরূপ নৃত্য আরম্ভ হোলো, শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাচতে লাগলেন, আর অমনি সবাই মন্ত্র মুগ্ধের

মত নৃত্য আরম্ভ করল। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হল, রাত্রি ২টা বেজেছে, কীর্ত্তন সমাপ্ত ক'রে সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন। ভোর হয়ে এল, শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে নাম আরম্ভ করলেন,—প্রভাতী সুরে নাম আরম্ভ হল। তাঁর কি মধুর প্রেমকণ্ঠ, সবাই এসে নামে যোগ দিলেন।

নামের আনন্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় রোজ সন্ধ্যার সময় এসে নামে বসেন আর রোজই ১টা ২টা রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। এইরূপ পরমানন্দে কীর্ত্তন সমাপ্ত হল। তারপর নগর কীর্ত্তন বের হবেন, নিশান খুন্তি, সুন্দর সুন্দর রূপার বাঁটের ছাতা বের হল। রাজাদের হাতীও সেদিন নগর কীর্ত্তনের সঙ্গে চলল, অপরূপ বিরাট নগর কীর্ত্তন হল। হেতমপুর পবিভ্রমণ-কালীন এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্দর সুন্দর পদ গাইলেন। রাজ বাড়ীর সামনে এসে রাজা রাণীদের অনুরোধে,—ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,— এই পদটি বহুক্ষণ বহু বহু আঁখর দিয়ে গাইলেন। এইরূপ ভাবে নগর ভ্রমণ করে, ২॥ টার সময় নগর কীর্ত্তন নিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে ফিরে এসে— গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে—এই সব কীর্ত্তন ও লুটের কীর্ত্তন করে,—হরিবোল—দিয়ে নাম শেষ করলেন। ৩টা বেজে গেছে, তারপর সবাই স্নান আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেলেন।

কয়দিন কীর্ত্তনে খুবই পরিশ্রম করেছেন তাই রাজা বললেন,— কদিন বিশ্রাম ক'রে তারপর যাবেন। তাঁদের অনুরোধে আর ৩ দিন আমরা ওখানে রইলাম। অনেক সময় রাজা মহিমারঞ্জন দুবরাজপুর পাহাড়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁর ফটো উঠাতেন। এখনও সেই ফটোর একটী আমি দেখেছি— শ্রীপাদ, যুগলদা', চারুদা' ও আমি দাঁড়িয়ে আছি। বহু দিনের ফটো। তারপর রাজা মহিমারঞ্জন ও তাঁর মেয়েরা সব দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এই থেকে রাজা মহিমারঞ্জন আর শ্রীল বাবাজী

মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়তে চান না। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদলবলে সিউড়ীতে তাঁদের রাজবাড়ীতে চলে আসেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নিমাইবাবু বলে একজন জমিদারের ছেলে ছিলেন—তাঁর উড়িষ্যায় বাড়ী, বড় সুন্দর গান করতেন; তিনি সিউড়ী এসে কয়েকটি সুন্দর উড়িয়া গান শোনান। এই সময় রায় সাহেব অঘোর নাথ মুখার্জ্জীর ছেলে শ্রীভবানন্দ মুখার্জ্জী স্কুলে পড়তো; সে এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ও আমার সঙ্গে দেখা করল। আমার সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল; এখন সে পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় তাঁরও সুন্দর ভক্ত জীবন হয়েছে। সিউড়ীতে একদিন থেকে নগর কীর্ত্তন ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই শ্রীনবদ্বীপ ধামে এলাম, রাজা ও তাঁর কন্যারাও আমাদের সঙ্গে এলেন।

রাজা পরমানন্দিত হয়ে আমাদের সমাজ বাড়ী মঠ দর্শন করলেন এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনে এমন বিভোর হলেন যে, নিত্য সকালে মঠে এসে নাম ক'রে মন্দির পরিক্রমা করতেন। সন্ধ্যার সময় নিত্য আরতি দর্শন করতেন। সখীমার অত্যধিক প্রীতিলাভ করলেন। সেই সময় গোপীদা' মুরারীদা' খুব কীর্ত্তন আনন্দে সকালে ও সন্ধ্যায় নাম ক'রে ঠাকুরের মন্দির পরিক্রমা করতেন, তিনিও তাঁদের পিছনে নিজ কন্যা দুটিকে নিয়ে হাতে তালি দিয়ে নাম ক'রে মন্দির পরিক্রমা করতেন। শ্রীল গোবর্দ্ধন কাকা বাবাজী মহাশয়েরও অত্যধিক প্রীতিলাভ তাঁরা করলেন এবং শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করবার জন্য তীব্র বাসনাও তাঁর মনে মনে জেগে উঠল। তাই আমাদের মঠের সামনে একটি সুন্দর বাড়ী তৈয়ারী ক'রে ওখানে বাস করতে লাগলেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য একটী ধর্ম্মশালাও তৈরী করলেন।

এইরূপ পরমানন্দে তিনি ধামে বাস করেন আবার কখনও কখনও হেতমপুরে ঘুরে আসেন। এমনি ক'রে তিনি পরমানন্দে জীবন যাপন করতে লাগলেন। তিনি বহুদিন অপ্রকট হয়ে গেছেন।

কিন্তু তাঁর স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে। তাঁর দুই কন্যা এখনও জীবিত, তাঁরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করেছেন, তাই এখনও তাঁরা ভগবৎ সেবায় ও নাম আশ্রয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় দুই দিন শ্রীনবদ্বীপধামে থেকে তারপর সদলবলে কলিকাতায় ৯০নং দর্ম্মহাটা মঠে চলে আসেন। এই দর্ম্মহাটা মঠের মাসিক ভাড়া রাজা শ্রীমহিমারঞ্জনই স্বেচ্ছায় ৬০৲ টাকা ক'রে প্রতি মাসে পাঠাতেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কলিকাতায় নাম প্রচার করিবার জন্য এই সেবা তিনি নিজেই নেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর ষ্টেট হতে এই ভাড়া দেওয়া হোতো। আবার মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এলে তাঁর বাড়ীতে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন হোতো ও বহু ভক্তের সেবা হোতো। প্রায় ১৮ বৎসর এই দর্ম্মহাটা মঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ছিলেন তারপর তিনি পোস্তায় রাজ বাটীতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই নাম প্রচার করতে সর্ব্বত্র যেতেন।

যাক, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় এলেন। আমি একটু অসুস্থ হোলাম তাই ৫।৭ দিন সমাজ বাড়ীর মঠেই রইলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"একটু ভাল হলেই আমার কাছে কলকাতায় চলে এসো।" তাই আমি শ্রীধামে রইলাম। এই সময় শ্রীহাজারী লাল মুখার্জ্জী নামে একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টর শ্রীধামে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে আমার বহুদিনের প্রীতি আছে। তাঁকে ওখানে দেখে আমার খুব আনন্দ হোলো। তিনি সখীমাকে খুব ভক্তি করেন এবং দিদি বলেই সর্ব্বদাই প্রায় তাঁর কাছে আসতেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর আন্তরিক বিশেষ প্রীতি ছিল। তিনি যশোহর টাউনে পুলিশ ইন্স্পেক্টর থাকা কালীন শ্রদ্ধেয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে যশোহরে নিজ বাড়ীতে আহ্বান ক'রে নাম সঙ্কীর্ত্তন করান। তিনি বদলী হয়ে নবদ্বীপ ধামে এখন থাকেন। তিনি

পুলিশের কাজ করতেন কিন্তু খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিজের গৃহে শালগ্রাম সেবা করতেন; তাঁর সেবিত গোপালও আছেন। এখনও শ্রীহরিসভা পাড়ায় তাঁর বাড়ী আছে এবং ঠাকুরের ঘর বেলতলায় এখনও রয়েছে। তাঁর চার কন্যা—দুর্গা, পচোন, বুলু ও শিবু। বাপের মত পরমাভক্তিমতি মেয়ে সব।

শ্রীধামে শ্রীহাজারী বাবুর সঙ্গ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত হলাম। মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে মঠে দেখা হয়। একদিন সকালে একটা কাণ্ড ঘটে গেল,—প্রখ্যাত শ্রীবিশ্বানন্দ স্বামী, আট দশ জন সঙ্গী নিয়ে আমাদের সমাজ বাড়ীর মঠে এলেন। তিনি তারকেশ্বরের মহান্তকে গদীচ্যুত করে ছেড়েছেন। তাঁর তখন বেশ প্রভাব। এবার নবদ্বীপে সখীমার প্রভাব শুনে এসেছেন। তিনি শুনেছেন,—একটী সুন্দর যুবক পুরুষ মেয়েদের মত কাপড় পরেন, ওড়না ও কাঁচুলী পরেন; মেয়েদের মতন নথ ধারণ করেন; অতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সোনার গহনা পরেন, আবার হাতে তুলসীর মালা চুরির মতন ক'রে পরেন; সর্ব্বদা বড় বড় লোকের মেয়েদের নিয়ে বসে থাকেন; অতি উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত শুনে শ্রীবিশ্বানন্দ স্বামী ভীষণ রেগে গেছেন। শ্রীধামে বহুলোক সখীমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন। দেশ বিদেশ থেকে তাঁকে দর্শন করবার জন্য, রোজই প্রায় হাজার লোক আসেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিষ্ঠা এখন সমস্ত ভারত ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি গোপীভাবে সর্ব্বদা বিভাবিত থাকেন, তাই সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মেয়েরা তাঁর কাছে আসতেন এবং তিনি যে একটা পুরুষ মানুষ এ-কথা তাঁদের মনেই আসত না! তাঁরা সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করতেন। আবার দুষ্টের দলওতো পুষ্ট থাকে তাই কয়েক জন তাঁর নামে নিন্দা ক'রে বিশ্বানন্দকে জানায়।

মানুষ মানুষের গুণের কথা বড় গ্রহণ করতে চায়না কিন্তু কারও নিন্দা হলে খুব উল্লাস করে শোনে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবই ভক্ত

নিন্দা শোনে এবং ভক্তকে শাসন করতে চায়। মানুষ প্রায় নিজের মতই মানুষকে দেখে। সাধু যে হয় সে সাধুই দেখে সমস্ত লোককে, আর অসাধু যে হয় সে সমস্ত লোককেই অসাধু দেখে।

একদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম—"স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন দুর্য্যোধনকে ডেকে বললেন,—দুর্য্যোধন! একটা সাধুকে আজ খুঁজে আন, আমি তাঁকে সেবা করবো। দুর্যোধন দিন ভোর খুঁজে এসে বলল,—'কই কৃষ্ণ, একটাওতো সাধু দেখলাম না, সব ভণ্ড, সব ব্যবসাদার, ঠগবাজ—এই সবই দেখলাম।' শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন,—'যুধিষ্ঠির! তুমি একজন অসাধু ব্যক্তিকে ডেকে আন।' যুধিষ্ঠির খুঁজে খুঁজে একটাও অসাধু ব্যক্তি খুঁজে না পেয়ে, এসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন,—'সখা! আমি কত খুঁজলাম কিন্তু একটাও অসাধু লোক দেখতে পেলাম না।' ঠিক এমনি যাঁর সাধু হৃদয় হয়, তিনি যুধিষ্ঠিরের মত সমস্ত লোককেই সাধু দেখেন, আর যে অসাধু হয় সে দুর্য্যোধনের মত কাউকেই সাধু দেখতে পায় না।" ঠিক তেমনি বিশ্বানন্দ স্বামী দুচারটি নিন্দুকের মুখে শুনে, শ্রীযুক্তা ললিতা দাসীকে শাসন করবার জন্য এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তিনি কোথায়?" আমি বললাম,—উপরে তিনি ভজন কোচ্ছেন। তিনি শ্লেষ ক'রে বললেন,—"ভজন কোচ্ছে না ঘণ্টা।" আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ৫।৬ জন সাথীকে নিয়ে উপরে গেলেন, শ্রীযুক্তা সখীমা হাতে করমালা জপ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একেবারে বিশ্বানন্দ তাঁকে দেখেই ক্রোধে অভিভূত হলেন। তিনি কাছে যাওয়া মাত্রই, শ্রীযুক্তা সখীমা তাঁর সাধুর বেশ দেখে ভূমিষ্ট হয়ে দণ্ডবৎ করলেন। স্বামিজী ব্যঙ্গ ছলে বলছেন,—"বেশ জানানাকো ঠাট বানায়ো, জানানা ভুলানেকো এয়সা বেশ লাগায়ো।" সখীমা জোড় হাতে—জয়গুরু জয়গুরু—বললেন। বিশ্বানন্দজী বলছেন,—এসব বেশ খুলে ফেলে দাও। ওড়না কাঁচুলী খুলে ফেলে

দিয়ে সাধুর বেশে থাক ; মেয়েদের মত এমন ঠাট করে মেয়েদের ভুলাচ্ছ। এসব আর চলবে না ; হাম বিশ্বানন্দ এ-সব ভণ্ডামী ভেঙ্গে দেবো ; আমি তারকেশ্বরের মহান্তকে তাড়িয়েছি, মহান্ত হয়ে কেবল ভোগ বিলাস করত, আমি তোমারও মজা দেখিয়ে দেবো ! আমি বলছি,—"খুলে ফেল সব ওড়না কাঁচুলী, যদি না খোলো আমি জোর করে সব ছিনিয়ে নেবো, আমি বিশ্বানন্দ জানতো আমাকে।" তাঁর এই তীব্র অভিমান পূর্ণ কথা শুনে সখীমা কোন কথাই না বলে জোড় হস্তে,—জয় গুরু জয় গুরু—বলে পিছনে হাঁটতে লাগলেন।

সখীমাকে শাসন করতে বিশ্বানন্দ স্বামী মঠে এসেছেন,—একথা শ্রীনবদ্বীপ ধামে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। হাজারী বাবু, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর একথা শুনে জন দশেক সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে মঠে এসে ভিতরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় বিশ্বানন্দ ? আমি বললাম,—তিনি উপরে আছেন। হাজারী বাবু গেট বন্ধ ক'রে, নিজের রিভালবার হাতে নিয়ে উপরে গিয়ে দেখলেন যে বিশ্বানন্দ তর্জ্জন গর্জ্জন করছেন আর সখীমা—জয় গুরু জয় গুরু—বলে ছাদের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মনে ভেবেছেন যদি বিশ্বানন্দ জোর ক'রে আমার গায়ে হাত দিয়ে ওড়না কাঁচুলী খুলতে আসেন, তবে এই ছাদ থেকে—জয় গুরু জয় গুরু—বলে নীচে লাফিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করবেন। এই মুহূর্ত্তটাই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বিশ্বানন্দ ক্রোধভরে বলছেন,—ওড়না কাঁচুলী খিচলেগা হাম। ঠিক এই সময় হাজারীবাবু রিভালবার হাতে নিয়ে সশস্ত্র সিপাই সহ এসে বললেন,—খুব উচ্চৈঃস্বরে বললেন,—"খবরদার ! ঠার যাও বিশ্বানন্দ।" তিনি ফিরে দেখলেন যে রিভালবার হাতে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও সশস্ত্র রাইফেলধারী দশ জন পুলিশ ; দেখেই তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জন থেমে গেল। হাজারীবাবু বলছেন—"এতনা বড় স্পর্দ্ধা আপকো যে সখীমাকো ওড়না কাঁচুলী খুলনে গিয়া। ইসকা

দাওয়াই মেরে পাস হায়।" এই বলেই এক হস্তে রিভলবার আর এক হস্ত দিয়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বিশ্বানন্দ একেবারে থ মেরে গেছেন,—যেন অগ্নির উপর জল পড়ল! পুলিশদের হুকুম দিলেন,—ধর একে। অমনি পুলিশরা তাঁকে ধরে নিয়ে এল। সখীমাও ধীরে ধীরে তাদের পেছনে পেছনে নীচে এলেন।

আবার এদিকে রাস্তায় এসে কতকগুলো বলবান লোক লাঠি হাতে চেচাচ্ছে,—"গেট খোল আমাদের সখীমাকে অপমান করতে বিশ্বানন্দ এসেছে! এর মজাটা বেশ করে দেখিয়ে দিই।" গেট বন্ধ। হাজারীবাবু তাঁকে ধরে নীচে এনেছেন। সখীমার বারান্দায় তাঁকে নিয়ে এসেছেন। একেবারে অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। হাজারী বাবু বললেন,—থানায় নিয়ে যেতে হবে। বিশ্বানন্দ অধোবদনে নিম্ন দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দেখেই সখীমা ডাকলেন, "হাজারীদা', যদি আমাকে একদিনের জন্যেও প্রীতি ক'রে থাকেন তবে এই মুহূর্ত্তে তাঁকে মুক্ত ক'রে দিন। ইনি আমার মঠে এসেছেন, অতিথি ইনি, এখনই মুক্ত করে দিন।" সখীমার বাক্য বা আদেশ লঙ্ঘন ক'রে এমন ক্ষমতা তখন কারও ছিল না। হাজারীবাবু—আচ্ছা—বলে তাঁকে মুক্ত ক'রে দিলেন। সখীমা অমনি একটা আসন পেতে তাঁকে বসিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। ওদিকে রাস্তায় সোরগোল হচ্ছে,—বিশ্বানন্দকে বের করে দাও দেখি, একবার মজাটা দেখিয়ে দেবো। সখীমা হাজারীদা'কে ইঙ্গিতে সবাইকে নিবারণ করতে বললেন। আচ্ছা—বলে হাজারীবাবু গিয়ে সবাইকে বারন করলেন। গেট খুলে দেওয়া হোলো, হাজারীবাবু আছেন বলে সবাই শান্ত মনে এসে, দাঁড়িয়ে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছে। বিশ্বানন্দের এই ব্যাপার ধামে অনেকেই জেনে ফেলেছেন। সখীমার প্রীতির লোক অনেক ধামে আছেন, বেশ বলবান তাঁরা সব। তাঁরা এই সব কথা শুনেছেন এবং লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা

বলছে,—একবার বেরোলেই ঠিক হবে। সখীমা তাঁদের ভাব সব বুঝে ফেলেছেন।

বিশ্বানন্দ স্বামিজীকে বসিয়ে সখীমা বাতাস কচ্ছেন। বাল্য ভোগের প্রসাদ এল, সখীমা বললেন,—"স্বামিজী! একটু প্রসাদ পেতে হবে।" বলা মাত্রই স্বামিজী দ্বিধাহীন চিত্তে প্রসাদ পেতে লাগলেন। সখীমা বাতাস কোচ্ছেন তাঁকে, আর মধুর স্বরে বললেন,—"বাবা, প্রসাদ পেয়ে আর আপনি এখানে না থেকে ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীতে উঠে অন্যত্র যাবেন। দেখছেন তো এখানকার ব্যাপার। এখানেও দুষ্ট লোক আছে, তারা আমায় বড্ড ভালবাসে, ঐ দেখুন তারা দাঁড়িয়ে। আপনি কৃপা ক'রে এসেছেন, কোন সেবাই আমিত কোর্ত্তে পারিনি, অথচ ভয় পাচ্ছি যদি আপনার ওরা কিছু ক্ষতি করে।" এই বলেই সখীমা ডাকলেন—"হাজারীদা', একে আপনি নিজে পুলিস সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট ক'রে, গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসবেন, অন্যথা করবেন না। দেখছেন তো ব্যাপার! বেশী সময় থাকলে হয়তো এরা একটা কাণ্ড ক'রে ফেলবে।" হাজারীদা' বললেন,—আচ্ছা, তাই হবে।

বিশ্বানন্দ স্বামীর প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল, তারপর খুব বিনয় নম্র ব্যবহার ক'রে সখীমা গেট পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে দণ্ডবৎ ক'রে ফিরে এলেন। সখীমার এই ব্যবহারে বিশ্বানন্দের চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাজারী বাবু পুলিশ সঙ্গে ক'রে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হোলেন। মঠের সামনে দেখি প্রায় ১০০ বলবান যুবক পুরুষ সব দাঁড়িয়ে হাসছেন,—কারও হাতে লাঠি, কেউবা আস্তিন গোটাচ্ছেন, হাজারী বাবুকে দেখে সবাই শান্ত হয়ে থাকলেন। তিনি তাঁকে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে টিকিট ক'রে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলেন, গাড়ী ছেড়ে গেল। তিনি মঠে চলে এলেন। সবাই বেশ শান্ত হয়েছে। সখীমার এই সমস্ত ব্যবহার শুনে সবাই বলাবলি কচ্ছে,—সত্যিই সখীমার এত সহ্যগুণ, আর এমন ভাবে ক্ষমা করলেন তাঁকে।

শ্রীধামে এই কথা ক'দিন ধরে খুব আলোচনা হল। আমি তখন সখীমার কাছে ছিলাম বলে এই সমস্ত ব্যাপার দেখেছিলাম। সখীমার কথা মনে হলে, তাঁর এই অসীম ক্ষমা-সহ্য-গুণ ও শত্রুর প্রতিও তাঁর সদয় ব্যবহারের কথা আমার মনে যুগপৎ জাগে, এই সব কথা বড় কেউ জানেনা। অনেক দিনের কথা আমার মনে সবই অঙ্কিত হয়ে আছে। তারপর একটু সুস্থ হয়েই কলকাতায় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে চলে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বরাকর, তারপর ধানবাদ গিরিডি দেওঘর হয়ে কাশী, লক্ষ্ণৌ ও কানপুর যাবেন, সব ঠিক হয়ে আছে—এই কথা আমি শুনলাম।

দু'দিন পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় রওনা হোলেন। কৃপা ক'রে আমাকেও সঙ্গে নিলেন; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরমানন্দে আমরা বরাকর এসে পেঁাছলাম। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধর, একজন পরম ভাগবৎ, ওখানে খুব বড় অফিসার ছিলেন, তাঁর নাম নবীন ঠাকুর। তিনিই শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে এনেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় খুব কীর্ত্তন-আনন্দ-দানে সবাইকে ভরপূর করেছেন। আবার ওখানে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম করলেন। সন্ধ্যার সময় এমন কীর্ত্তন জমে গেল যে তা বলে বুঝান যাবে না। ভারতের তখন শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদক শ্রীকিঙ্কর কাকা ছিলেন, তিনি বাজাচ্ছেন আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই নাচ্ছি। ঘিরে ঘিরে কত ছন্দে সুললিত ও উদ্দণ্ডনৃত্য হল। কিঙ্কর কাকার মধুর মৃদঙ্গ বাজনা সবাইকে আনন্দে নাচিয়ে ছেড়েছে, তারপর আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মধুর প্রেম কণ্ঠের নাম শুনে ও নৃত্য দেখে সমস্ত লোক একেবারে বিভাবিত হয়ে পড়েছে! অনেক শিক্ষিত লোক নাম শুনতে এসে তাঁরাও নামে যোগ দিয়ে নৃত্য করছেন। এইরূপ ভাব-উচ্ছল অপরূপ নৃত্যভঙ্গী যে দেখেছিল সেদিন, সেই বুঝতে পারবে নামের কি মহীয়সী শক্তি! প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এই নৃত্য কীর্ত্তন হোলো।

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় বসে প্রায় সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত নিতাই গুণ বর্ণন ক'রে কীর্ত্তন শেষ করলেন। তারপর সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। সকালে উঠে সবাই নগর কীর্ত্তন ক'রে এসে নাম-যজ্ঞ শেষ করলেন।

আজই বিকেলে ধানবাদ যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি সবাই প্রসাদ পেয়ে ট্রেনে এসে উঠলেন। সন্ধ্যার পর ধানবাদে ট্রেন এসে থামল। রেলের কোয়াটারে আমাদের থাকার জায়গা হোলো। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনের একটী খুব বড় আসর হয়েছে। ধানবাদের সব শিক্ষিত লোক এসেছেন, কত ধনী মানী লোকও এসেছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনতে। কিঙ্কর কাকা ও হরেকেষ্ট দা' খোল বাজাতে লাগলেন, অপরূপ বোলের লহরী উঠতে লাগল।

শ্রীল নাম-মহিমা-কীর্ত্তন করলেন—তারপর দাঁড়িয়ে নাম ধরলেন,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" খানিকক্ষণ নাম করেই—পাগলের প্রাণারাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—নামে উদ্দণ্ডনৃত্য ও কীর্ত্তন হল। অনেকক্ষণ সবাই নৃত্যাদি ক'রে নাম শেষ করলেন। একটু পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় সদলবলে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। কাল সবাই গিরিডী যাবেন, সেখানে একজন প্রবীন ডাক্তার, নাম প্রতাপ বাবু, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে আহ্বান করেছেন ; শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীকিঙ্কর কাকা, যুগলদা', দীনেশ কাকা, তিনুদা', বিশ্বরূপদা', কৃষ্ণ কমলদা', জানকী, শশীদা', পশুপতিদা', ভগবানদা', বড় রমণদা,' বলাইদা', চারুদা', হরেকেষ্টদা', ছোট রমণদা,' মদনদা, শ্রীরাধাচরণদা', প্রভৃতি অনেকেই প্রায় ২০ জন আমরা ছিলাম। তারপর আমরা বিকেলে গিরিডি এসে পৌছলাম। সন্ধ্যার সময় এসেই ঠাকুরকে একটি সিংহাসনে রাখা হল। শশীদা', কৃষ্ণকমলদা', নরোত্তম কাকা ও মধুপূজারী এঁরাই সব ঠাকুর সেবা, রসুই ও ভোগ নিবেদন করেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীঅদ্বৈত কাকা সন্ধ্যা আরতি

কীর্ত্তন করলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন, বহু শিক্ষিত লোক তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। শ্রীপ্রমথনাথ মহামহোপাধ্যায় তর্কতীর্থ মহাশয়ও এসেছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁকে ব্রাহ্মণ ও ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জেনে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলেন। তিনি সহাস্য বদনে বললেন,—"আপনার শ্রীমুখে নাম কীর্ত্তন শুনবার সৌভাগ্য এবার বোধ হয় হবে। আমি কয়দিন এখানে এসেছি, আপনার আগমন সংবাদ শুনেছি।" রাত্রি তখন ৯॥টা বেজে গেছে তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"কাল সকালে প্রভাতী কীর্ত্তন হবে, আপনি আসবেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হোলো।

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী বলে একটী ছেলে, বোধ হয় ১৮ বৎসর বয়স হবে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে এসে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। তিনি ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে অত্যধিক প্রীতি ভক্তি মনে মনেই করেন। তাঁর মহিমা আগে শুনেছেন, তাঁর পাষাণ-গলান নাম-কীর্ত্তন শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। তিনিও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ লাভের জন্য আকুল হয়ে এসেছেন। এইরূপ বহুজনা তাঁকে দর্শন ক'রে চলে গেলেন।

এবার চারুদা' একমাসের ছুটী 'অফিস হতে নিয়েছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ নিরন্তর করবেন বলে। বলাইদা', যুগলদা'ও এসেছেন। যুগলদা'ও দোকানের ভার অন্য জনের উপর দিয়ে এসেছেন। চারুদা', যুগলদা' অদ্বৈত কাকা ও বলাইদা' না থাকলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আনন্দই হয় না। এঁরাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রধান দোয়ার। সবারই অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত কণ্ঠ, তাই ডাইনে বামে এঁদের রেখে তবে শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করেন। তারপর চারুদা' ও যুগলদা'র সঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সখ্যভাব। দাস্য ভাব থেকে সখ্য-ভাব সে খুব মিষ্টি তা বলে বোঝাতে হয় না। সর্ব্বদাই বন্ধুর মত সমভাব। হাস্য পরিহাস সর্ব্বদাই চলে।

তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনের সময়তো কেবল কাঁদেন, পুলক হুঙ্কার বৈবর্ণ্য-বেপথু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবাদিতে বিভূষিত থাকেন। তাই চারুদা', অদ্বৈতকাকা সময় মত তাঁহার সহিত অনেক হাস্য পরিহাস করেন বিশেষতঃ চারুদা'ই বেশী করেন। চারুদা'র ওখানে প্রতাপ বাবু ডাক্তারের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। দুইজনে বেশ মিলেছে! খুব হাসিঠাট্টা হয়, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ যেন ভাব হয়ে গেছে তাঁদের।

যাক, রাত্রি ১১টা বাজল, সবাই প্রসাদ পেতে বসলেন। সবারই পরমানন্দে প্রসাদ পাওয়া যেই হোলো অমনি প্রতাপ বাবু করজোড়ে চারুদা'র দিকে তাকিয়ে, আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দিকেও তাকিয়ে বলছেন,—"আপনাদের সেবার জন্য আজ যে কি পরিশ্রম হয়েছে! এই দিনভোর ঘুরে ঘুরে মুলো এনেছি, কোথায় থোর, কোথায় কুমড়ো এইসব অতি কষ্টে ঘুরে ঘুরে মাথার ঘাম পায় ফেলে এই কোন রকমে এনে আপনাদের পাতে দিতে পেরেছি; আপনারা গ্রহণ করেছেন এখন আমার পরিশ্রম সার্থক হোলো।" যেই এই কথা বলা অমনি সবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল, শ্রীল বাবাজী মহাশয় খুব হাসছেন, অমনি চারুদা' হেসে বলছেন,—"যাক, এই দূর দেশে এসেছি, একটি বন্ধু পেলাম; তবুও একটু হেসে নোবো। কাল থেকেতো শুধু শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনই হবে আর কেবল কান্নাইতো দেখবো। কান্না কি যে-সে কান্না ওঁর। বুক ফাটা কান্না—হা নিতাই! হা গৌর! দেখা দেও—এই বলেইতো কেবল কীর্ত্তনে কাঁদবেন। হা নিতাই! হা গৌর! কোথায় গেলে তুমি,— এইতো তাঁর কীর্ত্তনের হার্দ্দ। আবার নিজে কাঁদলেও ত বাঁচা যায়। মেয়ে পুরুষ সবলোকই কাঁদবে, এত কান্না কি দেখা যায়! ঐ কান্না না দেখেও থাকতে পারি না, আবার একটু হাসির লোকও পাই না। আজ একটা রত্ন পেলাম।" এই রকম কত হাসি ঠাট্টা খোস গল্প হোলো। তারপর ১২টা বেজে গেল, সবাই বিশ্রাম

করতে শুয়ে পড়লেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় চিরদিনই খুব ভোরে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠে শৌচাদি সেরে সবাই খোল করতাল নিয়ে কীর্ত্তনে বসলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় মাঝখানে বসেছেন, পাশে চারুদা', যুগলদা', অদ্বৈতকাকা, পেছনে বলাইদা' আর চারিদিক ঘিরে আমরা সব বসেছি। করতাল হাতে নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ করতে লাগলেন ; এমন সময় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় এসেই সামনে বসলেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ। বড় প্রাণারাম নাম ভাইরে, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বড় প্রাণজুড়ান নাম ভাইরে. একবার প্রাণ ভরে গাও ভাইরে, আমার গৌরাঙ্গ নাম অমিয়া ধাম ; নামের প্রতিবর্ণে পূর্ণামৃত, আমার গৌরাঙ্গ নাম অমিয়া ধাম ; অমৃত হতেও পরামৃত আমার গৌরাঙ্গ নাম অমিয়া ধাম ; বড় প্রাণজুড়ান নাম ভাইরে, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আমার সীতানাথের আলানিধি, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে সীতানাথের আলানিধি, অনশনে হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে সীতানাথের আলানিধি।" যেই এই আঁখরগুলো দিচ্ছেন—আর অমনি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত হয়ে পড়ছেন, অশ্রু-জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। প্রমথনাথ তর্কভূষণের দিকে আমি চেয়ে দেখি যে তাঁর চোখ দুটী রাঙ্গা হয়েছে, মুখ বুক বেয়ে অশ্রুজল ঝরছে আর এক-একবার—আঃ—বলে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আবার কীর্ত্তন ধরলেন,—"নদীয়া বিনোদিয়া, প্রাণ শচী দুলালীয়া নদীয়া বিনোদিয়া ; শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া, কীর্ত্তন কেলিরস বিনোদিয়া, আমার রসরাজ গৌরাঙ্গনট, সঙ্কীর্ত্তন সুলম্পট আমার রসরাজ গৌরাঙ্গনট ; গৌর আমার গদাধরের প্রাণ বঁধুয়া ; সঙ্কীর্ত্তন রাস রসিয়া, গৌর আমার গদাধরের প্রাণ বঁধুয়া ; নরহরির চিতচোর রসময় গৌর কিশোর, নরহরির চিতচোর ; শ্রীসনাতনের গতি, সর্ব্বতত্ত্বের অবধি, গৌর আমার সনাতনের গতি ;

মহাভাব প্রেমরস বারিধি, গৌর আমার সনাতনের গতি ; শ্রীরূপ হৃদ্‌কেতন, মহাভাব প্রেম রসঘন, গৌর আমার শ্রীরূপ হৃদ্‌কেতন।" এই সব কথা বলতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভাবিত হয়ে পড়েছেন;—এখন মস্তক ঘূর্ণিত হোচ্ছে, তার সঙ্গে অশ্রুজল ছিটকে পড়ছে। চারিদিকে সব নীরব নিঝুম হয়ে গেছেন. শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঐ অভিরমণীয় বদন-সুধা সবাই পান কোচ্ছেন, শ্রীপ্রমথনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় এক-একবার আহা আহা বলে নিজ চোখ মুচ্ছেন ; শ্রীল বাবাজী মহাশয় আবার গাইতে লাগলেন,—"দাস রঘুনাথের সাধনের ধন, আমার সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু দাস রঘুনাথের সাধনের ধন, লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী নদীয়া বিহারী গৌরহরি, লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী নদীয়া বিহারী গৌরহরি, লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী ; গোপাল ভট্টের প্রাণ গোরা, কাবেরী তীর বিহারী গৌর হরি আমার গোপাল ভট্টের প্রাণগোরা ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্র বিলাসী গৌর হরি আমার গোপাল ভট্টের প্রাণ গোরা ; প্রকাশানন্দের পরমানন্দ, মায়াবাদী মর্দ্দনকারী গৌর হরি. আমার প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ, সার্ব্বভৌমের চৈতন্য দাতা, আত্মরাম শ্লোক ব্যাখ্যাতা. গৌর আমার সার্ব্বভৌমের চৈতন্য দাতা, রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী, ষড়্‌ভুজধারী গৌর হরি, রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী, অমোঘের প্রাণদাতা, ঔদার্য্যমূরতি গৌর হরি, আমার অমোঘের প্রাণদাতা ; স্বরূপের সররস ; বিংশতিভাবে বিবশ, গৌর আমার স্বরূপের সররস ; গম্ভীরার গুপ্তনিধি, মহাভাবে বিভাবিত নিরবধি, গৌর আমার গম্ভীরার গুপ্তনিধি ; রাম রায়ের চিতচোর, রসময় প্রাণ গৌর কিশোর, রাম রায়ের চিতচোর ; রাধাভাবে সদাই বিভোর, রাম রায়ের চিতচোর ; যুগল উজ্জ্বল রস' নির্য্যাস মূরতি, মহাভাব প্রেমরস ঘনাকৃতি, নিত্য মিলনে মিত্য বিরহ, বিলাস বিবর্ত্ত মূরতি, মূরতিমন্ত প্রেম বৈচিত্ত্য, মিলনে দুই রসের খেলা, আমার নিগূঢ় গৌরলীলা, মিলনে দুই রসের খেলা ; বিলাস বিবর্ত্ত মূরতি, রামকানু

একাকৃতি, বিলাস বিবর্ত্ত মুরতি, আশ মিটান মুরতিরে, আমার প্রাণ রাধারমণের আশ মিটান মুরতিরে !" এই সব কীর্ত্তন ক'রে তিনি অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হলেন, মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো।

চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, সমস্ত লোক নীরব নিঝুম হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনছেন আর অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছেন ! অদ্বৈতকাকা চারুদা' সবাই কাঁদছেন, অদ্বৈতকাকা এক-একবার শান্ত হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও চারুদা'ও মুছিয়ে দিচ্ছেন ! সে-যে কত আঁখর দিলেন ! আঁখরে মহাপ্রভুর সমস্ত লীলামহিমা ও তাঁর তত্ত্ব সব বর্ণন করছেন। বহুদিনের কথা তবুও অনেক কথা মনে পড়ছে, এমন ভাবে গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-বর্ণন জীবনে আর কীর্ত্তন মুখে শুনি নাই বা কেহ শুনতে পাবে না বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমি সামান্য কিছু বর্ণন করলাম ! যদি কেহ শ্রীমদ্ বাবাজী মহাশয়ের 'প্রভাতী কীর্ত্তন' পাঠ করেন তবে বুঝতে পারবেন, সমস্ত শাস্ত্র নিঙ্গাড়িয়ে যেন তাঁর কীর্ত্তনের আঁখরগুলো। শ্রীপাদের সেবক শ্রীগোপাল দাস ও শ্রীব্রজগোপাল দাস বহু পরিশ্রম ক'রে এই কীর্ত্তন ছাপিয়েছেন।

খানিক পরে শ্রীপাদ একটা আঁখর দিলেন,—"আমার পাষাণ-গলান গোরা, আমার প্রভু নিতাই পাগল করা, পাষাণ-গলান গোরা।" এই কথা বলতে বলতে উচ্চৈঃস্বরে বালকের মতন আকুল ভাবে কেঁদে উঠলেন,—সে কান্না যে দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছে সেই বুঝবে এই কান্নার কি দরদ। সেদিন এমন একটী লোক ছিল না যে না কেঁদে উঠে যেতে পেরেছে ! ৬টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তন হোলো। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় উঠে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে জড়িয়ে ধরে বলছেন,—"আজ ধন্য হয়েছি, চির কৃতার্থ হয়েছি। নিজের পাণ্ডিত্যের অভিমান আজ চূর্ণ হয়ে গেছে। কি কীর্ত্তন শোনালেন,—এ-যে সমস্ত শাস্ত্র নিঙড়ান কথা, ধিক্, আমাদের বিদ্যা গৌরবে !. আজ আপনার

কীর্ত্তনে সব ভারি ভুরি আমাদের মিটে গেল।" এইরূপ কত স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দুই হাত জোড ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সবাই বিশ্রাম ক'রে স্নান করতে যাবেন বলে তেল মাখতে বসলেন। চারুদা' এসে দাঁড়াল। ৬টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কেবল শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাঁদা-বদন দেখে তার মোটেই ভাল লাগছে না। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিরহে চুপ করে ম্লান বদনে বসে তেল মাখছেন। হঠাৎ চারুদা' একটু কাছে এসে এক টিপ নস্য টেনে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সামনে দাঁড়ালেন কিন্তু কোন কথাই না বলে তিনি স্নান করতে গেলেন।

খুব মনে পড়ে এক বাবুর পুকুরের সুন্দর জল, সেখানে স্নান করতে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও আমরা সবাই স্নানান্তে উঠেছি এমন সময় চারুদা' একটী অপূর্ব্ব বস্তু দুটি আঙ্গুলের টিপে ধরে একবার কপালে ঠেকাচ্ছেন আবার বক্ষে ঠেকাচ্ছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলছেন,—"ও কি চারু? একবার বুকে ঠেকাচ্ছ আবার মাথায় ঠেকাচ্ছ, ব্যাপার খানা কি?" চারুদা' বললেন,—"আজ আমি এক অমূল্য বস্তু লাভ করেছি। এতদিন ধরে আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য আজকেই লাভ করেছি।" আমি ভাবছি,—অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আজ যে হয়েছে তাই বুঝি বলবেন।

তারপর দেখছি তা নয়। চারুদা' গম্ভীর হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে বলছেন,—স্বরূপ, নাম, শ্রীঅঙ্গ, শ্রীঅঙ্গের যে কোন বস্তু, সবই যে চিন্ময় তা জানি। আমি আপনার চিন্ময় দেহের একটা চিন্ময় বস্তু লাভ করেছি তা-ই মস্তকে ও বক্ষে ঠেকাচ্ছি; এঁটা আমি সুবর্ণ মাদুলীতে পূরে গলায় সর্ব্বদা ঝুলিয়ে রাখব। শ্রীপাদ বললেন,—কি বস্তু বলনা। অমনি চারুদা' বললেন,—"আপনার বহির্ব্বাসে একটী শ্রীঅঙ্গের লোম লেগেছিল, তাই পেয়েছি এই দেখুন।" অমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ডাক্তার প্রতাপ বাবু হেসে বলছেন,—সাবাস চারুদা', বলিহারি তোমার নিষ্ঠা ও অনুভব! এইরূপ ভাবে

সবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। তারপর সবাই হাসতে হাসতে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে আহ্নিক পূজা করতে বসলেন। ২টা বাজল, পঙ্গতের ডাক পড়ল। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেতে বসলেন, তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই বসলাম। আজ ডাক্তার বাবুও আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেছেন। বড় রসিক লোক! তিনি বলছেন,—"চারুদা, আমি শাক্ত ছিলাম, এই আপনাদের সঙ্গ পেয়ে এখন বৈষ্ণব হ'য়ে পড়েছি। আর শক্তি ভাল লাগে না, শক্তির ভজনা ক'রে এই এতদিন কাটল এখন শক্তি উপাসনা ছেড়ে দিয়েছি, কাকাল ভেঙ্গে আসছে, অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্ হয়ে পড়েছে। শক্তি উপাসনা আমি প্রায় ২০ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত করেছি কিন্তু মায়ের কৃপা আর পাই কই! মা, মা বলে কাঁদতে পারিনি বলে আমার আজ এই দুরবস্থা, কিন্তু আপনাদের সঙ্গ পেয়ে,—আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বলছেন,—তবে একটু চোখের জল পড়ছে। আগেও কেঁদেছি কিন্তু শক্তি উপাসনার জ্বালায় পড়ে। শক্তি আমায় বিদায় দিয়ে চলে গেছেন বলেই এখন আমি শক্তিমানের উপাসনা ক'রে ধন্য হচ্ছি।" তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাই তাঁর প্রহেলিকাপূর্ণ কথা শুনে সবাই বেশ মৃদুমন্দ একটু একটু হাসছেন। চারুদা' বলে উঠলেন,—"বলিহারি সিদ্ধান্ত; এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন পাঠকের মুখে শোনা যায়না।"

এমন গভীর তত্ত্ব মীমাংসা কই কারও মুখে তো শুনতে পাইনা। শক্তি উপাসনার এমন গভীর তত্ত্ব কই কখনও তো শুনিনি! অমনি চারুদা' উল্লাসভরে বলছেন,—"ডাক্তারবাবু! আজ আমি আপনাকে ষড়্‌দর্শনাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করলাম, করলাম; একথা আনন্দবাজারে এবং যুগান্তরে দিয়ে দোবো!" কথা শুনে সবাই বেশ একটু একটু হাসছেন। এইরূপভাবে খুব হাস্য পরিহাস হয়ে গেল, সবাই প্রসাদ পেয়ে উঠে পড়ছেন। দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু

চারুদা'কে বললেন,—"আর একটী সুন্দর সিদ্ধান্তের কথাতো আপনাদের বলি নাই। আমি শাক্ত ছিলাম এতদিন তাই স্ফূর্ত্তি হয়নি এখন বৈষ্ণব হয়ে সব সিদ্ধান্ত-জ্ঞান হয়েছে।" চারুদা' বললেন,—"সিদ্ধান্তটা বলে ফেলুন না।" ডাক্তারবাবু বলছেন,—"বলা ঠিক কিনা বুঝতে পাচ্ছিনা। আমাকে সবাই অভয় দিন এবং আমার সিদ্ধান্তের কেউ ক্রুটী ধরবেন না বলুন।" চারুদা' বললেন,—"ষড়্ দর্শনাচার্য্য যে তাঁর কখন ভুল হতে পারে না ; বলুন, বলে ফেলুন!" সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, বেশ হাসছেও সবে। ডাক্তারবাবু তখন জোড়হাতে সিদ্ধান্ত বলতে লাগলেন,—"ছোট ছেলে সব গোঠে-মাঠে ছোটে ; কানাই বলাই যেন নৃত্য ক'রে গোঠে।" যেই এই কথা বলা আর সবাই হাসতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও মৃদুমন্দ হাসলেন। চারুদা' খুব হেসে বলছেন,—"বলি-হারি ভাই তোমার সিদ্ধান্ত, আমার উপাধি দেওয়া সার্থক হয়েছে!" এইরূপ হাস্য পরিহাস করতে করতে সবাই গিয়ে বসল। ডাক্তার বাবুর এই সব কথা শুনে কেহই কোনদিন রাগ করেনি ; তাঁর কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-প্রীতি, কি অফুরন্ত সেবা যত্ন! আমরা যে কয়দিন সেথায় ছিলাম কত প্রীতি তাঁর পেয়েছি! চারদিন সেখানে আমরা ছিলাম কত আনন্দেই দিনগুলো কেটেছে। তারপর দেওঘরে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রওনা হবার কথা। গিরিডীতে রোজ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের পাষাণ-গলান কীর্ত্তন হোতো। আর ডাক্তার বাবুর সেবা যত্নে সবাই মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। আজ আমরা সবাই গিরিডী ষ্টেশনে এলাম। ডাক্তারবাবুও এলেন। আমরা গাড়ীতে উঠলাম, ডাক্তারবাবু নীরব নিঝুমে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন, অস্ফুট স্বরে বললেন,—আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল! যতদূর আমাদের গাড়ী দেখা যায় ঠিক তত সময় পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু নীরবে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন আর আমাদের দিকে দৃষ্টি কচ্ছেন। চারুদা' ও আমি রেলগাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে

দেখছি আর তাঁর প্রীতির কথা ভাবছি। আর দেখা গেলনা; আমরা নিজেদের সিটে এসে বসলাম।

আমরা দেওঘর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন তা কেহই জানিনা। তিনি বললেন, "খোল করতাল ধর, নাম কর।" কিঙ্কর কাকা ও মদনদা' খোল নিয়ে বাজাতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"চল নাম করতে করতে বাবা বৈদ্যনাথের দর্শনে যাই।" অমনি তিনি নাম ধরলেন,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" নামধ্বনি চারিদিকে ভেসে যাচ্ছে। একে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠে নাম, তারপর 'বাবা'র দর্শনের জন্য আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে চলেছি। রাস্তায় তখন যে আসছে সেই আমাদের সঙ্গে নাম করছে। সে-যে কি আনন্দের নাম-ধ্বনি উঠেছে তা বলে বোঝান যাবে না। নাম করতে করতে 'বাবা'র মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। 'বাবা'র পাণ্ডারা এসে নামে যোগ দিয়েছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় 'বাবা'র মন্দিরে এসে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করলেন তারপর উঠে নাম করতে করতে মন্দির পরিক্রমা তিনবার ক'রে, তারপর মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে খুব নর্ত্তন কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরলেন—"গৌরী শঙ্কর সীতারাম। নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।" যেই এই নাম বলা অমনি দেওঘরের প্রায় দুইশত পাণ্ডা নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলেন। সে-যে কি উদ্দণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ হলো, তা বলে বোঝাতে পারবোনা। তারপর আবার শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরলেন,—"বাবা ভোলানাথের প্রাণারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম শুনে সবাই উন্মাদের মতন নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিলেন। কেহ আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন, কেহ—জয় বাবা বৈদ্যনাথ—ব'লে হুঙ্কার দিচ্ছেন, এমনি ক'রে বহুক্ষণ কীর্ত্তন হলো তারপর নাম শেষ ক'রে, তিনি মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে বসে বিশ্রাম কচ্ছেন। এমন সময় একজন ভক্ত এসে বললেন,

"এই বাবার মন্দিরের পাশেই একটী ধর্ম্মশালা আছে, সুন্দর জায়গা, আপনারা সেখানে চলুন। আপনাদের সঙ্গে যখন ঠাকুর আছেন তখন সেখানেই ভোগরাগ হবে।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন, "দেখ, 'বাবা'র কি অনুগ্রহ! আমাদের চাইতে তাঁরই যেন বেশী ভাবনা। আগে থেকেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে আবার লোকও পাঠিয়ে দিয়েছেন।" আমরা আস্তে আস্তে খোল করতাল ঠাকুর নিয়ে সেই ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলাম। সুন্দর ঘরগুলো। তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে বসিয়ে, কাছেই শিবগঙ্গায় আমরা সবাই স্নান ক'রে এলাম। ভোগের জোগাড় সব ভক্তেরা মিলেই করতে লাগলেন। পাণ্ডারা সুন্দর হাঁড়ি, কড়াই সব এনে দিলেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন সব ঠিক হয়ে গেল! চাল, ডাল, তরকারী, ঘি, তেল সব ঐখানকার ভক্তেরা এনে যোগাড় করে দিলেন। মধুদা' তাড়াতাড়ি পেড়া ও সরবৎ ঠাকুরের ভোগ দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিয়ে রান্না চাপালেন। ডালনা আর অন্ন ক'রে ঠাকুরের ভোগ হোলো। আমরা সবাই তিলক ও আহ্নিক ক'রে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডারা বললেন,—"'বাবা'র আরতির পর আঙ্গিনায় বসে বাবাকে কীর্ত্তন শোনাতে হবে।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় হেসে বললেন,—"সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু পরেই বাবার আরতি দর্শন ক'রে নাম কীর্ত্তন করতে বসলেন। সে সময় শুক্লপক্ষ ছিল। চাঁদিমা জ্যোৎস্নায় আঙ্গিনা ভরে গেছে। বহুলোক শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনতে এসেছেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম! জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম এ-নাম বাবা ভোলানাথের প্রাণারাম, পঞ্চমুখে গায় অবিরাম, বাবা ভোলানাথের প্রাণারাম; মা যোগমায়ার প্রাণারাম।" এইরূপ ভাবে নাম ক'রে অনেকক্ষণ নাম মহিমা কীর্ত্তন করলেন। অনেক সাধু সজ্জনও এসেছেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে নাম শুনবার জন্য। রাত্রি

সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হোলো তারপর আমরা বসে কথা বার্ত্তা বলছি। শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের একজন বিরক্ত সাধু এসে বললেন,—'একবার আমাদের মঠে আমার শ্রীগুরুদেব আপনাদের আহ্বান করেছেন নাম করবার জন্য।" তখন কলেজ স্কোয়ারস্থিত শ্রীললিত মোহন ঘোষ মহাশয়ও সেখানে আছেন, তিনিও শ্রীবাবাজী মহাশয়কে আনবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।

পরদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই নাম করতে করতে শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রমে এসে হাজির হোলাম। তিনি একটা আসনে বসে আছেন। প্রশস্ত বারান্দা, তার পাশে তিনি বসে আছেন। নাম শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমরা নাম বন্ধ ক'রে তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম; তিনি বারান্দায় আমাদের বসতে বললেন। আমরা সবাই এসে বসলাম। বেলা তখন ৫টা হবে। শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বললেন, যুগলদা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটো ভগবৎ গুণগান হাম্‌কো শুনাইয়ে!" যুগলদা' তাঁর আদেশে একটা গান ধরলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীল বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনতিদূরে একটি আসনে বসেছেন। যুগলদা' নাম ধরলেন। আমার গানটি বেশ মনে আছে, প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা তবুও সে গানটি ভুলিনি, গানটি এই : আমার মন রসনা জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। তোর নিরানন্দ দূরে যাবে, পাবি আনন্দঘন অবিরাম। জ্ঞানিগণ যারে ব্রহ্মস্বরূপ করি, যোগিগণ পরমাত্মা হৃদয়েতে ধরি, ভক্ত বলে ভগবান দ্বিভুজ মুরলীধারী, বৃন্দাবনে গোপীসনে ভক্তজনার প্রাণারাম। যুগলদা'র কণ্ঠে তখন ঐ অপূর্ব্ব গানটি শুনলাম। অতি সুন্দর আশ্রমটী, আমরা ঘুরে ফিরে সব দেখলাম। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় খোল করতাল নিয়ে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করলেন। নাম ক'রে আবার মন্দির পরিক্রমা করলেন। শ্রীবালানন্দ

ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুরোধে কিছু মিষ্টি তুলসী দিয়ে মধুদা' ভোগ দিয়ে আমাদের প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পেয়ে আমরা নাম করতে করতে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। আজই আমাদের কাশীধামে যেতে হবে।

আজ রাত্রের ট্রেণেই শ্রীপাদের সঙ্গে আমরা গাড়ীতে রওনা হয়ে কাশীধামে এসে পৌঁছলাম। কাশীধামে পাঁচুদা'র এক বাড়ীতে আমাদের থাকার জায়গা হয়েছে। আমরা ষ্টেশন থেকে নাম করতে করতে দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে পৌঁছলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভোর হয়েছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা তাঁর মনে পড়েছে;—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদের কথা, শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের কথা, তপন মিশ্রের কথা যেই মনে হয়েছে আর অমনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন ধরলেন,—"কই আমার সে প্রাণ গৌর! আমরা এসেছি এই কাশীধামে, কই দেখতে তো পাইনা তোমায়! কই সে মায়াবাদী মর্দ্দন গৌর! কই সে প্রকাশানন্দ, মায়াবাদী মর্দ্দন গৌর, আমার প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ! কই আমার সনাতনের গতিদাতা গৌর! কই সে তপন মিশ্রের প্রাণ গৌর!" এইরূপ কত প্রার্থনা ক'রে কীর্ত্তন করতে লাগলেন। তারপর কীর্ত্তন শেষ ক'রে গঙ্গা স্নান ক'রে নাম কীর্ত্তন করতে করতে আমরা পাঁচুদা'র বাড়ীতে পৌঁছলাম। সে রাত্রি আমরা সেখানে থেকে তার পরদিন সকালে ট্রেণে উঠে লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত যখন আমরা লক্ষ্ণৌতে এসে পৌঁছলাম বেলা তখন ২॥০টা হবে। নলিনীবাবু ও বিধুবাবু শ্রীল বাবাজ মহাশয়কে নিতে এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেই লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে এসে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়ালেন, আর অমনি তাঁরা সাষ্টাঙ্গে তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁহাদের প্রীতি ও ভক্তি দেখে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলাম। ওখানে একটী জমিদারের

বাড়ী খালি ছিল। সুন্দর দোতালা বাড়ী, সামনে ফুলের বাগান, সেইখানে আমাদের থাকার জায়গা হোলো। সামনে খুব বড় প্রাঙ্গণ। সেইখানেই কীর্ত্তনের আসর হয়েছে। আমরা লক্ষ্ণৌতে ২৷৷৹টায় এসে পোঁছলাম। স্নান আহ্নিক সেরে সবাই প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলাম। সন্ধ্যার পর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনতে বহু শিক্ষিত লোক এসে বসেছেন। এই দূরদেশে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তাঁরা সামনে পেয়েছেন দেখে, তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। তখন সারা ভারতবর্ষ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ভক্তি-কীর্ত্তন-মহিমায় মুখরিত হয়ে আছে। আজ তাঁরা তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন; আবার তাঁর মুখে নাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনবেন, তাই অত বড় বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে ভোরে গেছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় করতাল হাতে লয়ে খানিকক্ষণ দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন। কিঙ্কর কাকা ও হরেকেষ্টদা' মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। কিঙ্কর কাকার মধুর মৃদঙ্গ বাজনা শুনে, লোক সব থ মেরে গেছে, এমন বাজনার লহর কেউ কোথায়ও যেন শুনেনি। বাজনা শেষ হোলো।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় নাম ধরলেন,—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করে তিনি নাম-মহিমা-কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন;—জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জপ রাম রাম হরে হরে, রমে রামে মনোরমে, শ্রীরাধারমণ রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নামে মৃদঙ্গের এমন সুন্দর বোল উঠছে, এমন সুন্দর লহর উঠছে যে অমনি—হরি হরি বোল—ধ্বনি চারিদিকে ধ্বনিত হতে লাগল। তারপর আবার ধরলেন—"এইতো কলিযুগের মহামন্ত্র, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম; পরিত্রাণের মূল মন্ত্র, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। এ যে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম, কলিযুগোচিত এই নাম ধর্ম্ম; চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণতন্ত্র, গীতা আদি করিয়া মন্থন এই হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ; এ নাম অখিল রসের ধাম, অভেদ নাম নামী, নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ, চৈতন্য রস বিগ্রহ; নাম

বই আর সাধন নাইরে; অনাদির আদি গোবিন্দ পেতে, নাম বই আর সাধন নাইরে; সচ্চিদানন্দ ঘন মুরতি দেখতে, এই নাম বই আর সাধন নাইরে; সচ্চিদানন্দ ঘন মুরতি দেখতে, নিত্য নব কিশোর নটবর, সচ্চিদানন্দ ঘন মুরতি দেখতে, নাম বই আর সাধন নাইরে; পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি করতে, সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে, এই নাম বই আর সাধন নাইরে; ব্রজবাসিগণের মত, সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধতে, কৃষ্ণ বশ করে অধীন করতে, এই নাম বই আর সাধন নাইরে।" এইরূপ অপরূপ নাম-মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। এইরূপ কীর্ত্তন জীবনে কখনও শুনি নাই। নামের কত-কত যে মহিমা সে দিন কীর্ত্তন হোলো তাঁর কতটুকুই বা লিখব। অফুরন্ত নাম-মহিমা সে দিন কীর্ত্তন কোরলেন, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে। এই 'নাম-মহিমা-কীর্ত্তন' ছাপান হয়েছে; যাঁরাই পাঠ করবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন কি অপরূপ ভাবে নাম-মহিমা-কীর্ত্তন করেছেন। নাম-মহিমা-কীর্ত্তন করতে করতে একটি পদ ধরলেন,—"নবদ্বীপ ধামে আসি, প্রেম বিলায় রাশি রাশি, তরঙ্গে যার জগৎ ভাসায়রে, নবদ্বীপ ধামে আসি, হয়ে রাই কানু মিশামিশি। উপরে রাই ভিতরে কালশশী, হয়ে রাই কানু মিশামিশি, নাম ধরিল গোরা শশী, রাই সম্মুখে কালশশী, নাম ধরিল গোরা শশী।" এই কথা বলতে বলতে একেবারে আকুল প্রাণে কেঁদে উঠলেন, অশ্রু কম্প, পুলক, হাসি হুঙ্কার এই সমস্ত দিব্যভাব এসে তাঁর শ্রীঅঙ্গ আশ্রয় করল! কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল অনেকক্ষণ মাতন কীর্ত্তনের পর একটু শান্ত হয়ে আবার কত কীর্ত্তন করতে লাগলেন, এইরূপ ভাবে কীর্ত্তন বারোটা পর্য্যন্ত হোলো তারপর দাঁড়িয়ে উদ্দণ্ডনৃত্য ও নাম-কীর্ত্তন ১টা পর্য্যন্ত হয়ে তারপর নাম শেষ করলেন।

এইরূপ ভাবে রোজই সন্ধ্যায় শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করেন্। লক্ষ্ণৌবাসী পরমানন্দে তাঁর শ্রীমুখে নাম কীর্ত্তন শুনে তাঁরা নিজদিগকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। ওখানে বড়

রাস্তার ধারে একজন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী। তিনি খুব ধনবান ও ওখানকার খুব মানী লোক। নামটি আমার ঠিক মনে নাই, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা কিন্তু শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের লীলা-কাহিনী সব মনে আছে। ইঞ্জিনিয়ার বাবু কখনও বাঙ্গালীর পোষাক পরেন না। সাহেবদের মতনই ব্যবহার, বেশভূষা! তিনি রোজ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন খুব শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শোনেন। আবার কীর্ত্তন শুনতে শুনতে তাঁকে খুব কাঁদতেও দেখিছি। তিনি একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে ভূনিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ করলেন;—হ্যাট কোট পরা হলেও তাঁর কোন অভিমানই নেই। করজোড়ে বললেন,—"আমার বাড়ীতে সকালে প্রভাতী কীর্ত্তন যদি করেন ত—যদি আপনি কৃপা করেন, আমাদের শুনবার বড় সাধ হয়েছে—তবে আমরা শুনে ধন্য বোধ করব।" অমনি শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন,—"আপনাদের চাইতে আমিই বেশী ধন্য হব। কারণ কেউ যখন নাম-কীর্ত্তন শুনতে চান তখনই তিনি আমাদের ডাকেন বলেই ত আমরা নাম করি। নইলে কি নাম করতে চাই? আপনারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে নাম শুনতে কামনা করেন, আমাদের প্রীতি ক'রে ডেকে নিয়ে যান. আমরা তাইতে আপনাদের নাম কীর্ত্তন শুনাই। দেখুন, আপনারাই আমাদের নাম করিয়ে তবে ছাড়লেন; নইলে আমরা কি নাম করতে চাই!" শ্রীপাদ বলছেন, "নামে আলিস ভোজনে হুসিয়ার, তুলসী কহে ও নরকা বারবার ধিক্কার।" এই কথাগুলো আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য যিনি নিজ দৈন্য-স্বভাব বশতঃ বলছেন তিনি নাম কীর্ত্তন ছাড়া কখনও থাকতে পারেন না, রোজ চৌদ্দ পনের ঘণ্টা ধরে তিনি নাম-কীর্ত্তন করেন, কত বৎসর ধরে যে' তিনি নাম কীর্ত্তন কোচ্ছেন তার কত-টুকুই বা বলব। শ্রীপাদ ১০ বৎসর বয়স থেকেই প্রায় ৭৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-আনন্দে সবাইকে ধন্য করেছেন। অপ্রকট হয়েছেন আজ প্রায় ১০ বৎসর তবু তাঁহার মুখোদ্‌গীর্ণ নাম, তাঁর কীর্ত্তনের

আঁখরগুলো লোকে কীর্ত্তন ক'রে এখনও ধন্য হোচ্ছেন। এত নাম-কীর্ত্তন-পরায়ণ যিনি তাঁরও কত দৈন্যের কথা! নামই যাঁর জীবাতু সেই শ্রীল বাবাজী মহাশয় আকুল প্রাণে কেঁদে কেঁদে বলেন,—"আমায় নাম করবার শক্তি দাও প্রভু, আমার নামে রুচি হোলোনা, নামে রুচি দাও প্রভু।" এইরূপ তাঁর কত আর্ত্তি দৈন্য আমি সারাজীবন ভোর দেখেছি। যিনি সর্ব্বদা ভাবে বিভোর হয়ে প্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণে সমাহিত থাকেন তিনি কিন্তু রোজই কীর্ত্তনের শেষে বলেন,—"আমি কিছুই দেখতে পেলাম নারে, আমার নামে রুচি হল নারে, সবাই আমায় নাম করবার শক্তি দাও, কেবল সাজ সেজে লোক ভাঁড়ালাম; নামে রুচি লহনারে।" লক্ষ লক্ষ লোক যাঁকে পরম বৈষ্ণব, পরম ভাগবৎ জেনে তাঁর রাতুল চরণে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছেন তাঁর মুখে এ-কি দীনতা, কি নিরভিমানিতা! এমন অভিমান শূন্য হৃদয় যে মহাপুরুষের তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় পেয়েও হায় আমাদের হৃদয়ের অহঙ্কার, দম্ভ ও দর্পের বিষাক্ত বাষ্পে যেন চারিদিক ছেয়ে যাচ্ছে! তাই আমি আমাকে শত ধিক ছাড়া আর কি বলতে পারি।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে বললেন,—"বেশতো কাল সকালে আপনার গৃহে আমরা প্রভাতি কীর্ত্তন করব।" ইঞ্জিনিয়ার বাবু বললেন,—"কত সৌভাগ্যের ফলে যদি পায়ের ধূলো পাব তবে ওখানেই কাল ঠাকুরের ভোগ হোলে আমি পরম সুখী হব।" বেশ তাই হবে—বলে শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করতে মধু পূজারীকে বললেন। পরদিন সকালে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা সবাই সেখানে নাম করতে করতে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর গৃহের সামনে কীর্ত্তনের আসর হয়েছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় আসনে বসে করতাল হাতে লয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে, নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভাতি নাম খুব জমাট বেঁধে গেল। অসংখ্য লোক

কীর্ত্তন শুনতে এসেছেন। তিলার্দ্ধ জায়গা আর নেই। কেহ কেহ বসবার জায়গা আর না পেয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কীর্ত্তন শুনছেন। কীর্ত্তনে এমন উন্মাদনা এসেছে যে বলে বুঝান যাবেনা। অঝোর অশ্রুজলে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কম্প এক-একবার এমন হোচ্ছে যে শরীর চেনা যাচ্ছেনা। কখনও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কম্পনে বক্ষের চাদরখানা খসে পড়ছে। প্রথম থেকেই প্রভাতি কীর্ত্তনে সবাই মেতে গেছেন।

শেষে সমস্ত লোক শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের আর্ত্তিভরা মুখমণ্ডল ও অজস্র অশ্রুবর্ষণ দেখে কাঁদছেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছি। যেই ধরলেন,—"হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর! হা চিত চোরা প্রাণ গোরা, এ তোমার কেমন ধারা; চিত চুরি করে দাওনা ধরা, এ তোমার কেমন ধারা; আমরা খুঁজে খুঁজে হলাম সারা, যেদিন হতে তোমার নাম শুনেছি, খুঁজে খুঁজে হলাম সারা; নদীয়া নীলাচল শ্রীবৃন্দাবনে খুঁজে খুঁজে হলাম সারা; সুরধুনী আর সিন্ধুকূলে খুঁজে খুঁজে হলাম সারা; কেন তুমি দাওনা ধরা, হা চিত চোর চূড়ামণি, কেন তুমি দাওনা ধরা; আমরা যেচে তো প্রাণ দেই নাই তোমায়; আমরা তো তোমায় ভুলেই ছিলাম সংসারে কৈশোর খেলায় মেতে, আমরা তো তোমায় ভুলেই ছিলাম কেন তুমি জানাইলে, আমরা ভুলে ছিলাম, ভালই ছিলাম, কেন তুমি জানাইলে; শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে কেন তুমি জানাইলে, তুমি সেব্য আমরা সেবক বলে কেন তুমি জানাইলে।" এই প্রার্থনা যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হোতে বের হচ্ছে! সে-যে কি ব্যাকুল প্রাণে তিনি প্রার্থনা-কীর্ত্তন কচ্ছেন তা আমি কতটুকুইবা বর্ণনা করতে পারি। এক-একবার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বালকের মত আকুল হয়ে কাঁদছেন। অদ্বৈতকাকা অনবরত চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। চারিদিকেই তাকিয়ে দেখছি, সমস্ত লোকই তাঁর কাঁদা-বদন দেখে কাঁদছেন। এই সময় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে

পড়েছি। দশ বার জন কাবুল দেশের লোক লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে, আবার মধ্যে মধ্যে হাত জোড় করছেন। আমি ভাবলুম—এরা কাবুল দেশের লোক, বাংলা ত কেউ বোঝেন না। তবে ওঁরা কেন কাঁদছেন, আবার অনিমিখ নয়নে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের পানে তাকিয়ে আছেন! এর কারণ কি তাহা জানবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হোলো। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আপলোকতো কাবুল হায়, আপলোক কেও রোদতেহে। তাঁরা বললেন,—"এই ফকিরা খোদাকো নাম লেকে রোদতেহে খোদাকো নাম লেকে যিছকো এয়সা আখিকা জল নেকালতেহে এ জরুর একজন খোদাকো ভকত হুয়া হায়। এ একজন সাচ্ছা ফকিরা, দরবেশ জরুর হায়। দেখিয়ে হামকো পাষাণ হৃদয়ভি গলগিয়া।" তাঁর এই কথা শুনে বুঝলাম,—ভাব সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তকে দেখলে ভক্তির উদ্রেক হয়,—পাষণ্ডির হৃদয়ও গলে যায়! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথা ভাবছি আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাঁদা-বদন দেখছি, এমনিভাবে কত প্রার্থনা কীর্ত্তন শেষ করে, প্রায় ১টার সময় প্রভাতি কীর্ত্তন শেষ হোলো। তারপর—গৌর হরিবোল—বলে কীর্ত্তন শেষ করলেন।

তারপর সবাই স্নান আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করলেন। এইরূপভাবে ৫।৬ দিন লক্ষ্ণৌতে থেকে তারপর আমরা শ্রীপাদের সঙ্গে কানপুর এসে পৌঁছলাম।

সেখানকার ভক্তদের আগ্রহে শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন। শ্রীরামগতি ঘোষাল নামে একজন মাষ্টার সেখানে আছেন। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের নাম শুনে অবধি তাঁর দর্শনের ও নাম কীর্ত্তন শুনবার আকাঙক্ষা নিয়ে এত দিন বসে ছিলেন। তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁদের আগ্রহে কানপুরে এসেছেন। সবাই ষ্টেশনে এসে

শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে তাঁদের বাসস্থানে এসে পেঁছলেন।

রোজ সন্ধ্যার সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন হয়; বহুভক্তের সমাগম হয়। শ্রীরামগতি ঘোষাল এক-একদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এইরূপ ভাবে রোজ কীর্ত্তন-আনন্দ হয়। বহু বাঙ্গালী ভক্ত এসে যোগ দেন। এইরূপ ৩।৪ দিন সেখানে নাম ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয় সেখান থেকে শ্রীঅযোধ্যা ধামে আসবেন বলে ষ্টেসনে এসেছেন। কানপুরের কয়েকজন ভক্তও ষ্টেসনে এসেছেন। শ্রীরামগতি ঘোষাল প্লাটফর্মে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ ক'রে উঠে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন :—অনিমিখ নয়নে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন কত জন্মের তিনি আপন জন। এমনই তখন তাঁর দৃষ্টি আমি দেখেছি। ট্রেন ছেড়ে দিল, একটু দূরে গাড়ী যেই চলে গেল অমনি রামগতি ঘোষাল শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের বিরহে ছিন্ন কদলী বৃক্ষের মত পড়ে গেলেন প্লাটফর্মে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় —জয় নিতাই—বলে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"দেখ দেখ, কি অনুরাগ! আর গৃহে ওঁর থাকা হবে না।" তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ১০।১৫ দিন ঘুরে যেদিন কলকাতায় এসেছি তার পরদিনই শ্রীরামগতি ঘোষাল গৃহত্যাগ ক'রে মাষ্টারিতে রিজাইন দিয়ে, একেবারে জন্মের মত সমস্ত ত্যাগ ক'রে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের রাতুল চরণে এসে আশ্রয় নিলেন।

শ্রীপাদের চরণতলে চিরদিনের মত শরণাগত হয়ে তাঁরই আশ্রয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। তাঁর অপূর্ব্ব শ্রীগুরু নিষ্ঠা! জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁর হৃদয়ে শ্রীগুরুই একমাত্র বসতিস্থল হয়েছিলেন। আমি বহুদিন তাঁর মধুময় সঙ্গ পাই, তাই তাঁর অপূর্ব্ব গুরুনিষ্ঠার কথা না লিখে থাকা যায় না। তিনি বহুদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গলাভ করেন ও তাঁরই আদেশ পালনে যত্নবান ছিলেন। হঠাৎ একদিন বরাহনগর পাঠবাড়ীতে অসুস্থ হন এবং শ্রীগুরু

পদ-চিন্তা ও নাম স্মরণ করতে করতে সাধক দেহ ছেড়ে, চিন্ময় ধামে চলে যান ; এখনও তাঁর স্মৃতি আমার প্রাণে এসে আঘাত করে।

তারপর শ্রীপাদের সঙ্গে আমরা শ্রীঅযোধ্যা ধামে এসে পৌঁছলাম। নাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে আমরা সবাই সরয্ নদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তায় বহু শ্রীবৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তনে এসে যোগ দিলেন। তাঁরা বলাবলি কচ্ছেন,—"শ্রীনবদ্বীপ ধাম থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব এসেছেন। এই কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মই শ্রেয় ধর্ম্ম, এঁদের এ-ধর্ম্মানুরাগ দেখতে পাচ্ছি। আহা! নাম সঙ্কীর্ত্তনের এমনই মহিমা!—আমরা জপ করতে বসেছিলাম তবুও নাম আমাদের আকর্ষণ ক'রে এঁদের কাছে নিয়ে এসেছেন। বলিহারি শ্রীমহাপ্রভুর দান।" তাঁরা ভক্তমালে শ্রীমহাপ্রভুর কথা কিছু কিছু পড়েছেন, আবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও পড়েছেন বলে তাঁরা শ্রীমহাপ্রভুকে মানেন এবং তাঁকে স্বয়ং ভগবান ও প্রেমাবতার বলে বিশ্বাস করেন।

তারপর আমরা সবাই সরয্ নদীতে স্নান ক'রে, একটী ষ্টেশনের কাছে ধর্ম্মশালা আছে, তাতেই রইলাম। আজই রাত্রের ট্রেনে চলে যাব। তাই স্নান ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা মহারাণী ও পরমভক্ত মহাবীরকে দর্শন ক'রে ধর্ম্মশালায় চলে এলাম। তাড়াতাড়ি খিচুড়ী ভোগ হল, প্রসাদ পেয়ে সবাই একটু বিশ্রাম করলেন। সেইদিন রাত্রেই আমরা ভাগলপুরে যাবার জন্যে ট্রেনে উঠলাম। সকালে শ্রীপাদের সঙ্গে ভাগলপুর এসে পেঁাছলাম। ভাগলপুরে ছুদিন নাম-কীর্ত্তনানন্দ হল। তারপর একদিন মাধোপোরা থেকে একজন ভক্ত এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে নিয়ে গেলেন। রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমরা ট্রেনে যাচ্ছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যে চিত্রপট সেবা হোতো, সেই চিত্রপট রেলের কামরার ভিতরে শয়ন করিয়ে, সবাই আমরা নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। এমন সময় ঐ চিত্রপট খানা চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেল! ভোরে ঘুম ভাঙতেই সবাই দেখলেন এই

ব্যাপার। শ্রীল বাবাজী মহাশয় খুব ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সবার অসাবধানতার জন্যই এই কাণ্ড হয়েছে। ছোট রমণদা'র একটী ছোট চিত্রপট ছিল, তাঁই সেবা হোতে লাগল। শশিদা'কে শ্রীপাদ কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, ঠাকুরের চিত্রপট তৈরী করবার জন্য। মাধোপোরায় দুদিন কীর্ত্তন করেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা ষ্টেশনে এসে পেঁ ৌছলাম। ঠাকুর চুরি হয়ে গেছে, তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রাণে সর্ব্বদাই হা হুতাশ; কেবল বলছেন, "আমাদের অপরাধই এর মূল কারণ। যদি তাঁকে সাক্ষাৎ দেবতা মনে ক'রে সেবা করতাম, নিষ্কপটে তাঁর অর্চ্চনা করতাম, তবে তিনি কখনও চলে যেতেন না। ভক্তের প্রীতিতেই তো তিনি বাঁধা থাকেন। তাঁকে সত্য-সত্য প্রীতি ভক্তি করিনি, তাঁর সেবার ত্রুটি করেছি, তাই তিনি সরে পড়েছেন।" এইসব বলতে বলতেই ট্রেনে উঠলেন।

শ্রীপাদের সঙ্গে বলাইদা' ও আমি আর চারুদা' সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন করতে এলাম। আর সবাই কলকাতায় চলে গেলেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথির উৎসবের পরদিনে আমরা এসে পেঁ ৌছলাম। শ্রীপাদ ঐ তিথিতে আসতে না পেরে আজ এসেই সাষ্টাঙ্গে লুটে পড়ে কত ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতে লাগলেন। তিনি সব ঠাকুরকে দণ্ডবৎ ক'রে, মাধবীলতার গাছ স্পর্শ ক'রে দণ্ডবৎ করলেন। তারপর তিনি আমায় ডেকে বললেন,—"কত একনিষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তেরা এখানে এসেছিলেন। সুবর্ণ বণিকদের শ্রীনিতাই চাঁদ বড় কৃপা করেছেন। তাঁদের মধুর প্রেম-ভক্তিও দান করেছেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। তিনি রেঁধে ভোগ দিতেন, নিতাইচাঁদ সেই প্রসাদ খেতেন। একদিন ব্রাহ্মণরা শ্রীনিতাই চাঁদের উপর দোষারোপ ক'রে বলেছিলেন, সুবর্ণ বণিকদের হাতে নিতাইচাঁদ খান। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নীচজাতি বলে অনেকে তাঁকে অবজ্ঞা করতেন। একদিন সবাই দেখতে পেলেন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত

ঠাকুরের গলায় স্বর্ণ পৈতা জ্বল জ্বল করছে। এই দেখে সবারই অবজ্ঞা-বুদ্ধি চলে গেল। ভক্ত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এর জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীনিতাইচাঁদ দেখিয়ে দিলেন! শ্রীকৃষ্ণ লীলাতেও এই রকম মুচী জাতি বাল্মীকিকেও রাজসূয় যজ্ঞের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় যুধিষ্ঠির পাকশালা গৃহে এনে তাঁকে প্রসাদ পাইয়ে, ভক্ত জীবন যাঁর তিনি যে সমস্ত জাতি হতে শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ বাক্যের সার্থকতাও দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমি শ্রীপাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দর্শন করছি! হঠাৎ শ্রীল বাবাজী মহাশয় দাঁড়িয়ে আমায় বললেন, "ঐ দেখ গর্ত্তের ভিতর সব ভক্তের অধরামৃত পড়ে আছে। ওখান থেকে ভক্ত অধরামৃত কুড়িয়ে নিয়ে আয়।" শ্রীপাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে, আমি কোন দ্বিধা না ক'রে, তৎক্ষণাৎ ভক্ত অধরামৃত কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। কুকুরও খাচ্ছিল সেই অধরামৃত। আমি অধরামৃত কুড়িয়ে এনে শ্রীপাদের হাতে দিলাম। দুহাত পেতে সেই ভক্ত-অধরামৃত নিয়ে তিনি নিজে খেয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন,"নে ভক্ত অধরামৃত খা।" শ্রীপাদ নিজে হাতে দিলেন, তাই আর কোন বিচার না করেই খেয়ে ফেললাম।

আমার এই অধরামৃত পাওয়া দেখে বললেন, "আজ থেকে তোর জাতি-অভিমান মুছে গেল; ভক্তের ও বৈষ্ণবের অধরামৃতে এত শক্তি।" শ্রীপাদ বলতে লাগলেন, "ভক্ত পদরেণু আর ভক্ত পদজল, ভক্ত ভুক্ত-অবশেষ তিন সাধন সম্বল।" শ্রীপাদের মতন এমন ক'রে ভক্ত ও বৈষ্ণবকে অকুণ্ঠ, নির্ব্বিচার ও সর্ব্বতঃপ্রসারী মর্য্যাদা দিতে আমি আর কাউকেও চোখে কখন দেখিনি, যা দেখিনি আমি কোনদিন তা অস্বীকার করতে দ্বিধা করব কেন?

তারপর আমরা দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে শ্রীপাদের সঙ্গে হাওড়ায় এসে পৌছলাম। আগের দিন শ্রীপাদের পারিষদবৃন্দ এসে পৌছেছেন। শ্রীপাদ ও আমরা তিনজন তার পরদিন এসে হাওড়ার ষ্টেসনে পৌছলাম। ষ্টেসনে বহু ভক্ত এসেছেন শ্রীল

বাবাজী মহাশয়ের দর্শন লালসায়। শশীদা'ও এসেছেন, ঠিক অবিকল পূর্ব্বের মত ঠাকুর তৈয়ারী ক'রে ষ্টেসনে নিয়ে এসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দেখে শান্ত হোলেন এবং 'ঠিক হয়েছে' বলে আনন্দে উৎফুল্ল হোলেন। পাঁচুদা' এস, সি, আড্ডি, বলাই আড্ডি প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা এসেছেন। তারপর ঘোড়ার গাড়ী ক'রে আমরা দর্জ্জিহাটার মঠে এসে পেঁাছলাম।

প্রায় ১ মাস পরে আমরা কলকাতায় এলাম। এই দীর্ঘদিন কলিকাতাবাসী ভক্তেরা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শনলাভ না পেয়ে মরমে মরে আছেন! আজ শ্রীল বাবাজী মহাশয় এসেছেন, তাঁর রাতুল পাদপদ্ম দর্শন লাভের জন্য কত-কত ভক্ত ও ভক্তিমতী মা-রা, বৌ-রা, সব এসে ভিড় কোচ্ছেন, তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মুখে প্রায় সময়ই মৃদুমন্দ হাসির লহরী খেলিত। যাঁরা সেই সময় তাঁর সঙ্গ-লাভ পেয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের মৃদুমন্দ হাসির কি মাদকতাময়ী শক্তি। দর্জ্জিহাটা মঠে আর তিলার্দ্ধ জায়গা নেই। হরিদা', বটুকাকা সব সেবার যোগাড় করেছেন, বটুকাকার বেশ মেয়েলী মেয়েলী ভাব দেখেছি, তিনি খুব সেবা পরায়ণ, এবং মাতৃ ভাবে সব মানুষকে সেবা করতেন, তাই তাঁকে সবাই মাসী বলে ডাকত। পাঁচুদা' বললেন "আপনারা কেহই যাবেন না, সবাই প্রসাদ পেয়ে তবে যাবেন।" চাল ডাল তরিতরকারী পাঁচুদা' রাশীকৃত এনে যোগাড় ক'রে রেখেছেন। তখনই আমরা সবাই গিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে এলাম। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কখনও গঙ্গাজল ছাড়া ঠাকুরের ভোগ করতে দিতেন না। এখন অনেকেই কলের জলে ভোগ রান্না ক'রে ভোগ দেন, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দেখেছি যে তিনি গঙ্গাজলে স্নান না ক'রে ও গঙ্গাজলে রান্না ভোগ ছাড়া কখনও কিছু গ্রহণ করতেন না। এমন-কি কলিকাতায় কলেরা-মহামারীর প্রকোপ হলেও তিনি গঙ্গাজলই খেতেন। এ-নিষ্ঠা তাঁরই দেখেছি।

বহুদিন পরে কলিকাতায় এসেছেন। আজ নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। সেখানে সিঁড়ির উপরে বসে মালা জপ কোচ্ছেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন,—"শ্রীগুরুদেব এই কলিকাতাতেই আমায় থাকতে বলেছেন এবং এখানে বসেই নাম-গুণ প্রসঙ্গ করতে হবে। তাই কলিকাতা ছেড়ে থাকতে আমার ভাল লাগেনা। এ আমার যেন একটা তীর্থভূমি! এই সুরধুনী তীর, নিতাই গৌরের পদাঙ্কিত ভূমি, এখানে এলেই আমার প্রাণ ভরে যায়। আবার এখানে কীর্ত্তনের যত স্ফূর্ত্তি হয়, এমন আর কোথায়ও হয় না। সেই পাগলা প্রভুর কথা সর্ব্বদা মনে পড়ে। প্রথম এইখানেই করতাল নিয়ে পথে পথে নাম করে বেড়াতুম। তাঁর আদেশ কলকাতায় থেকে নাম করা।" শ্রীপাদ আবার বলছেন আমায়, "নিমতলার ঠাকুরবাড়ী দেখেছ? ঐ যে-গোঁসাইকে দেখলে, আসবার সময় আমি যাঁকে দণ্ডবৎ করে এলাম ওঁদের ওখানে এক বেলা প্রসাদ ওঁরা আমায় দিতেন, দুপুরে পেতাম; আবার রাত্রে যতীন মিত্রের বাড়ী দর্জ্জিপাড়ায় প্রসাদ পেতাম, এমনি করেই কলকাতায় থেকে আমি নাম করতাম। আজকাল ঠাকুর কত অনুকূল ক'রে দিয়েছেন।"

শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় বলছেন, "একবার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা কুণ্ডের তীরে আমি বসে আছি। পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়, শ্রীরাম হরিদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয় সেখানে আছেন। আমাকে তাঁরা সবাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন, 'আচ্ছা রাম, তুমি এই বৃন্দাবন ধামে কেন থাকনা? এই ধাম-আশ্রয়ই তো ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন, কেন থাকনা তুমি'।" আমি সশ্রদ্ধায় নিবেদন করলাম 'এর একটা কারণ আছে। শ্রীগুরুদেব কলিকাতায় থেকেই নাম করতে বলেছেন; তাই তাঁর আদেশই শিরোধার্য্য। তারপর আমার একটা খুব লালসা কলিকাতায় থাকবার জন্য। তার কারণ আমি বলছি শুনুন। কলিকাতা

মহাশয়ের আহ্নিক শেষ হোলো। প্রায় তখন সাড়ে ৩টা বেজেছে! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সবার প্রসাদ পাওয়া হয়েছে।" আমি বললাম, "হাঁ, হয়ে গেছে।" এইকথা শুনে, শ্রীপাদ আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, তবে প্রসাদ পেতে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এত দেরী ক'রে প্রসাদ পান কেন? সবার খাওয়া হয়ে যাবে তারপর আপনি প্রসাদ পাবেন!" গুরু যে তিনি তো আগে খাবেন, তারপর শিষ্যরা খাবে, কিন্তু আপনার কাছে উল্টো ব্যাপার।" তিনি হেসে বলছেন, "শিষ্য হোচ্ছে শ্রীগুরুর প্রকাশ-মূর্ত্তি। গুরু-সেবা ও গুরু-ভক্তি আমরা করি নাই, তাই শ্রীগুরুদেব যুগপৎ শিষ্য-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে নিজেকেই শ্রীগুরুসেবা করেন। বুঝতে পেরেছিস আমার কথা?" আমি বললাম,—"এ-কথা আমি বুঝতে পারিনা। আমি জানি গুরু চিরদিনই গুরু, তিনি কোন সময় লঘু নন। শিষ্য সে চিরদিনই শিষ্য, সে আবার গুরু হবে কি ক'রে?" শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমার কথা শুনে হাসলেন। চারুদা' বললেন, "ঠিক বলেছিস তুই।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাচ্ছেন আর আমাদের সঙ্গে কত গল্প গুজব কোচ্ছেন! চারটে বেজে গেল, প্রসাদ পেয়ে উঠে পান প্রসাদ পেলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে রস খেয়ে আমাদের হাতে প্রসাদি পান দিলেন। চারুদা,' রমণদা', মদনদা', বলাইদা', কাড়াকাড়ি কোরে খেলেন। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করতে শুয়ে পড়লেন। চারুদা'র ছুটী ফুরিয়ে এসেছে, বলাইদা'রও তাই, যুগলদা' অনেকদিন দোকানে যাননি তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম ক'রে উঠলে, তাঁকে দণ্ডবৎ ক'রে বাড়ী যাবেন, এই কথা আমায় বললেন।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে চারুদা', নন্দদা', মাখনদা', যুগলদা', বলাইদা' বলাই আড্ডি, ডাক্তারদা' প্রভৃতি শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ ক'রে চলে গেলেন। তারপর শ্রীল বাবাজী মহাশয় আমায় সঙ্গে ক'রে তালতলায় এক ভক্তের বাড়ী নিয়ে গেলেন। নরসিং বুড়ো বলে

এক বৃদ্ধ শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য আছেন, তিনি শ্রীবাবাজী মহাশয়কে দেখা মাত্রই উঠি-পড়ি ক'রে চেচাচ্ছেন, "ওরে তোরা আয়রে, দাদা এসেছেন। ওরে হরিমতি ওরে খুকু, ওরে পিসি শীগ্‌গির আয়, দেখবি কে এসেছেন! তিনি এই বলতে বলতেই আমরা দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা মাত্রই, সব যেন পাগল-পারা হয়ে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীপাদ-পদ্মে লুটে পড়ল। আঁখির জলে সবার মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। তাঁরা বলতে লাগলেন, "এই দীর্ঘ একমাস আপনাকে দেখতে পাইনি, একটু সেবা করতে পাইনি! এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।" শ্রীনরসিং বুড়ো কেঁদে কেঁদে বলছেন, "দাদা আমাদের উপর নিষ্ঠুর হয়ে থেকোনা। তোমায় যদি না দেখতে পাই, সেবা করতে না পাই তবে আমাদের বাঁচা থেকে মরাই ভাল।" তাঁদের এইসব প্রীতি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাড়ীর ছেলেরা মেয়েরা ও বৌ-রা সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। সবাই একপ্রাণ, অপূর্ব্ব তাঁদের ভগবৎ সেবা, তারপর তাঁদের এত শ্রীগুরুপ্রীতি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তাঁরা জাতিতে সুবর্ণ বণিক কিন্তু গৃহে মাছ মাংস ডিম কেউ কখনও খান না। সবাই ঠাকুর সেবা করেন, ভোগ আরতি করেন, কেউ প্রসাদ ছাড়া কিছুই খাননা। ভাবলাম, কই! কত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও এমন ঠাকুর সেবাত দেখিনা; এমন সাত্বিক আহার বিহারও দেখিনা! তারপর ভাবছি—শ্রীগুরু পদে এত প্রীতি ভক্তি তো দেখতে পাইনা; এঁদের ভিতর যে শুদ্ধাচার দেখেছি তা অন্য লোকের মধ্যে খুব কমই দেখি; তারপর দেখতে পাচ্ছি এঁদের ভিতর অনেকেই প্রায়ই শ্রীগৌর কিশোরের ও শ্যাম সুন্দরের উপাসক, আবার এঁদের বৈষ্ণব সেবা অতুলনীয়। অন্যত্র এমন দেখতে পাইনা। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শেষ জীবনে প্রায় আঠার বৎসর ধরে তাঁর অগণিত ভক্তের সঙ্গে তিনি পোস্তায় সখীসোনা দাসীর (পোস্তার রাণী) বাড়ী থেকে নাম প্রেম প্রচার কর্ত্তেন।

অতবড় রাজবাড়ীর তিনতলার উপর বৈঠকখানা ঘর, বৈষ্ণবখণ্ড, রসুই ঘর, ঠাকুর ঘর, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের থাকবার ঘর প্রভৃতি করাইয়া তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তেতালা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নীচের তলায় বাস করতেন। যত সাধু বৈষ্ণব শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করতে আসতেন, রাণীদি' সর্ব্বদা অম্লান বদনে সেবায় তাঁদের তুষ্ট ক'রে শ্রীগুরু-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাতেন। উৎসব লেগেই থাকত। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত কাউকেই যদি দেখতেন, যদি শুনতেন যে এই ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য, অমনি অম্লান বদনে তিনি অতি দীন-দরিদ্র হোলেও তাঁকে তিনি আপন করে নিতেন ও কত সেবা যত্ন করতেন! শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনীলাচলবাসী শ্রীবৈষ্ণব বা শ্রীনবদ্বীপ ধামের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বা কোন সাধু সন্ন্যাসী এলে আর কোন-কথা নেই অমনি তাঁদের সেবা যত্ন ক'রে দিদি নিজেকে ধন্যা মনে করতেন। এর একমাত্র কারণ, পরম করুণ ও উদার শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় ক'রে তাঁর শিষ্যা হয়েছিলেন বলে তিনি এই উদারতা-গুণ লাভ করেছিলেন। তিনি কত-কত গোস্বামী সন্তান ও কত ব্রজবাসি-দের যে সেবা করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। সেবা যত্ন ক'রে প্রতিদান পাবার কোনই আশা না রেখে, যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও আচার্য্য সন্তানদের ও ব্রজবাসিদের সেবা ক'রে সতত ধন্যা বোধ করেন, তাঁর সেবা-মহিমার বিশালতা অবর্ণনীয়। দর্ম্মাহাটা মঠ ছেড়ে শ্রীপাদ গণসহ সুদীর্ঘ আঠার বৎসর ঐ পোস্তার রাজবাড়ীতে ছিলেন। শ্রীগুরুসেবার কি মহান আদর্শ!

শ্রীল বাবাজী মহাশয় ও আমি শ্রীনরসিংহ বুড়োর বাড়ীতে পরমানন্দে কয়দিন থাকলাম, কত ভক্ত এসে দেখা কোচ্ছেন। কত কত জনার বাড়ীতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন হোচ্ছে; মহোৎসব হোচ্ছে! সে-যেন একটা মহা আনন্দের হাট বসে গেছে! মধ্যে মধ্যে দর্ম্মাহাটা থেকে সবাই এসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নাম-কীর্ত্তন করেন, মহোৎসব করেন। পাঁচ সাতদিন সেখানে

কেটে গেল। শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয়ের পদাঙ্কিত ভূমি ঐ তালতলা ও ডাক্তার লেন ;—তাই আমাদের শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ও-স্থান যেন তীর্থভূমি ; সেইজন্য যখন তাঁর ওখানে কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তনের শেষে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের কথা বলে, তাঁর বিহারভূমি বলে, পদাঙ্কিত ভূমি বলে তিনি কত আকুল হয়ে কাঁদেন! ওখানে পুলিনবাবুদের বাড়ীতেও যেতেন। সেন-লা'দের নাম সবাই জানে, পুলিন বাবু তখন অনেক সময় শ্রীপাদের সঙ্গে থাকতেন। ৪০ বৎসরের কথা সবার নাম আমার মনে নাই, তাই সব বাড়ী আমি ঠিক মনে করতে পাচ্ছিনা, প্রায়ই শ্রীল বাবাজী মহাশয় ওখানে কীর্ত্তন-আনন্দ ও মহোৎসব করতে যেতেন। ওখানে ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতেও কত উৎসব ও নাম-আনন্দ তিনি করতেন। শীতকালে শ্রীল বড় বাবাজী মহাশয় প্রায়ই কলিকাতায় ওখানে শুভাগমন করতেন এবং বহু ভক্তের বাড়ীতে উৎসব, কীর্ত্তন-আনন্দ ও কতজনকে নাম-মন্ত্র-দান ক'রে কৃতার্থ করতেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় সেই এক-এক বিশিষ্ট তিথি স্মরণ ক'রে, এক-এক বাড়ীতে গিয়ে তাঁর বিরহ কীর্ত্তন ক'রে অগণিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করতেন।

পরমানন্দে আমাদের দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে। তখন দর্ম্মহাটা মঠে আছি। একদিন দর্জ্জিপাড়ায় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা অষ্টপ্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন করতে গেলাম। অপূর্ব্ব অধিবাস কীর্ত্তন হোলো, অষ্টপ্রহর নাম খুব জমে গেল, কত-কত শিক্ষিত লোক এসে কীর্ত্তন শুনলেন! আজ নগর-কীর্ত্তন হবে, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা দর্জ্জিপাড়ার পথে কীর্ত্তনে চলেছি, তখন একটা ঘটনা ঘটে গেল ,—সে ঘটনাটি আমার মনে সর্ব্বদা অঙ্কিত হয়ে আছে ; তাই যথাযথ বর্ণন করছি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় দর্জ্জিপাড়ার একটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন ধরলেন, "পাষণ্ড দলন বানা নিত্যানন্দ রায়রে, নিতাই আমার আগে নাচে আগে গায় গৌরাঙ্গ বোলায়রে।" এই পদ

গাইতে গাইতে এমন ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে তা লিখে বোঝান যাবে না। দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে, এক-একবার কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে। থরথর কাঁপছেন! খুব মাতন কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো। খুব উদ্দণ্ডনৃত্য হোচ্ছে, অসংখ্য লোক এসে জমেছে। এমন সময় আমার হঠাৎ নজর পড়ল,—একটা বাড়ীর ভিতর থেকে একটি বাবু বেরিয়ে এলেন। আমি কীর্ত্তনের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কাছেই এসে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরটা টলছে, মদের গন্ধ পাচ্ছি তাঁর মুখ থেকে;—বেশ মদের নেশায় শরীরটা টলটলায়মান দেখছি! তবুও দেখছি, তিনি হাতে তালি দিয়ে বেশ তাল দিচ্ছেন। কীর্ত্তন প্রায় একঘণ্টা শ্রীল বাবাজী মহাশয় সেখানে দাঁড়িয়ে করলেন। তারপর—প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌর হরি হরিবোল,—বলতে বলতে শ্রীল বাবাজী মহাশয় দর্জ্জিপাড়ার পথ ধরে চলতে লাগলেন। মদের নেশা একটু কেটেছে, হঠাৎ অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন,—"ঠিক ত আমার জীবন বিফলে গেল, আর না।" এই কথা যখন আমার কাণে এসে পৌঁছিল তখন আমি তাঁর দিকে তাকালুম;—দেখি ছল-ছল নেত্র তাঁর। আমায় দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এঁনার নাম কি, কোথায় থাকেন?" আমি বললাম, "ইঁহার নাম শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়, আমরা সবাই তাঁর শিষ্য, ইনি নাম-সংকীর্ত্তন ক'রে সর্ব্বদা মানুষকে শোনান। সম্প্রতি দর্ম্মহাটার মঠে থাকেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কত নম্বরে থাকেন।" আমি বললাম "একশত নব্বই নম্বর দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।" তারপর তিনি চলে গেলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় নগর কীর্ত্তন ক'রে নাম-যজ্ঞের স্থানে এসে কীর্ত্তন সমাপ্তি করলেন।

তারপর সবাই স্নান আহ্নিক সেরে প্রসাদ পেয়ে তিনটার সময় কেউ-কেউ গাড়ী করে, কেউ-বা হেঁটে হেঁটে দর্ম্মহাটার মঠে এসে পৌঁছলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে

মেঘলালদা' ও আমি এলাম! শ্রীল বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করবার জন্য শয়ন করলেন। আমরাও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে নীচে শুয়ে পড়লাম। বিশ্রাম ক'রে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শৌচাদি সেরে খাটে বসে মালা জপ কোচ্ছেন; তখন বেলা পাঁচটা হবে। বিকেল হয়েছে, তাই আস্তে আস্তে দুই-চারজন ক'রে ভক্তরা তাঁকে দর্শন করতে আসছেন। এমন সময় দেখি সেই দর্জ্জি-পাড়ার মাতাল বাবুটি এসেই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে লুটে পড়লেন এবং সজল নয়নে বলতে লাগলেন,—"আমায় উদ্ধার করুন প্রভু, মহাপতিত, মদ্যপ, দুরাচার আমি।" এই কথা বলতে বলতে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর এই আর্ত্তিভরা কথা শুনে,—জয় নিতাই, জয় শ্রীরাধারমণ, বলে—উঠে বসতে বললেন।

তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কথায় উঠে বসে জোর হস্তে বলতে লাগলেন,—"প্রভু! আমায় করুণা ক'রে উদ্ধার করুন এবং শ্রীচরণাশ্রয় দিয়ে আমায় ধন্য করুন। আমার জীবন এতদিন বৃথাই কেটে গেছে, আজ আপনাকে দর্শন ক'রে ও আপনার মুখে নাম-কীর্ত্তন শুনে আমার চেতনা এসেছে। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হেলায় কাটিয়ে দিয়েছি, এইবার আমায় মন্ত্র দীক্ষা দিন।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় করুণায় আপ্লুত হয়ে বললেন,—"নিতাইচাঁদ পতিত পাবন, তিনি নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন, ভাবনা কি আপনার!" এই সব কথা কইতে কইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সন্ধ্যা-আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ হোলো, তারপর নাম সঙ্কীর্ত্তন হোলো, তিনি আর বাড়ী সে রাত্রে গেলেন না; আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে আমাদের দর্মাহাটার মঠেই থেকে গেলেন। তিনি পরদিন সকাল সকাল গঙ্গাস্নান ক'রে এসে বসলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের স্নান আহ্নিক হয়ে গেল, তাঁকে দীক্ষা দেবার জন্য ডাকলেন। তিনি এসে বসলেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয় কত প্রার্থনা-কীর্ত্তন ক'রে, তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষা অন্তে তিনি চোখের জল ফেলছেন আর কেবল বলছেন,—"জয় পতিত পাবন শ্রীগুরুদেব। জয় পতিত পাবন শ্রীগুরু দেব।" তখন তাঁর কত আর্ত্তি, কত ব্যাকুলতা! শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপা লাভের পর তিনি সমস্ত বিলাসিতা, মদ্য ও মাংসাদি সব ত্যাগ ক'রে কণ্ঠে তুলসী ও তিলক ধারণ ক'রে নাম-জপ কীর্ত্তন, আহ্নিক ও পূজা নিয়েই জীবন কাটাতে লাগলেন। তাঁর নাম শ্রীললিত মোহন দাস, দর্জ্জিপাড়ার বেশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। তাঁর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সবই আছেন। আর বাড়ী যান না, প্রায় সময়ই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকেন। মঠেই থাকেন। কখনও কখনও শ্রীল বাবাজী মহাশয় বলেন,—এক-একবার তুমি বাড়ী যেয়ো। তাঁর আদেশে এক-একবার যান। মাসের মধ্যে প্রায় ২৯ দিনই মঠে থাকেন। কখনও কখনও এক বেলার জন্য এক-একবার গৃহে যান। সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ ক'রে তিনি মাত্র ছোট্ট এক টুকরা কাপড় পরেন. যেন বৈরাগ্যবান একজন বৈষ্ণব সাধু; সর্ব্বদা মালা জপ করেন—সাধু বৈষ্ণব দেখলেই ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপা লাভ ক'রে সবাই বাড়ীতে ভগবৎ সেবা ও সাত্ত্বিক আহার বিহারে জীবন কাটাতে লাগলেন।

এই সময় দর্মাহাটা মঠে আমার খুব জ্বর হোলো। শ্রীল বাবাজী মহাশয় পুরুলিয়ায় কীর্ত্তন করতে যাবেন। আগের বৎসর আমি পুরুলিয়ায় নস্কু বাবুদের বাসায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যাই। তিনি কত আনন্দ, কত কীর্ত্তন উৎসব সেখানে করেন! এবার আর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে আমি যেতে পারবো না, জ্বর হয়ে পড়েছে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন, "তুমি কয়দিন থেকে সুস্থ হও, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।" শ্রীপাদ ললিতবাবুকে বললেন, "আমরা চলে যাবো, দশ-পনর দিন পরে আসব, তুমি একে নিয়ে তোমার

বাড়ীতে রেখে সেবা যত্ন ক'রে সুস্থ কোরো। আমি এলে তোমরা এসো।" ললিতবাবু কাজ-কর্ম্ম সবই ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রীপাদ বললেন, "একটু ঘুরে সন্ধ্যার সময় আসব, আমি এলে একটা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে এ-কে তোমার বাড়ী নিয়ে যেয়ো।" ললিতবাবু বললেন,—"যে আজ্ঞে।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় রাত্রি ৮টার সময় ঘুরে এসে ললিত বাবুর হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললেন, "এই দিয়ে তার সেবা কোরো।" আমি কেঁদে ফেললাম, ছোট তখন আমি। শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন, "ললিত বাবু খুব যত্ন করবেন, সেখানে থাক ; কাছে চারু ও বলাই থাকে, তাদেরকেও আমি বলে যাবো। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব, কাঁদছ কেন?" আমি শুনে আশ্বস্ত হোলাম, তারপর ললিতবাবু আমাকে ধীরে ধীরে একটা গাড়ীতে ক'রে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আবার বলাইদা'ও চারুদা'র সঙ্গে দেখা হোলো। বলাইদা'র ছেলে অরুণ ও মেয়ে লালী উভয়েই খুব ছোটো। বলাইদা'র স্ত্রীও সেখানে আছেন ; খুব বাৎসল্যময়ী প্রাণ, তাঁকে মা বলে ডাকতুম, সেখানে তাঁদের যত্ন ও সেবায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

কিছুদিন পরে শ্রীল বাবাজী মহাশয় ফিরে এলেন। আমাকে নিয়ে ললিত বাবু দর্ম্মহাটার মঠে এলেন। তারপর আর কখনও ললিত বাবু গৃহে গেলেন না;—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কাছে দর্ম্মাহাটা মঠে থাকেন ; শ্রীনীলাচল ধাম, শ্রীনবদ্বীপ ধাম ও যেখানে-যেখানে শ্রীল বাবাজী মহাশয় যেতেন সেখানে তাঁর সঙ্গে তিনি ছায়ার মত থাকতেন। শ্রীল একদিন ললিতবাবুকে আদেশ করলেন,—"বরাহনগর শ্রীপাঠ-বাড়ী আশ্রম আমাদের হয়েছে, তুমি সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবার ভার নিয়ে থাকবে, আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে যাবো, আমার সঙ্গে দেখা হবে।" শ্রীগুরু আদেশ বলবান জেনে তিনি শ্রীপাঠবাড়ীতে চলে এলেন এবং জীবনের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে ঐ শ্রীপাঠবাড়ীতে থেকে সাধন ভজনে জীবন কাটালেন। তিনি বলতেন, "এই খানেই আমার সব আছে। নিতাই-গৌর, জগন্নাথ, যুগলকিশোর ও

শ্রীগুরুদেবের ঘর সবই আছে।" তাই আর কোথাও যাবার ইচ্ছা করতেন না। তখন শ্রীনীলরতন কাকা, রামগতি মাষ্টার, গুরুদাস, মনীগোপাল ও শ্রীনগেন কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা থাকতেন। মঠ ভালভাবে তখনও গড়ে ওঠেনি। আস্তে আস্তে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কৃপায়, নাট মন্দির, গ্রন্থ মন্দির, ঠাকুরের মন্দির বৈষ্ণব খণ্ড প্রভৃতি সব গড়ে উঠল। তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ভক্ত পুলিন চন্দ্র দে ডাক্তার লেনে থাকেন। সেন-ল' এণ্ড কোং বলে মস্ত বড় তাঁদের দোকান। তিনি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের চরণাশ্রয় ক'রে এই আশ্রমের খুব সেবা করতেন। তিনি তখন শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের খুব অনুগত। এখনও তিনি আছেন, শরীর অপটু হয়েছে, চোখে কম দেখেন; তাই মধ্যে মধ্যে মঠে আসেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অনুগ্রহে ও তাঁরই আদেশে আস্তে আস্তে আশ্রমটি পুলিন বাবু খুব যত্নে গড়ে তোলেন। অবশ্য শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অপার করুণায় আরও কেউ-কেউ সেবার সৌভাগ্য পান। কিন্তু তাঁর করুণা ছাড়া কেহই আশ্রমের কিছুই করতে পারেন না! তাঁর কৃপা ব্যতীত এই মায়া মুগ্ধ জীবের কিছুই করবার সামর্থ নাই,—ইহা আমরা বুঝিনা বলেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি। তবুও শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের করুণা এত বিশাল যে আমাদের মতন পতিত অধমদেরও তিনি শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে তাঁর সুশীতল চরণ-পাশে রেখেছেন! তাঁর করুণার কথা বলতে গেলে ওর পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অযাচিত করুণায় আপ্লুত হয়ে তাঁর সুশীতল চরণাশ্রয়ে আশ্রয় দিয়ে আমাদের রেখেছেন! কিছুদিন পরে পুলিন বাবু সেবা ছেড়ে দেন, তারপর বঁড় গোপাল দাস ও কেদার ঠাকুর সেবার ভার নিয়েছেন। কত-কত অফুরন্ত লীলা-কাহিনী শ্রীপাদের! কত টুকুই-বা আমি জানি! আর কতটুকুই বা বর্ণন করব! একদিন শ্রীপাদের কাছে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত কত ভক্তি সিদ্ধান্ত শুনছি;

তিনি বলছেন, "গোড়াই ফাঁক। ভিত ভাল হলে তবে দালান টেকসই হয় এবং দালানের ক্ষতি হয় না, বহুদিন থাকে। তারপর আবার কি জান, কৃপায় সব হবে, কৃপাই বলবতী। কৃপাতেই সব প্রেমভক্তি লাভ হয়। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যায়না।" এইরূপ কত কথা বলছিলেন, আমরা নিঝুম হয়ে শুনছি। হঠাৎ কয়জন মনীষী-ভক্ত আসলেন। শ্রীপাদ তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথা থেকে এলে."—তিনি বললেন,—"ভাগবৎ ধর্ম্ম কীর্ত্তন কচ্ছিলাম। কত লোক যে এসেছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না! ঠাকুরের কৃপায় স্ফূর্ত্তিও খুব হোলো, বেশ বললাম, সব থ মেরে গেল।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় একটু হাসলেন। আবার শ্রীপাদ একজনাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কোথা থেকে এলে।" তিনি বললেন,—"বহু জায়গায় আমি নাম-কীর্ত্তন করেছি। নামে এমন আনন্দ হোলো যে সবাই নাচতে লাগল, যেন আনন্দের পাথার বয়ে গেল। ঠাকুর এমন সব অর্থের স্ফূর্ত্তি করালেন যে তা আমি চিন্তাও করতে পারি নাই! কি কৃপাই করলেন ঠাকুর!" আবার আর এক জনকে শ্রীপাদ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তিনিও ঐ রকম উত্তর দিলেন। এক পাশে বসে তাঁদের আত্মশ্লাঘা শুনে আমার বেশ একটু রাগ হয়েছে;—যাঁর কৃপায় সব কিছু, তাঁর মহিমা তো কেউ উল্লাস ভরে বলছে না, আমার শ্রীবাবাজী মহাশয়ের করুণাতেই সব বড় হয়েছেন; তিনি হাত ধরেছেন, তাঁর কৃপাতেই আমাদের সব, অথচ তাঁর মহিমা হেন স্তিমিত ক'রে কথা বলছেন আর প্রকাশ করছেন নিজেদেরই মহিমা! ঠাকুরের দয়া, মহাপ্রভুর দয়ার কথাও একটু আধটু বলছেন বৈকি! তখন আমি ভাবছি, একটা কিছু বলবো এখানে। শ্রীল বাবাজী মহাশয় চুপ ক'রে বসে মৃদুমন্দ হাসছেন, আর নাম জপ কচ্ছেন! আমি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে জোড় হাত ক'রে বলছি,—"আমায় একটা কথা বলতে যদি আপনি আদেশ করেন তো বলি; ওনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে

বললাম, আপনাদের কথা সব শুনলাম; এখন আমার কথা একটু শুনুন।" তাঁরা বললেন,—"বেশতো বল।" শ্রীল বাবাজী মহাশয় বললেন, "কি বলবে বলনা।" আমি বলতে লাগলুম, "আমি যখন বারো বৎসরের বালক তখন এক পাগল একটা ঘরে দিশালাইয়ের কাঠি ধরিয়ে আগুন দেয়। তৎক্ষণাৎ আগুন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। বাজার পুড়ে ছারখার হয়। বাঁশের গেরো সব পুড়ছে আর ফট্ ফট্ ক'রে খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছে। কে আগুন দিয়েছে, কেউ ধরতে পারছে না! আমি নদীর ধারে গিয়ে দেখছি, যে সেই পাগলটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি হাতে ক'রে আমায় দেখাচ্ছে আর বলছে, 'দেখ ঠাকুর, আমার হাতের মাল হাতেই রয়েছে, এর ফট-ফটানি দেখছো তো? কেমন বাঁশের গেরো ফুটছে'?" যেই এ কথাটি বলা আর শ্রীল বাবাজী মহাশয় হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন,—"খুব দামী কথা বললিতো!"

এই কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে উঠে পড়লেন, শ্রীল বাবাজী মহাশয়ও শৌচে চলে গেলেন। ঠিক এমনি ভাবে শ্রীগুরুদেবের কাছেই সব কলকাঠী, তিনি যাকে যেমন নাচাবেন সে তেমনিই নাচে, ভাল সব তাঁর হাতে। মন্দ যাহা তাহা আমাদের ইচ্ছার বশে স্বতন্ত্রতা দোষে হয়। শ্রীপাদ কৃপার কথা বলেছিলেন, তাই এই কথাটি আমি বলে ফেললাম। দীর্ঘ দিনের কথা কিন্তু ঠিক জায়গায় কথাটি বলে ফেলেছিলাম। সবাই বলছেন,—বেশ কথাটি বলেছ, একেবারে সব চুপ করিয়ে দিলে! এইরূপ ভাবে কত আনন্দে তাঁর সঙ্গে আমাদের দিন কেটে গেছে। ৪৫ বৎসর ধরে তাঁর কত অফুরন্ত লীলা কাহিনী দেখেছি। আমি আর কতটুকুইবা জানি যে তা বর্ণন করব।

আমাদের শ্রীপাদের সঙ্গে দর্ম্মাহাটা মঠে পরমানন্দে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। রোজই প্রায় কলকাতা থেকে কীর্ত্তনের খবর আসে। শ্রীপাদের সঙ্গে সবাই আমরা কীর্ত্তনে যাই; কত মহোৎসব,

কত কীর্ত্তন-আনন্দ হয়। এই দর্ম্মাহাটা মঠে বহু ভক্তের দর্শন পাই। এই সময় শ্রীপাদের সঙ্গে শ্রীবটু কাকা, হরিদা', কাল হরিদা', বড় গোপাল, গৌর, রাম চরণ, শান্তি দা', কৃষ্ণদা', শশীদা' কৃষ্ণকমল দা', শ্রীরাধাচরণ দা', রমণদা', ছোট রমণ, শ্রীফণীকাকা, শ্রীনন্দকাকা, শ্রীমধুজ্যেঠা, শ্রীবিশ্বনাথ দা,' শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী, (ইনি ভারতের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন) মাখন, নিতাই, মদনদা', হরেকেষ্ট দা', গৌর হরি, মেঘলাল দা'. দয়াল, উদ্ধব প্রভৃতি বহু ভক্ত তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁরা শ্রীপাদের সঙ্গে দেশ-বিদেশে কীর্ত্তন-আনন্দে বেড়াতেন ;—শ্রীনীলাচল, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন ধাম ও প্রভুর লালাস্থলী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পরমানন্দে তাঁদের দিনগুলো কাটত।

আমি মধ্যে মধ্যে শ্রীপাদের কাছে আসতুম, আবার চলে যেতাম। একবার আমার মনে হোলো,—খুব নির্জ্জন স্থানে বসে বসে ভজন করি, কোন লোকের সঙ্গে দেখা করব না ; কীর্ত্তন ক'রে আর ঘুরে বেড়াব না ; এখানে আর থাকব না, অন্য প্রকারে সাধন-ভজন করব। শ্রীপাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে প্রথমে কাশী গেলাম, সেখানে মস্তক মুণ্ডন ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি বড় স্নেহবশে কাছে রাখলেন ! সেখানে স্বরূপদা'র সঙ্গে, মদনদা'র সঙ্গে খুব প্রীতি হোলো। কয়দিন তাঁদের কাছে থেকে রাগে শ্রীরজনীদা'র কাছে গেলাম। তাঁর কাছে কয় দিন থেকে তারপর তাঁর সঙ্গে লীলাস্থলী সব দর্শন ক'রতে গেলাম। রজনীদা'র সঙ্গে বর্ষান, নন্দগ্রাম, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন ক'রে এসে শ্রীগৌরাঙ্গদা'র মধুময় সঙ্গ পেয়ে আমার দিন আনন্দেই কাটতে লাগল। কিছুদিন তাঁদের কাছে থেকে তারপর মন উতলা হোলো। তাই আমি ভাবলুম,—বিন্ধ্যাচলে যাবো, পাহাড়ের উপর বেশ নির্জ্জন স্থান, সেখানে আমাদের চেনালোক কেউ নেই। সেখানে গিয়ে আমি আপন মনে ভজন করব, এই মনে ক'রে বিন্ধ্যাচলে

চলে এলাম। বেশ সুন্দর একটী নির্জ্জন গুহায় বসে বসে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের প্রদত্ত নাম-মন্ত্র জপ করি! দিন-কুড়ি মাত্র কেটেছে। সন্ধ্যার সময় বসে জপ কচ্ছি, একটু তন্দ্রা এসেছে, শুয়ে পড়েছি। অমনি দেখছি—শ্রীল বাবাজী মহাশয় সামনে এসে বলছেন,—"এখানে বসে ধ্যান-জপ করছ! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, সবাই আসছে আমার কাছে, কেবল তুমি এখানে বসে আছ!" স্বপ্ন দেখে চকিতের মত আমি উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে আমি তাকিয়ে দেখি—কেউ কোথায়ও নেই। এমনি ভাবে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পেয়ে আর থাকতে পারলুম না। তখনই ষ্টেসনে এসে কলকাতায় রওনা হলাম। আমার মন খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েছে শ্রীপাদকে দেখবার জন্য। তাই তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমেই ঘোড়ার গাড়ী ক'রে দর্ম্মাহাটা এসেই আমি দেখতে পেলাম,—শ্রীপাদ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেশ বিদেশ থেকে বহু ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। গৌরাঙ্গদা' ও রজনীদা' এসেছেন। আমি দূর থেকে দণ্ডবৎ করেই শ্রীপাদের কাছে এসে বসলাম। তিনি শুয়ে আছেন, আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—"যারা ধ্যান-জপ নিয়ে থাকে, তাদের দর্শন দিলে বা ডাকলে তবে দেখা পাওয়া যায়।" এই কথার হেঁয়ালি আমি ছাড়া আর কেউ বুঝলো না। আমি এই কথা শুনে নীরবে কাঁদতে লাগলুম। চোখে টস-টস করে জল পড়ছে! শ্রীপাদের দিকে তাকাতেও পাচ্ছি না। অমনি মৃদু হেসে বললেন,—"বিন্ধ্যাচল থেকে আসছ বুঝি?"

আমি বললাম,—"হাঁ।" এইরূপ তাঁর দুর্ব্বার করুণা ও স্নেহের কথা মনে ক'রে দু-তিন দিন কেটে গেল। সর্ব্বদা বিরস বদনেই থাকি এবং নিজের স্বতন্ত্রতা দোষে নিজেই কষ্ট পাই—এই বসে বসে ভাবি। আমি এইরূপ ভাবে দুই-চার মাস ক'রে শ্রীপাদের কাছে থাকি, আবার চলে যাই। এমনি করেই আমার

জীবন কাটে। শ্রীপাদ নিজে একটি করতাল আমায় দিয়েছেন, তাই নিয়ে নাম কীর্ত্তন ক'রে ঘুরে বেড়াতুম। আমি খুলনা, বাগেরহাট পিরোজপুর, চিটাগাঙ্গ, বাসণ্ডা প্রভৃতি স্থানে নাম কীর্ত্তন ক'রে বেড়াতুম। আবার রাঁচী, পাটনা কাশী ও মধুপুরে তুই একমাস নাম কীর্ত্তনে যেই কেটে যেতো আর আমি থাকতে পারতুম না, শ্রীপাদের কাছে চলে আসতুম। বহুলোক মন্ত্র চাহিত আমার কাছে, আমি কখনও দিতাম না। একদিন শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়কে এই কথা নিবেদন করলাম,—"অনেক লোক মন্ত্র চায়, আপনার কাছে নিয়েও আসতে পারিনা তাদের। বড় পীড়াপীড়ি ক'রে সব মন্ত্র নেবার জন্য। আপনি না বললে আমি দেই কি করে?" এই কথা শুনে তিনি বললেন, "ভরতের রাজত্ব করা জানতো? শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে তবে তিনি রাজত্ব করতেন। এ-পথটি হোচ্ছে তাই। গুরুত্বের অভিমান ছেড়ে মন্ত্র দিতে হবে। ঐ যে কথা আছে—তোমারি গরবে গরবিনী হাম। তোমার কৃপায় আমার সব কিছু। এইরূপ নিরভিমান না হয়ে গুরু হলে পতন হয়ে যাবে। গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-আত্মশ্লাঘা বর্জ্জিত। এই উপদেশ শুনে তারপর অনেক লোককে মন্ত্র দিলাম। প্রায় মাস খানেক আসি না, রাঁচী, হাজারিবাগ, মধুপুর বা পাটনার ঐদিকে আছি।

এমন আকর্ষণ তিনি করলেন, যে আর থাকতে পারলুম না, চলে এলাম আমি তাঁর কাছে! সেই সময় দৌলৎপুরের কলেজে পড়ত গুরুদাস। আমার সঙ্গে সংসার ছেড়ে চলে এল। সেই সময় শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, প্রফেসর দৌলৎপুরে পড়াতেন। আমি তাঁদের সঙ্গ পাই। রাঁচী থেকে খুলনায় চলে আসি। খুব কীর্ত্তন আনন্দে থাকতুম তখন সেখানে। সেই সময় কেষ্টচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রমেশ চ্যাটার্জ্জী নিরঞ্জন ঘোষ, বাগেরহাটের উপেন বাবু, রমেশ, মতিদা' নারায়ণ, দুলাল গোস্বামী ও রতন প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে কীর্ত্তন আনন্দে বেড়াতুম। গুরুদাস পাঠক, ভট্টাচার্য্য, দুলাল গোস্বামী, রণজিৎ সেন,

কেষ্ট ও বসন্ত দাস প্রভৃতি বাড়ী ছেড়ে চলে এল। গুরুদাস শ্রীবৃন্দাবনে ভজন-সাধন ক'রে সেখানেই অল্প বয়সে দেহ রাখল। সে খুব বিদ্বান এবং ভজনশীল ছেলে ছিল। সেই পাঠবাড়ীতে "সাধক কণ্ঠমালা" লিখে আমার শ্রীগুরুদেবের নামে বের ক'রে দেয়। আবার গৌরাঙ্গ চম্পূর বাঙ্গলা টিকা সেই লিখে যায়। শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীপাদ তাকে দর্শন দেন, তখন সে তাঁর চরণ-রজ পেয়েই দেহ রাখে। তার অপ্রকটের পর এই গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ চম্পূ ছাপান হয়েছে। তার বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যশোহরের বন্দবিলায় বাড়ী; আমাদের সঙ্গে অনেক দিন বাস ক'রে,সে পরে গৃহে এসে বিবাহ ক'রে সংসারী হয়েছে। কিন্তু তার হৃদয়ে ভক্তি অটুট আছে। এখন সে রেলের বড় অফিসার হয়েছে। তাঁর স্ত্রী. পুত্র, কন্যা সবাই শ্রীপাদের চরণাশ্রিত। দুলাল গোস্বামী মা ও বাবার সেবার জন্য বাড়ী ফিরে এসে পাস ক'রে মাষ্টারি কচ্ছে। সে আর বিবাহ করল না। মা ও ভাই বোনদের সেবা করে। এরা গোস্বামী সন্তান। এর মা ও বোন সবই খুব ভক্তিমতি। আমার শ্রীগুরুদেব এদের খুব ভাল বাসতেন। বসন্ত দাস বলে একটী ছেলে কখনও শ্রীবৃন্দাবনে থাকত কখন বা পাঠবাড়ীতে থাকত। এই রকম কত ভক্ত তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করত।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় দেহ রক্ষা করবার এক বৎসর আগে পুরীতে ঝাঁজপেটা মঠে দুই তিন মাস ছিলেন। উড়িষ্যায় তাপন বলে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। খুরদা থেকে নেমে তাপন যেতে হয়। সেখানে লিঙ্গরাজ সর্দ্দার নাম ক'রে আমাদের এক গুরুভাই আছেন। তিনি শ্রীপাদকে একবার সেখানে নিয়ে যান। তাঁর অপূর্ব্ব শ্রীগুরু নিষ্ঠা! পূর্ব্ব বঙ্গের এক অতি সুন্দর নিতাই-গৌর-বিগ্রহকে পাকিস্তান হবার পর নিয়ে আসা হয়। শ্রীগুরুদেব ঐ বিগ্রহ ওখানে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেন। তাঁরই আদেশে সেইখানে মন্দির হয় ও সেখানে শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অতি সুন্দর রমণীয় স্থান। তিনি শ্রীগুরুদেবেরও সেবা-স্থাপন সেখানে করেছেন। পুরীতে ঝাঁজ-

পেটা মঠে শ্রীপাদের থাকবার ঘরটিও তিনি অতি সুন্দর ক'রে বহু টাকা খরচ ক'রে করেন। তাঁর প্রীতিতে শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় ৩ মাস ওখানে থাকেন। তারপর তিনি যেদিন পুরী ছেড়ে কলকাতায় আসেন সেদিন ঐ ঝাঁজপেটা মঠের সমস্ত দেওয়াল, মন্দির, সব ঘামতে থাকে। অনেকেই দেখেছেন, অনেকে হাতও দিয়ে দেখেছেন যে দালানের গায়ে কেবল ঘাম-জল পড়ছে। গোপাল তাঁর সঙ্গে ছিল, সে সব কথা জানে। এইরূপ কখনও হয়নি। ষাট বৎসর ধরে শ্রীপাদ পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীরথের সময় ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবের সময় যেতেন আবার কলকাতায় চলে আসতেন।

কিন্তু এবার আসবার সময় এমনি ক'রে দেওয়াল ও মন্দির ঘামতে লাগল, এমন কখনও কেউ দেখিনি। শ্রীধাম পুরীতে এই তাঁর শেষ আগমন! প্রকট অবস্থায় আর এখানে আসবেন না, তারই কি এই পূর্ব্বাভাস! আমার বিশ্বাস,—ভক্তের বিরহে দেওয়ালও কাঁদে। কেউ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই ঘটনা তখন গোপাল ও আরও অনেকেই দেখেছেন। তারপর শ্রীধাম পুরী ছেড়ে তিনি কলকাতায় পোস্তায় চলে আসেন; তারপর পোস্তা হতে পাঠবাড়ী চলে এলেন। আর কোথাও তিনি পরে যান নি। আমার শ্রীগুরুদেবের অফুরন্ত লীলা-কথা, আমি আর কতটুকুই বা জানি! ৪৫ বৎসর আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ তিনি কৃপা ক'রে আমায় দিয়েছেন। কত অফুরন্ত জীবনী, অফুরন্ত লীলা-কথা! সব কথা লিখতে গেলে অন্তত এই রকম চল্লিশখানা গ্রন্থ হয়ে যায়। তাই আমি তাঁর লীলা-কথা সামান্য কিছু লিখলাম। যা চোখে দেখছি, যা তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি তাই লিখলাম। আজ দশ বৎসর হল তিনি অপ্রকট হয়েছেন, এই পাঠবাড়ীতে। দেহ রক্ষা করার ৬ মাস আগে আমি মধুপুরে এক সাধুর মঠে রাম মন্দিরে ছিলাম। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে আসতে লিখেছিলেন। আমি ছুটে শ্রীপাদের কাছে চলে এলাম। তিনি আর কোথাও আমায় যেতে দিলেন না। ছয় মাস তাঁর কাছে নিরবচ্ছিন্ন

ভাবেই ছিলাম। এমন আকর্ষণ, এমন স্নেহ-ভালবাসা যে কোথাও তখন তাঁকে ছেড়ে যেতে পারতুম না, সেই সময় নন্দবাবু, সত্য, বড় গোপাল, বৈষ্ণব চরণ, কেদার ঠাকুর, মুরলী দাস, হরিদাস, মণ্টু বিহারী, কাকাজী, সুধীর, কেষ্ট দাস. ছোট গোপাল, হরেকৃষ্ট, যবন হরিদাস, শিবু, মদন, উদ্ধব, গোবিন্দ প্রভৃতি অনেক ভাইদের শ্রীপাদের মধুময় সঙ্গে সবারই দিনগুলো কেটে যেত। আজ দশ বৎসর শ্রীপাদ দেহ রক্ষা করেছেন, তিনি দেহ রাখবার আগে—তোমরা নাম কর বলে, নিজেই 'ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ; জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' নাম করতে করতে দেহ রক্ষা করলেন। এমনি ভাবে দেহ রক্ষা করতে আমি আর জীবনে কাউকে দেখিনি। আমাদের চিরসুন্দর চির-মধুময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে আমরা চিরবঞ্চিত হয়ে গেলাম! এর চাইতে আর মর্ম্মান্তিক দুঃখ কিছুই নাই। তাঁর দেহ রক্ষার ছদিন আগে সকালে আমি তাঁর সঙ্গে ঠাকুর দর্শন কচ্ছি; সব স্থানে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ ক'রে, তুলসীমঞ্চ পরিক্রমা করে, বৈষ্ণব খণ্ডে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে এসে, শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে, শ্রীশ্রী নিতাই, শ্রী শ্রীগৌর কিশোর দর্শন ক'রে তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে! আমি পিছনে পিছনেই রোজই তাঁর সাথে থাকি। আজ হঠাৎ আমায় বলছেন,—"ভ্রমিতে ভ্রমিতে এ দেহ পতন হবে।" এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলে বললাম,—"এ রকম কথা তো কোন দিনই বলেন নি। আজ এমন নিদারুণ কথা বলছেন কেন?" আমার কথা শুনে একটু মৃদু হেসে বললেন,—"ভক্তিপথ সাধন করতে করতে চলে যেতে হবে, তা যদি না হয় তবে আর সারা জীবন ভোর আমার কি ভজন হল!" আমায় আশ্বাস দিয়ে বলছেন,—"ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেন বলেছেন,—এখনও আমায় দশ বৎসর থাকতে হবে।" এই বলে আমায় সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীনিতাই গৌরকে দণ্ডবৎ ক'রে, শ্রীযুগল কিশোরকে দণ্ডবৎ ক'রে, শ্রীভগবৎ আচার্য্যের ওখানে দণ্ডবৎ প্রণতি ক'রে নাট মন্দিরে মায়ের কাছে

এসে ঘুরে ঘুরে নাম পরিক্রমা ক'রে, দণ্ডবৎ ক'রে, নিজ ভজন কুটিরে গিয়ে শ্রীগুরু চিত্রপট ঘুরে ঘুরে দর্শন করছেন ; আমিও তাঁর সঙ্গে তাঁকেই পরিক্রমা কচ্ছি। তারপর তিনি দণ্ডবৎ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ করলাম, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন ;—"আমার পেছনে পেছনে ঘুরছ! কই কোন ঠাকুরকে দণ্ডবৎ না ক'রে আমাকে দণ্ডবৎ করলে কেন?" আমি বললাম, "আমার ভাঙ্গা শরীর, হাত ভাঙ্গা,—যিনি সমস্ত ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণতি করলেন, তাঁকে দণ্ডবৎ করলে কি সব ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করা হয় না?" তিনি অমনি বললেন,—"ভীষণ চালাক তুমি।" এই কথা বলে হাসলেন। পঞ্চান্ন নম্বর বাগবাজার ষ্ট্রীটের নগেন কবিরাজ মহাশয় এখন প্রায় রোজই এসে অনেক সময় শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করতেন। কত কথাবার্ত্তা হোতো, এই সময় পাগলও খুব আসত। পাগলকে শ্রীবাবাজী মহাশয় খুব ভালবাসতেন। টবিন রোডে তার বাড়ী। তার পুত্র কন্যা স্ত্রী সব শ্রীবাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত। পাগল প্রায় রোজই এসে শ্রীপাদের কোন-না-কোন সেবা করতো।

তখন তো বুঝিনি, শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্ম আর দুদিন পরে দেখতে পাবনা! দুদিন আগেকার কথার হেঁয়ালী তখন বুঝেও ত বুঝিনি! এই সময় গোবিন্দ ডাক্তারদা', নন্দদা', মাখনদা', ক্ষেত্রদালাল, পুলিনদা', পোস্তার দিদিরা, সুরেনবাবু লাবণ্যদি,' প্রভৃতি কত নরনারী তাঁকে রোজ দর্শন করতে আসতেন! কিন্তু আমরা কেহই তাঁর হেঁয়ালীর কথা বুঝতে পারিনি। গোপাল, রাজু, নন্দ, সত্য, কেদার সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থেকে তাঁর সেবা করতো, তারাও বুঝতে পারেনি,—আর দুদিন পরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন আর আমাদের ভাগ্যে মিলবে না।

তাঁর শ্রীমুখে বহুবার শুনেছি "কেউ যায়না। যেমন শ্রীভগবান

গৌরকিশোরের লীলা নিত্য তেমনি শ্রীগুরু বৈষ্ণবের লীলাও নিত্য। তাঁদের অপ্রকটেও দেখা যায়, পাওয়া যায়, তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়, সেবাও করা যায়! তাঁরা আসেন, ভক্তের সঙ্গে কথাও বলেন।" এই সব কথা অন্তরে রেখেই আমাদের দিনগুলো কাটাতে হবে। তা ছাড়া আর উপায় তো কিছু দেখি না।

তিনি তিরোধানের পূর্ব্বে শ্রীপাঠবাড়ীতে একটী বৎসর সর্ব্বদাই থাকতেন। যে যে তিথিতে, যে যে কীর্ত্তন ও উৎসব করতেন সেই সমস্তই এখন এখানে করতেন;—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথির উৎসব, শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান তিথির উৎসব প্রভৃতি এখানেই সব পালন করতেন। দেহ রাখবার আগের দিন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান তিথি ছিল। তাঁর তিরোভাব উৎসবে শ্রীপাদ কীর্ত্তন করবেন শুনে অগণিত ভক্ত এসে নাটমন্দিরে বসেছেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। প্রথম থেকেই শেষ পর্য্যন্ত নাম-পাথার বয়ে যেতে লাগল! নাম ও নামী অভিন্ন; আবার নাম দাতাও অভিন্ন—এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব-কথা প্রাণ-মাতান কীর্ত্তন মুখে বললেন; শ্রীপাদের তখন সাতাত্তর বৎসর বয়স।

সে-দিন তিনি কি সুগম্ভীর তেজ-দীপ্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করলেন! তারপর দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও কি মধুর ও আবেগময় উদ্দণ্ডনৃত্য ও নাম-কীর্ত্তন করলেন! তখন আমরা কেউ বুঝিনি যে কাল তিনি আমাদের সামনে অপ্রকট হয়ে যাবেন! তখন তাঁর শরীর সুস্থ;—ঠাকুর দর্শন ও প্রণতি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আমি তাঁর সঙ্গে পিছনে পিছনে চলেছি। পরদিন (১৩৬০ সালে, ১৮ই অগ্রহায়ণ) রাত্রি দুটোর সময় হঠাৎ এসে চেয়ারে বসলেন এবং বললেন, "আমি রজে বসব," তিনি পাঠবাড়ীর ধুলোকে রজ বলতেন। শ্রীমন্মাপ্রভুর বিহারভূমি পাঠবাড়ী; তাই পাঠবাড়ীর সবকিছু তাঁর নিকট সবিশেষ গৌরব ও মর্য্যাদার এক নিত্য-বিষয়-বস্তু। তারপর চেয়ার ছেড়ে নিজেই রজে বসলেন এবং সবাইকে নাম করতে ব'লে একবার তাঁর

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্রপট দর্শন করলেন, তারপর সখীমার চিত্রপট দর্শন ক'রে তিনি নিজেই "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম—উচ্চকণ্ঠে ক'রে—সেবকদের ধরিয়ে দিয়ে, সাধক দেহ ছেড়ে চিন্ময় দেহে নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন। তখন হতেই এই ভুবন-মঙ্গল-নাম-সঙ্কীর্ত্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীপাঠবাড়ীতে উৎসারিত হচ্ছেন।

হায়! সূচিভেদ্য দুর্ভাগ্য-বিজড়িত জীবন আমাদের! তাঁহার প্রকট লীলার সমাপ্তি ঘটিয়াছে; এখন অপ্রকট লীলা! এ লীলার তড়িৎ প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে—দিক্-দিগন্তে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে—শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের লীলা-কথা শ্রবণের আগ্রহ আজ সর্ব্বদেশীয় ভক্ত ও জনগণের মধ্যে কি বিপুলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে! তাঁহার লীলা-মঞ্জিমা চারিদিকে নানাভাবে স্বতঃ প্রচারিত ও প্রকাশিত হইতেছে! এ-মহৎ উদ্দীপন কোথা হইতে আসিল? এ-সদা-উৎসারিত প্রেরণাই বা কাঁহার?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী মহাশয় ইতিমধ্যে দুই খণ্ড 'চরিত-মাধুরী' নাম দিয়া তাঁর লীলা-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন;—স্তবকে স্তবকে যখন এই লীলা-পুষ্প বিকীর্ণ হইতেছে তখন আমি তাঁর যে অজস্র লীলা-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়াছি, তাঁরই সামান্য কয়েকটী পাপড়ি ভক্তগণের মধ্যে আকীর্ণ করিবার আমার এই দীন-আকিঞ্চন—"শ্রীগুরু-লীলা-কথা"। ভক্তগণের এই লীলা-কাহিনী শুনিবার বা জানিবার আকুল আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগুরু-লীলা-কথা পুনর্মুদ্রিত হইল! শ্রীশ্রীগুরু কৃপা ও তাঁর অপ্রকট লীলা-প্রভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের শ্রীগুরুর প্রকট কাল বিশালতা ও ব্যাপকতায় অম্বুনিধি বিশেষ—প্রবাহের নিত্য লহরীতে কত যে লীলা-পুষ্প উত্থিত হইয়াছে তাঁহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য—অফুরন্ত লীলা! আমারই গোচরীভূত তাঁহার যে অসংখ্য লীলা-পুষ্প নিচয়, সেগুলির বর্ণন বা প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ ৪০ খানা পুস্তক হইবে—প্রকাশের

সামর্থ্য ও সঙ্গতির অভাব। জানি, শ্রীগুরু কৃপায় সবই—অসম্ভব বা দুরধিগম্য—সহজ সরল সম্ভব ও সুগম হয়। মহতী শ্রীগুরু কৃপা! তাঁহার কৃপা হইলে, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সবই লীলা-পুষ্প গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইবে;—তাঁর অপ্রকট লীলার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্তে দিগন্ত দীপ্তিমান হইয়া উঠিবে!

শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট লীলার চমৎকারিত্ব ও আকর্ষণ শক্তি প্রচ্ছন্ন আন্তর-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ; তাঁর উপাস্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা ও প্রসাদ-বিতরণ শ্রীশ্রীভাগবৎ আচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীতে কি মহা-সমারোহের সহিত প্রত্যহ উৎযাপিত হইতেছে—গৃহী, সাধু, বৈষ্ণব ও আপামর সর্ব্বদেশীয় লোকের উদ্দাম জনস্রোত সেখানে সব সময়ই উদ্বেলিত: সর্ব্বশ্রেণীর ভক্ত ও জনগণের ভাব-ভক্তি-বিকল চিত্তের শ্রদ্ধা-নৈবেদ্যে শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সমাধি স্থান সর্ব্বদা প্রোজ্জ্বল ও সমাচ্ছন্ন; পাঠবাড়ীর পারিপার্শ্বিকতা তাঁর স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ, আজও তাঁরই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল,—নিগূঢ় ভক্তি-সুষমা ও অহর্নিশ নাম-ধ্বনিতে উল্লসিত। এ-সব উত্তুঙ্গ প্রভাব কাঁহার?

সেবকগণের অঙ্গে শ্বেত-শুভ্র বস্ত্র, শ্বেত-শুভ্র উত্তরীয়, ভালে চন্দনের ফোঁটা, কণ্ঠে-বক্ষে-বাহুতে চন্দনের অনুলেপন—তাঁহাদের তুরীয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ-পূজা-অর্চ্চনায় ভক্ত-প্রাণের যে নির্গলিত নিষ্ঠা-নির্ঝর নির্গমন হয় তাহাই অবলোকন করিবার জন্যই প্রতিদিন এই জনস্রোত। এ-সব উচ্ছ্বাসের মূল প্রস্রবণ কোথায়?

শ্রীপাঠবাড়ীর এ-আকর্ষণীয়তা ও এ-চমৎকারিত্ব তাঁর অপ্রকট লীলার তুঙ্গ-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়াছে। জয় গুরু শ্রীগুরু জয় গুরু শ্রীগুরু—এ-সবই তোমারই অপ্রকট লীলার অন্তহীন বৈভব!

অহমেব পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
গ্রাহয়ামি হরৌ ভক্তিং কলৌ পাপহতান্নরান্॥

নির্ঘণ্ট